ইসলামী শান্তি
ও
বিধর্মী সংহার
নূসরাত জাহান আয়েশা সিদ্দিকা
(জয়শ্রী আচার্য)

ইসলামী শান্তি ও বিধর্মী সংহার

নূসরাত জাহান আয়েশা সিদ্দিকা
(জয়শ্রী আচার্য)

প্রাপ্তিস্থান

- বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র, ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭২
- কিতাব মহল, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
- সংস্কার প্রকাশন, মাইকেল মধুসূদন সরণি, শিলচর- ৭৮৮০০৫

ISLAMIC PEACE AND ANNIHILIATION OF NON-BELIEVERS

[Islamee Shanti Ebong Bidharmee Samher]

প্রকাশিকা ঃ সুলতান বিনতে লায়লা আঞ্জুমান্দ আরা বানু

প্রথম সংস্করণ ঃ ১ জানুয়ারি, ২০০৭

পরিমার্জিত সংস্করণ ঃ ৩০ জুলাই, ২০১১

মুদ্রণে ঃ আলম প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
বাংলাবাজার, ঢাকা।

মূল্য ঃ বাংলাদেশে ১০০ টাকা
ভারতে ৭০ টাকা

আল্লাহ্ এবং নবীজী মূর্তিপূজারীদের সঙ্গে সম্পর্কহীন

মদিনায় অবতীর্ণ পবিত্র কোরানের ৯/৩ নং আয়াত

(সুরা আত-তওবা)

"আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসুলের পক্ষ হইতে সমস্ত মানুষের প্রতি সাধারণ ঘোষণা এই যে, আল্লাহ মূর্তিপূজারীদের (মুশরিকদের) সাথে সম্পর্কহীন এবং তাঁহার রসুলও। এখন যদি তোমরা তওবা কর, তাহা হইলে তাহা তোমাদের জন্যই ভাল। আর যাহারা বিমুখ হও, তাহারা খুব ভাল করিয়া বুঝিয়া লও ঃ তোমরা আল্লাহকে দুর্বল করিতে অক্ষম। আর হে নবী, অমান্যকারীদের কঠিন আযাবের সুসংবাদ দাও।"

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অনুবাদক এম. এম. পিকথল এই আয়াতটির ইংরেজী অনুবাদ করেছেন এই ভাষায় —

"And a proclamation from Allah and His messenger to all men on the day of the Greater Pilgrimage that **Allah is free from obligation to the idolaters, and (so is) His messenger.** So, if ye repent, it will be better for you; but if ye are averse, then know that ye cannot escape Allah. Give tidings (O Muhammad) of a painful doom to those who disbelieve,"

* গত ৩০.৬.২০১১ তারিখে বাংলাদেশের সংবিধানের রদ-বদল (সংশোধন) ঘটেছে। ধর্মনিরপেক্ষতার দাবিদার বলে কথিত শেখ মুজিব তনয়া বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজেই রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বাতিলের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ পাশ কাটিয়ে তাঁর হুকুমে 'ইসলামকে' বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম বহাল রাখা হয়েছে। সংবিধানের প্রথমেই লেখা হয়েছে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম'। ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোক ও ধর্মীয় ভিত্তিতে রাজনীতি করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আর ইসলামে অনভিজ্ঞ নখদন্তহীন নির্বোধ হিন্দুদের স্তোকবাক্য দেবার জন্য 'ধর্মনিরপেক্ষতা', 'সমাজতন্ত্র' প্রভৃতি শব্দগুলিও সংবিধানের শোভা বর্ধন করবে।

ভূমিকা

আপনারা নিশ্চয়ই রাজশাহীর একটাকিয়ার রাজাদের কথা শুনেছেন; রাজশাহীর চলনবিল এলাকার সপ্তদুর্গা বা সাতগড়ায় যাদের রাজধানী ছিল। এঁরা রাজা হলেও প্রতি বছর একবার অন্তত গৌড় বা দিল্লীর বাদশাহ্-র নিকট গিয়ে তাদেরকে বন্দনা করতে বাধ্য ছিলেন। সেই নিয়ম অনুসারে রাজা মদননারায়ণ নিজের দুই পুত্র কন্দর্প নারায়ণ ও কামদেব নারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে গৌড়ের বাহশাহ্ (নবীজীর বংশধর বলে পরিচিত) সৈয়দ হোসেন শাহ্-র সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলেন। সৈয়দ হোসেন শাহ্-র চার স্ত্রীর গর্ভে বহু কন্যা সন্তান হয়েছিল। তার মধ্যে দুটির বয়স ২০ বছরের অধিক হয়েছিল; অথচ যোগ্য পাত্র না পাওয়ায় তাদের বিয়ে দিতে না পারায় খুব চিন্তিত ছিলেন। হোসেন শাহ্ সৈয়দ বংশের লোক, নিম্নশ্রেণী থেকে ধর্মান্তরিত এ দেশীয় মুসলমানগণকে তিনি সমকক্ষ বলে মনে করতেন না। তাই হোসেন শাহ্ দেখলেন মদনের পুত্রদ্বয় অতি সুন্দর, বিদ্বান, বুদ্ধিমান এবং যুবা পুরুষ। তাঁরা কুলীন ব্রাহ্মণ এবং রাজপুত্র। সুতরাং সর্বাংশেই তাঁর কন্যার যোগ্য পাত্র। তিনি অমনি মদনকে স্বপুত্রক আটক করে তাঁর মেয়েদের বিয়ের প্রস্তাব করলেন। রাজা মদন অতি বিনীতভাবে বললেন, "ধর্মাবতার! আপনি আমাদের রাজা এবং রক্ষক, আমি আপনার একান্ত অনুগত এবং হিতার্থী ভৃত্য। আমার প্রতি অত্যাচার করা হুজুরের পদমর্যাদার অযোগ্য।" বাদশাহ্ চতুরতা পূর্বক বললেন, "দেখুন, আমি একটাকিয়ার রাজবংশকে অতিশয় ভালবাসি এবং মান্য করি। আপনারা যেমন হিন্দুদের গুরু ব্রাহ্মণ, আমরা তেমনি মুসলমানদের অতি সম্মানীয় 'সৈয়দ'। আপনাদের কন্যা যেমন অপর কোন হিন্দু বিয়ে করতে পারে না, তেমনি আমাদের কন্যাও সৈয়দ বংশের বাইরে কোন মুসলমান বিয়ে করতে পারে না। আপনাকে অতীব সম্ভ্রান্ত জেনেই আপনার পুত্রদ্বয়ের সঙ্গে আমি আমার দুই কন্যার বিয়ে দিতে ইচ্ছা করি; কোনরূপ অত্যাচার করার অভিপ্রায় আমার নেই। আমি আপনার পুত্রদের মুসলমান হতে বলি না; বরং পত্নীই পতির ধর্ম অনুসরণ করবে। ইহাই জগতে সাধারণ রীতি। আপনি যদি আমার কন্যাদের স্বজাতিতে মিলিয়ে নিতে চান, আমি সম্মত আছি। নতুবা আপনার পুত্রেরা আমার ধর্ম গ্রহণ করুক। আমি তাদেরকে আমার স্বজাতিতে মিলিয়ে নেব। এই উভয় প্রস্তাবের মধ্যে যেটি আপনার বাঞ্ছিত হয় আমি সেটিই মেনে নেব। কিন্তু যদি আপনি উভয়ই অস্বীকার করেন, তবে আমি বলপূর্বক আপনাকে বাধ্য করব।" রাজা মদন বাদশাহের উগ্র স্বভাবের কথা জানতেন। তিনি দেখলেন বাদশাহ্র প্রস্তাব অস্বীকার করলে বহু লোকের প্রাণনাশ ও জাতি নাশ হবে। আর মুসলমান মেয়েকে নিজ জাতিতে মেলাবার কোন উপায়ও নাই। অগত্যা তিনি দুই পুত্রের মায়া ত্যাগ করলেন। তারা মুসলমান হয়ে শাহ্জাদীদ্বয়কে বিয়ে করলেন। হোসেন শাহ্ পরে মদনের অন্য পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র সহ আরও এগারো

জনকে ধরে এনে মুসলমান বানালেন এবং তাঁদের সঙ্গে নিজের অবশিষ্ট সমস্ত কন্যাদের বিয়ে দিলেন। রাজা মদনের চতুর্থ পুত্র রতিকান্তের দৃষ্টিশক্তি কম ছিল, সে রাতে একেবারেই দেখতে পেতো না। বাদশাহ্ কেবল তাকে ছেড়ে দিলেন। বাদশাহ্ রসিকতা করে মদনকে বললেন, ''বুঝেছেন, যে অন্ধ সে হিন্দুই থাকুক; আর যার চক্ষু আছে, তার মুসলমান হওয়া উচিত।'' এইভাবে শুধু একটাকিয়ার রাজ পরিবার থেকে ২৯ জন রাজ কুমারকে মুসলমান করা হয়েছিল। সম্রাট আকবর একটাকিয়ার রাজকুমার চন্দ্র নারায়ণ এবং সংগীত শাস্ত্রবিদ বিখ্যাত কাশ্মিরী পণ্ডিত তানসেনের সাথে দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। আওরঙ্গজেবের প্রথম জামাতা কাশ্মিরী পণ্ডিত কৃষ্ণ নারায়ণ। আলমগীর তৎকালীন বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খাঁকে আদেশ দিয়েছিলেন যে, একটাকিয়ার ঠাকুর বংশে সুপাত্র থাকলে তাদেরকে আটক করে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করে প্রহরীবেষ্টিত অবস্থায় দিল্লীতে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু এই পাত্র যে পর্যন্ত ভক্ত মুসলমান না হয় সে পর্যন্ত যেন তাকে দিল্লীতে পাঠান না হয়। কেননা তার কন্যার বর ঘৃণিত কাফের হলে তাঁর সামনে হাজির হওয়া তিনি ইচ্ছা করেন না।

আমার দাদীর কাছ থেকে এই ইতিহাস ছোট বেলায়ই শুনেছি। দাদী আরও বলেছিলেন, আমরা রাজকুমার কন্দর্প নারায়ণের বংশধর। কামদেব নারায়ণ অদৃষ্টকে মেনে নিলেও কন্দর্প নারায়ণ মনে প্রাণে মুসলমান হতে পারলেন না। কিন্তু অন্য কোন উপায়ও ছিল না। তাই বংশ পরম্পরায় এই ইতিহাস পরবর্তী বংশধরদের জানিয়ে রাখতে হুকুম দিয়েছিলেন তিনি। আমি কন্দর্প নারায়ণের ২৩-তম বংশধর। আমার পূর্বপুরুষের সেই অপমান অত্যাচারের জ্বালা আমার রক্তে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। কিন্তু তাবলে আমি কালাচাঁদ ওরফে কালা পাহাড়ের মত দুলারী বিবিকে এবং যদুনারায়ণ ওরফে জালালুদ্দিনের মত আশমান তারাকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়ে স্বজাতির প্রতি আক্রোশ বশতঃ ইসলামী বর্বরতা চেপে যাওয়ার মত আহাম্মক নই। কি আশ্চর্য, আমার পূর্বপুরুষ আর কালা পাহাড় শুধু বিয়ে করতে বাধ্য হয়ে সমাজচ্যুত হয়েছিলেন; অথচ এদেশের ৯০ শতাংশ মুসলমান কালা পাহাড়, জালালউদ্দিন সহ অন্যান্যদের অত্যাচারে অত্যাচারিত হয়ে মুসলমান হয়েছিল সে কথা এরা মনেই রাখেননি। মধ্যযুগে ইসলামী সুনামীর বর্বরতার মরুভূমির বালি এসে এদেশের উর্বর মাটি ঢেকে ফেলেছে। সে মরু বালি সরিয়ে উর্বর মাটি পুনরুদ্ধারের কারো কোন ইচ্ছা নাই। অন্ধকার রাতের ঝড়-ঝঞ্ঝায় নাবিক পথ হারালে ভোর হলে তিনি সঠিক পথের সন্ধান করে নেন। অথচ আশ্চর্য, এরা কেউ সঠিক পথের সন্ধান করছেন না। সত্যিই বাংলার মানুষের বড় ভুলো মন। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাতে আমি মধ্যযুগীয় মুসলিম বর্বরতার কিছু ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। তুলে ধরতে চেয়েছি আমাদের পূর্ব পুরুষ কোন পরিস্থিতিতে মুসলমান হতে বাধ্য হয়েছিলেন। বিনীত

নূসরাত জাহান আয়েশা সিদ্দিকা (জয়শ্রী আচার্য)

প্রকাশিকার কথা

জন্মসূত্রে আমি একজন মুসলমান। পিতার ইচ্ছা ছিল আমি ইসলামী ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে পণ্ডিত হই। এজন্য আমাকে মাদ্রাসায় ভর্তি করান। আমি নিষ্ঠা সহকারে ইসলামী বিষয়ে পড়াশুনা করি। পরিণত বয়সে আমি বুঝতে পারি, ইসলাম আমার জন্য নয়। এটি আরবের বর্বর বেদুইনদের জন্য। সে কারণে আমি নিজেকে হিন্দু ভাবতে থাকি। ইতিহাস পড়ে আমি দেখতে পেলাম আমার ও এদেশের মুসলমানদের পূর্বপুরুষ কেউই স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেননি। তারা মধ্যযুগের ইসলামী বর্বরতার শিকার হয়ে মুসলমান হয়েছিলেন। আমি মনে মনে প্রশ্ন করলাম, তাহলে আমি কেন এই বর্বরতার স্মৃতিচিহ্ন বয়ে নিয়ে বেড়াব। আমি ঠিক করলাম, আমি আমার পূর্বপুরুষের শাশ্বত সনাতন ধর্ম গ্রহণ করব, করেছিও। ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমি একজন সনাতন ধর্মীয় স্বামীও পেয়েছি। হিন্দুরা আমাকে সহজে গ্রহণ করতে চান না। তারা ইতিহাস পড়েন না। ইতিহাস পড়লে তাঁরা বুঝতেন আমাদের পূর্বপুরুষ কেন মুসলমান হতে বাধ্য হয়েছিলেন। অতএব আমাদের উদ্ধার করার দায়িত্ব যেমন আমাদের আছে; তেমনি আপনাদেরও আছে।

লেখিকা ইসলামী শান্তি ও বিধর্মী সংহারের চিত্রই তুলে ধরতে চেয়েছেন। এদেশ সহ পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ জানেন না কেন তারা মুসলমান হয়েছেন। জানেন না, কারণ তারা ইতিহাস পড়েন না; কোরান হাদিসও পড়েন না। অনেকে জানেন, কিন্তু প্রকাশ করেন না। আমরা কতটুকু প্রমাণ করতে পেরেছি তা বিচার করবেন ইসলাম সম্পর্কে বিজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তিগণ; যারা অভিনিবেশ সহকারে কোরান হাদিস চর্চা করেন। আমার পূর্ণ পরিচয় দেবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু দিলাম না। আপনারা আমাদের এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ পাঠ করলে অনেকটাই জানতে পারবেন। আশা করি আমার মুসলমান ভাই-বোন সহ হিন্দু ভাই-বোনেরাও আমাদের বহু পরিশ্রমের ফসল এই বইখানি পাঠ করবেন এবং তাহলেই আমরা আমাদের পরিশ্রম স্বার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

স্বা. লায়লা আঞ্জুমান্দ আরা বানু

"২০০৮ সালে বাংলাদেশে সেক্যুলার সরকার ক্ষমতায় এলেও বাংলাদেশের অধিকাংশ অবস্থার বাস্তবিক কোনো পরিবর্তন আসেনি। বাংলাদেশে প্রত্যেক বছর প্রায় ১৬ হাজার হিন্দু মহিলা অপহৃত এবং তারা বাধ্য হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। ২০১১-তে এসেও এই সংখ্যা কমেনি মোটেও।" — সাংবাদিক, সাহিত্যিক এবং চিত্রপরিচালক সালাউদ্দিন শোয়েব চোধুরী। (আমার দেশ, ১৯.৩.২০১১, থেকে সংগৃহীত)

সমালোচকের দৃষ্টিতে
'ইসলামী শাস্তি এবং বিধর্মী সংহার'

জুন মাসের (২০১১) প্রথম সপ্তাহে পরপর তিনটি ঘটনা ঘটে। অনেকটা কাকতালীয় ভাবেই। প্রথমত, 'ই-মেলে' একটি অভূতপূর্ব মেসেজ আসে, যেখানে বলা হয়েছে, ইরানের একদল মুসলিম বুদ্ধিজীবী সমগ্র পৃথিবীর মুসলমানদের ইসলাম ত্যাগ করতে আবেদন জানিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন করতে গিয়ে মুজিব কন্যা শেখ হাসিনা 'কার্যত' জামাতে ইসলামী হয়ে গেছেন। বলেছেন, দেশে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম তো থাকবেই। এর সঙ্গে থাকবে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম'। আরও থাকবে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠনের সুযোগ। আবার ইসলামে অজ্ঞ হিন্দুদের মন রক্ষা করার জন্য 'সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদ' প্রভৃতি কথাগুলোও থাকবে। তৃতীয় ঘটনাটি হচ্ছে আলোচ্য গ্রন্থটি আমার হাতে আসা। এক নিঃশ্বাসে এটি পড়ে ফেললাম। ১৯৪৭ থেকে পূর্ববঙ্গের রাজনীতি এবং মুসলিম মৌলবাদের বাড়-বাড়ন্ত এবং হিন্দু রাজনীতিবিদদের দৈন্যদশা দেখে আসছি। একজন অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন (ভাষান্তরে শিক্ষিত) বাঙালি হিসেবে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের কাজকর্ম এবং লেখাজোকার প্রতি নজর দিয়েছি বেশি। দেখেছি হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে অধিকাংশ বাঙালি বুদ্ধিজীবী সরকার ঘেঁষা। তবে ব্যতিক্রমও ছিল এবং এখনও আছে। তাঁদের একজন আলোচ্য পুস্তক রচয়িতা নূসরাত জাহান আয়েশা সিদ্দিকা। ব্যক্তিগত ভাবে তাঁকে আমি চিনি না। তবে তিনি কবি দাউদ হায়দার, তসলিমা নাসরিন, প্রয়াত আরজ আলি মাতুব্বর এবং রম্য রচনার যাদুকর 'চাচার চোখে মার্কস ও মোহাম্মদ' খ্যাত জনাব আক্কেল আলির মতই অসম সাহসী। আজকের বাংলাদেশে যাঁরা ধর্মনিরপেক্ষ এবং প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী বলে সম্মানিত তাঁদের মধ্যে আছেন জাতীয় অধ্যাপক কবির চৌধুরী, মুনতাসির মামুন এবং শাহ্‌রিয়ার কবির। এঁদের সঙ্গে দাউদ হায়দার-তসলিমাদের যেমন আছে মিল, ঠিক তেমনি আছে অমিল। কবির সাহেবরা কোরান, হাদিস এবং নবীজীর কাজ-কর্ম এবং বাণী (হাদিস) ঠিক রেখে মৌলবাদী কারাগার থেকে মুক্তি পেতে চান। পক্ষান্তরে তসলিমা-নূসরাতরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কোরান-হাদিসের অমানবিক বিধানগুলির বিলুপ্তি চান। মাদ্রাসায় পড়াশোনা করা একজন মুসলমান হিসেবে বলতে পারি, এই দু'টো কাজই অসম্ভবের কাছাকাছি।

কবির সাহেবরা আজ যা চাচ্ছেন, শেখ মুজিবর রহমানও ঠিক তা-ই চেয়েছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশের মোল্লারা তাঁকে সপরিবারে খুন করেছে। তসলিমাদের সমর্থন করে লিখতে গিয়ে অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদকে খুন হতে হয়েছে। দাউদ-তসলিমা বিদেশে গিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছেন। এই মুহূর্তে ইসলাম এবং নবী বিরোধী লেখা লিখে দুনিয়া কাঁপিয়ে দিয়েছেন, সেই আবুল কাসেম এবং আলি সিনা নিজেদের দেশ ছেড়ে অমুসলিম

শক্তির ছত্রছায়ায় থেকে ইসলামের সমালোচনা করছেন। নূসরাত-আক্কেল আলিরা রয়েছেন আণ্ডারগ্রাউণ্ডে। আমার অবস্থাও অনেকটা তা-ই।

আলোচ্য পুস্তকটি অজস্র তথ্যসমৃদ্ধ। খানিকটা ভারাক্রান্তও বটে। প্রচুর বানান ভুল আছে। পুনরুক্তি আছে। উদ্ধৃতিগুলোর যথাযথ উৎস দেখা গেল না। কিন্তু মূল বক্তব্য এতই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় যে, ঐ সব ত্রুটিগুলো চোখে পড়ে না।

লেখিকা বিভিন্ন ইতিহাস থেকে যে সব তথ্য দিয়েছেন, প্রতিটি শিক্ষিত মানুষের তা জানা প্রয়োজন।

আমরা বাংলাদেশের বেশির ভাগ মুসলমান নিম্নবর্ণ তথা পতিত হিন্দু সমাজ থেকে এসেছি। ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা আমাদের মানায়। কিন্তু উচ্চবংশ তথা উচ্চবর্ণের হিন্দুরা কেন বহিরাগত মুসলমানের অপকর্মের কথা সাধারণ মানুষের গোচরে আনার ব্যবস্থা করছেন না, তা বুঝে উঠতে পারছি না। ভারতে যদুনাথ সরকার এবং রমেশচন্দ্র মজুমদারের ইতিহাস পড়ানো হচ্ছে না। এর জন্য কেন আন্দোলন করছেন না হিন্দুরা, বিশেষ ভাবে এখনও যারা বর্ণহিন্দু বলে গর্ব করেন? আর কোরান-হাদিস সম্পর্কে তারা এত উদাসীন কেন?

কোরান-হাদিসের দৃষ্টিতে আপনারা হিন্দুরা অভিশপ্ত কাফের, অবিশ্বাসী, পৌত্তলিক এবং মুশরিক। আপনারা অপবিত্র। পৃথিবীর মাটিতে আপনারা নিকৃষ্টতম জীব। আপনারা ইসলামের শত্রু, নবীজীর শত্রু এবং আল্লাহর শত্রু। আপনাদের সঙ্গে আল্লাহ বা নবীজীর কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু আজ কংগ্রেস আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা শাকিল আহমদ এবং আহমদ প্যাটেলদের পরামর্শ নিয়ে দেশ চালাচ্ছে। কংগ্রেসের বি-টিম তৃণমূল কংগ্রেস কলকাতার টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম (ভারতে বহিরাগত মুসলমান) বরকতি মিঞার আশির্বাদ নিয়ে রাজ্য সরকার গঠন করেছে। মানবতাবিরোধী জঙ্গী সৃষ্টির আতুর ঘর মাদ্রাসাগুলিকে স্বীকৃতি দিয়ে আত্মহননের পথ আরও মসৃণ করছে।

আজ বাংলাদেশের কয়েকটি মাত্র প্রাণি তাঁদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই কথাগুলি তথ্য সহ তুলে ধরছেন। বেগম নূসরাত জাহান তাঁদের অন্যতমা। তিনি যথেষ্ট সাহসের সঙ্গে বলেছেন, ইসলামের মূল উদ্দেশ্য বিধর্মী সংহার। তিনি বিন্দুমাত্র ভুল বলেননি। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে কোরান কোন ধর্মীয় কিতাব নয়; কোরান যুদ্ধনীতির কিতাব। আমি কোরান-হাদিস পড়েই এ কথা বলছি। কোরান থেকে যুদ্ধের কথা বাদ দিলে পড়ে থাকে বড় আকারের একটি শূণ্য। সর্বজনীন মানবাধিকার বর্জিত এই কিতাবের মূল উদ্দেশ্য বিধর্মী সংহার। এই উপমহাদেশের বেশির ভাগ হিন্দুরা যদি এ কথা বুঝতে না পারেন, তাহলে ইসলামের হাত থেকে তাদের পরিত্রাণ নেই।

তবে আশার কথা শোনালেন ইরানের বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশ। তাদের কথা আমি প্রথমেই উল্লেখ করেছি। একটি বিবৃতি প্রচার করে তারা ইসলামের সঠিক পরিচয় দিয়ে একে পরিত্যাগ করার আহ্বান জানিয়েছেন। এই আহ্বানে যদি ব্যাপক সাড়া আসে, তাহলেই কিছুটা পরিবর্তন হয়ত আসবে। বিবৃতিটি হুবহু তুলে দিচ্ছি।

PROCLAMATION TO ABANDON ISLAM

We, the people of Iran and the world, regardless of our origins and beliefs, have come to the realization that it is not possible for a person to be a Muslim and live by the standards of the United Nations Universal Declaration of Human Rights. We hold Islam in violation of the Universal Declaration of Human Rights, by invading other lands, enslaving people, destroying their heritage and their way of life. We find Islam guilty of pursuing a multi-front attack, even to this day, on much of what is sacred to all civilized people. We consider Islam responsible for 1400 years of atrocities committed against the Iranian people and much of the Islamic world. We believe that Islam is the root of our problem therefore it must be abandoned.

Islam is not hijacked by the terrorists. The terrorists are the true Muslims. Muhammad bragged "I have been made victorious with terror" [Bukhari: 4.52.220]. He raided massacred, looted and raped innocent people. Islam promotes hate, violence, misogyny, discrimination, intolerance, child abuse and murder.

For the love of humanity, for the peace of the world and for the future of our children, we denounce Islam. We urge Muslims to leave this faith of hate and join the rest of mankind in amity. We are one people; let not prophets of hate like Hitler, Marx and Muhammad divide us with their big lies. We invite you to sign this petition and promote it. Peace cannot be attained unless hate is eliminated. Islam, like all ideologies of hate is the biggest impediment to peace. (Source: http://www.faithfreedom.org/features/news/iranians-against-islam/)

আমি লেখিকা এবং প্রকাশিকাকে অভিনন্দন জানিয়ে পুস্তকটির একটি পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশের অনুরোধ জানাচ্ছি।

স্বা. আবু সালেহ্ (ধানমণ্ডী, ঢাকা, বাংলাদেশ)
বর্তমান ঠিকানা —
69 Borough Street, London SE-2 UK
জুন ৩০, ২০১১

যে সব গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছেঃ—

১। The Meaning of the Glorious Koran- M.M Pickthal

২। বাংলা কোরান, মুহাম্মদ নূরুল আমীন।

৩। Sahi Muslim (4 volumes) Translated by Abdul Hamid Siddiqi.

৪। মিসকাসত শরীফ (৭ম খণ্ড) মৌলানা এম আফ্লাতুন কায়সারের অনুবাদ।

৫। Life of Mohammet, Sir William Muir.

৬। Hedayyah, Translated by Charles Hamilton.

৭। History of Aurangzeb (Vol- III), J.N. Sarker

৮। পূর্ব বঙ্গের কবিয়াল ও কবি সঙ্গীত, ড. দীনেশচন্দ্র সিংহ।

৯। মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন, মজিদ খাদ্দুরী।

১০। ইসলামী আইন তত্ত্বের উৎস, গাজী শামসুর রহমান।

১১। বাংলাদেশের ইতিহাস, ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার।

১২। নোয়াখালী নোয়াখালী, শান্তনু সিংহ।

১৩। ভারতবর্ষের ইতিহাস, প্রগতি প্রকাশন মস্কো।

১৪। বাংলার ইতিহাস, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৫। বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর ঃ স্বাধীন সুলতানদের আমল, সুখময় মুখোপাধ্যায়।

১৬। সিকান্দার নামা, আলাউদ্দিন।

১৭। তারিখ-ই-ফিরোজশাহী, জিয়াউদ্দিন বারাউনী।

১৮। পারশ্য সাহিত্য পরিক্রমা, পার্বতী চরণ চট্টোপাধ্যায়।

১৯। জেহাদ, সুহাস মুজমদার।

২০। কেন উদ্বাস্তু হতে হল, শ্রীদেবজ্যোতি রায়।

২১। ইসলামী ধর্মতত্ত্ব, এবার ঘরে ফেরার পালা,
ডক্টর রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী।

ইসলামী শান্তি ও বিধর্মী সংহার

> " প্রশান্ত মহাসাগর হইতে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত বিরাট এলাকায় দীর্ঘ পাঁচ শ' বছর ধরিয়া পৃথিবীতে রক্তের বন্যা বহিয়া গিয়াছে। ইহাই মহম্মদের মতবাদ।" — স্বামী বিবেকানন্দ।

"যাহা বলিব সত্য বলিব, কোন কিছু মিথ্যা বলিব না; কোন কিছু গোপন করিব না, কোন তথ্যের বিকৃত ব্যাখ্যা করিব না।" — ইহাই এই লেখিকার প্রতিজ্ঞা। বলা হয়ে থাকে আরব দেশে তথা পৃথিবীতে যখন আইয়ামে জাহেলিয়াতের (অন্ধকার) যুগ চলছিল, তখন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ জন্ম গ্রহণ করেন। চারটি মৌলিক নীতি নিয়ে তিনি ধর্মীয় জীবনের যাত্রা শুরু করলেন —

(১) সমস্ত মূর্তি ভেঙে ফেলে পৃথিবীকে মূর্তিমুক্ত করতে হবে।
(২) আল্লাহ্ এক এবং হযরত মোহম্মদ তাঁর রসুল।
(৩) যারা একথা মেনে নেবে না তাদের হত্যা করতে হবে। এবং
(৪) যেহেতু পৃথিবীর সমস্ত সম্পত্তি আল্লাহ্র; সেহেতু অমুসলমানদের দখলে থাকা সমস্ত সম্পদ কেড়ে নিতে হবে।

প্রথম দিকে তিনি তাঁর আদর্শে বিশ্বাসী একটি ক্ষুদ্র দল সৃষ্টি করলেন এবং তাদের নিয়ে তিনি বিভিন্ন আরব ও ইহুদি গোষ্ঠির বিরুদ্ধে লুট-পাট করে অর্থ সঞ্চয় করে নিজ রাজ্য বৃদ্ধি করতে ব্যস্ত ছিলেন। এক শুভ মুহূর্তে আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলা লুট করে চুয়াল্লিশ কোটি টাকার (আব্দুল আজিজ আল আমানের হিসাব মতে) হস্তগত করেন। এ ছাড়াও তিনি তার প্রায় মায়ের বয়সী বিবি খাদিজা নামক এক ধনাঢ্য বিধবা মহিলাকে নিকাহ্ করে প্রচুর সম্পদের মালিক হলেন। এই সম্পদ তিনি কাজে লাগালেন মরুভূমির অনাহারক্লিষ্ট বলিষ্ঠ যুবকদের সংগ্রহ করতে। শান্তিপ্রিয় লোকদের তিনি পছন্দ করতেন না। (৯/১৯-২২ নং আয়াত ও মিশকাত-উল-মাসাবিহ্ ৪৪৮৯, ৪৫১২, ৪৫৪৮, ৪৫৪৯ ও ৪৫৪৬ নং হাদিস সমূহ দ্রষ্টব্য)।

ক্রমান্বয়ে তাঁর লোকবল বাড়ল। তিনি ছোট ছোট ইউনিট করে বিভিন্ন আরব ও ইহুদি গোষ্ঠীর উপর অবিরাম হানা দিয়ে লুট-পাট করতে লাগলেন। ৬২৩ খৃষ্টাব্দে নাকসায় হানা দিয়ে প্রথম বিধর্মী হত্যা ও প্রথম গণিমতের মাল লাভ করলেন। এইটেই ইসলামের প্রথম সাফল্য। কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডটি ঘটে পবিত্র রজব মাসে। এই পবিত্র মাসে আরবরা ঐতিহ্যগতভাবে অস্ত্র ধারণ করত না। ইহুদী কুরাইজাদের ধংসের ফলে ৪০,০০০ দিনারের (স্বর্ণমুদ্রা) গণিমত পাওয়া যায়। অনেকে বলেন, মুসলমানরা হানা দিত; কথাটি ঠিক নয়। কারণ মুস্তালিক ও খায়বারের ইহুদি গোষ্ঠীর সঙ্গে মুসলমানদের কোন বিরোধ ছিল না। তারা মদিনা থেকে ১০০ মাইল দূরে বাস করত। এই লুটের

মালের এক পঞ্চমাংশ তিনি নিজে রেখে বাকী অংশ তাঁর অনুসারীদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়ার রীতি চালু করলেন। তিনি শিশু ও মহিলাদের 'গণিমতের মাল' ঘোষণা করে মুসলমানদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে নিতে বললেন। (কোরান-৮/৬৯) এই লুটের মালের মধ্যে যদি কোন বিবাহিতা মহিলা থাকে, তবে তিনি ঘোষণা করলেন, মুসলমানরা এই সব মহিলাদের ইচ্ছা মত ভোগ করতে পারবে। (কো-৪২৪ এবং ৮/৬৯) বলা বাহুল্য, তিনি নিজেও তা করতেন। এ বিষয়ে একটি হাদিস আছে। সোফিয়া নামের এক মহিলা লুটের মাল ভাগাভাগিতে হিদিয়া নামক এক ব্যক্তির ভাগে পড়ে। পরে যখন নবীজি জানতে পারেন একটি উৎকৃষ্ট মহিলা তার এক সাহাবী ভোগ করছে, তখন হিদিয়াকে ডেকে পাঠালেন এবং সফিয়াকে ফেরত দিয়ে অন্য কোন মহিলাকে নিতে বললেন। (সহি মুসলিম, হাদিস নং-৩৩২৫-২৯) নিকাহের ব্যাপারে তার সুন্না হল তিনি যখন ২৫ বছরের যুবক, তখন ৪০ বছরের মহিলাকে এবং তিনি যখন ৫২ বছরের প্রৌঢ় তখন তিনি ৬ বছরের শিশু আয়েশাকে নিকাহ্ করেছিলেন। মহিলাদের তিনি শুধু ভোগের সামগ্রী হিসেবেই গণ্য করেছেন। ইসলামী ধারণা মতে পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্য পাঁজরের একখানা হাড় থেকে নারী সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্। আর সেই সূত্রেই অন্যান্য ভোগ্য সামগ্রীর মত মহিলারাও ভোগ্য সামগ্রী। আল্লাহ্ও কোরানে বলেছেন, নারী শস্যক্ষেত্র; পুরুষ সেখানে যেমন খুশি যেতে পারে। (কো-২/২২৩) তবে মহিলাদের যথেচ্ছ ভোগের জন্য তাকে কিছু অর্থ দিয়ে ভোগ করা উচিত বলে ইসলামী আইনবিদগণ মনে করেছেন। ভোগের বিনিময়ে কি পরিমাণ অর্থ মহিলাকে দেয়া উচিত; তা মহিলার রূপ, গুণ ও বংশ মর্যাদার উপর নির্ভর করে। ইসলামী আইনবেত্তাগণ এ নিয়ে প্রচুর বিতণ্ডা করেছেন। যেমন "স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রদেয় দেন-মোহরের নিম্নতম মূল্য কত হবে তা নিয়ে প্রচুর বিতণ্ডা দেখা যায়। আদি ইরাকী মতবাদে ইহার পরিমাণ খেয়াল খুশি মত সাব্যস্ত করা হত। আবু হানিফার শিষ্যগণ বলেন, তুচ্ছ মূল্যে নারী দেহ ভোগ বৈধ নয়। ইব্রাহিম নাখাই একবার ইহার পরিমাণ ১০ দিরহামের কম হইবে না বলিয়াছিলেন এবং পরবর্তীকালে ৪০ দিরহামের কম মোহরকে তিনি সমর্থন করেন নাই। পরিমাণ নির্ধারণের এই নির্দেশ কোন যুক্তি ভিত্তিক ছিল না। শাঈবানীর মুয়াত্তায় দেখা যায়, ১০ দিরহাম মূল্যের কোন কিছু চুরি করিলে চোরের একটি হাত নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। এই পরিমাণ নির্ধারণের সূত্র হিসাবে বলা হয় যে, স্ত্রীর একটি অঙ্গ ভোগ করিতে হইলে তাহাকে অন্তত ১০ দিরহাম মূল্য দেয়া উচিত।" (গাজী শামসুর রহমানের 'ইসলামী আইন তত্ত্বের উৎস', ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ পৃ-৮৭)

মহানবী যা করেছেন এবং যা করতে বলেছেন তাই সুন্নৎ বা সুন্না। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। নবীজি বলেছেন, পৃথিবীর সমস্ত ধন সম্পত্তিই মুসলমানদের হকের পাওনা; কেননা আল্লা হ্ রসুলই পৃথিবীর মালিক (সহি মুসলিম-৪৩৬৩)। তাই যে সম্পদ অমুসলিমদের কাছে রয়েছে তা কেড়ে নিতে হবে। নবীজির

এই আদর্শ অনুসরণ করে মুসলমানরা বিভিন্ন অভিযান শুরু করে এবং বিধর্মীর বাড়ী-ঘর ধন-সম্পত্তি লুট শুরু করে। লুটের মালকে ইসলামী পরিভাষায় বলে 'গণিমতের মাল'। বিধর্মীর কাছ থেকে কেড়ে আনা স্থাবর-অস্থাবর সব মালই এর মধ্যে পড়ে। পবিত্র কোরানে এ বিষয়ে একটি সুরা আছে; নাম সুরাতুল আনফাল। "যে গণিমতের মাল তোমরা পেয়েছ তা উত্তম ও বৈধ বলে ভোগ কর।" (কে.-৮/৬৯) আয়াতটি নাজিল করে তাদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে দেন। কাফেরের কাছ থেকে কেড়ে আনা মহিলা এবং শিশুরাও ইসলাম মতে গণিমতের মাল।

৬৩২ খৃষ্টাব্দে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদের ইন্তেকালের পর তাঁর একান্ত অনুসারীরা বিভিন্ন অঞ্চলে হানা দিতে শুরু করল। প্রথমে তারা ইরাক, ইরানে হানা দিয়ে তথাকার অগ্নি উপাসকদের কচু কাটা করে ইরান দখল করে নিল। কতক ইসলাম স্বীকার করে প্রাণ বাঁচলেন, অল্প কিছু পালিয়ে ভারতে এলেন, আর সেই অল্প সংখ্যক অগ্নি উপাসকই পৃথিবীতে স্বাক্ষী হয়ে রয়েছেন। এরপর আফগানিস্থান। তারপরেই ভারত।

শ্রীলঙ্কার রাজা তাঁর রাজ্যে বাণিজ্য করতে আসা যে সব আরব বণিকের মৃত্যু হয়েছিল তাদের অবলম্বনহীনা কয়েকটি কন্যাকে সমুদ্রপোতে করে আরব সাম্রাজ্যের পূর্বাংশের শাসনকর্তা হাজ্জাজের নিকট পাঠিয়েছিলেন। সিন্ধু রাজ্যের দেবল বন্দরের নিকট সেই কয়েকটি সমুদ্রপোত জলদস্যুরা লুণ্ঠন করে। এই ঘটনাকে অছিলা করে হাজ্জাজ ইমদাদ উদ্দিন মহম্মদ বিন কাশিমকে সেনাপতি করে পাঠালেন সিন্ধুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। দেবল বন্দর দখল করে ইসলামী বিধান অনুযায়ী সতের বছরের অধিক বয়স্ক পুরুষ মাত্রকেই হত্যা করা হল। তিন দিন ধরে লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ডের পর স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল হিন্দুকে মুসলমান হতে বাধ্য করা হল। (৭১১ খৃঃ)

এরপর বিন কাশিম বিভিন্ন স্থানে লুট ও পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড চালিয়ে বাদর নামক স্থানে সিন্ধুর হিন্দু (ব্রাহ্মণ) রাজা দাহিরের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালালেন। দাহিরের সেনাবাহিনীতে ৫০০ জন আরব মুসলমান চাকুরী করতেন। তাদের বিশ্বাসঘাতকতায় রাজা দাহির পরাজিত ও নিহত হলেন (২০শে জুন, ৭১২)। দাহিরের পত্নী রাণীবাঈ নিজ পরিচারিকাগণ সহ বিষপানে আত্মহত্যা করবেন বলে স্থির করলে দাহিরের এক মন্ত্রী এসে খবর দেন যে, মুসলমানেরা মৃতদেহকেও বলাৎকার করে। তখন তারা আগুন জ্বালিয়ে তাতে ঝাঁপ দিয়ে মুসলমানদের হাতে বন্দিনী হবার ভয় থেকে পরিত্রাণ পেলেন। (এরপর থেকে আতঙ্কিত ভারতীয় মহিলারা মুসলমানের হাতে ধরা পড়ার ভয়ে এভাবে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতেন।)

বহু সংখ্যক হিন্দুর প্রাণনাশ করে এবং ততোধিক পরিমাণ নর-নারীকে দাসত্ব গ্রহণে বাধ্য করে বিন কাশিম মুলতান শহরটি দখল করলেন। পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের পরও যারা মুসলমান হল না, বিন কাশিম তাদের উপর ইসলামী আইন মোতাবেক ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত জিজিয়া কর ধার্য্য করলেন।

মহম্মদ বিন কাশিমের পর সুলতান মাহমুদ ভারত আক্রমণ করেন। মহানবীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি মন্দির ও প্রতিমা ধ্বংস, ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন এবং কাফের নিধন করবার জন্য ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেন। তিনি ভারতবর্ষের ঐশ্বর্যে ভরা শত শত মন্দির ও দুর্গ লুণ্ঠন করেন ও লক্ষ লক্ষ হিন্দু হত্যা করে ভারতবর্ষে ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন। পরবর্তীকালে মুসলমান আক্রমণের জন্য তা যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল। একমাত্র কাংড়া দূর্গের অভ্যন্তরের মন্দির হতে তিনি ত্রিশ গজ দীর্ঘ ও পনের গজ প্রশস্ত একটি রৌপ্য নির্মিত গৃহ এবং সেই গৃহের অভ্যন্তরে দুটি স্বর্ণ ও দুটি রৌপ্যের স্তম্ভ মামুদ নিয়ে গিয়েছিলেন। এ ছাড়াও ফিরিস্তার বর্ণনা মতে, কাংড়া দূর্গ হতে মামুদ লক্ষ দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা) সাত শত মণ সোনা ও রূপোর পাত, দুই শত মণ খাঁটি সোনা, দুই হাজার মণ রূপো ও কুড়ি মণ মণিমুক্তা লুণ্ঠন করে গজনী নিয়ে গিয়েছিলেন। এই লুণ্ঠিত সোনা রূপো মণিমুক্তা গজনী রাজ্যে নিয়ে গেলে সেখানে সমবেত বৈদেশিক দূতগণ বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিলেন। হিন্দু হত্যা ও হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি ধ্বংসের জন্য তিনি নিজেকে 'গাজী' উপাধিতে ভূষিত করলেন এবং আরও বেশী করে হিন্দু হত্যা ও হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি ভাঙার জন্য উৎসুক হয়ে পড়লেন। থানেশ্বরে উপস্থিত হয়ে তিনি সেখানকার সুবিখ্যাত হিন্দু মন্দিরটি ও মন্দিরের প্রতিমা চূর্ণ বিচূর্ণ করে সেখানকার যাবতীয় ধন রত্নাদি লুণ্ঠন করলেন। মথুরা নগরীর মধ্যস্থলে নির্মিত মন্দিরটি স্থাপত্য ও শিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন ছিল। সুলতান মামুদ এই মন্দিরটির সৌন্দর্য দেখে বলেছিলেন যে, ইহা নির্মাণে অন্ততঃ দুই শত বছর লেগে থাকবে। কিন্তু তারই আদেশে হিন্দু শিল্প ও স্থাপত্যের এই বিস্ময়কর নিদর্শনটি ভস্মীভূতকরা হয়েছিল। মন্দিরের যাবতীয় ধন-রত্নাদি ও স্বর্ণ নির্মিত বিগ্রহটি মামুদ লুণ্ঠন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই সকল বিগ্রহের মধ্যে পাঁচটি ছিল পাঁচ গজ উঁচু। এই সকল বিগ্রহের চক্ষু ছিল অতি মূল্যবান মণি দ্বারা তৈরী। ১০২৬ খৃষ্টাব্দে মামুদ ৩০ হাজার অশ্বারোহী ও অসংখ্য মুসলমান স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে বিশাল বাহিনী সহ সোমনাথ মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। চর্তুদিক থেকে বহু সংখ্যক রাজপুত যোদ্ধা ও রাজাগণ সোমনাথ মন্দির রক্ষার্থে অগ্রসর হলেন। প্রায় পাঁচ হাজার হিন্দু সোমনাথ মন্দির রক্ষার্থে প্রাণ বিসর্জন দিলেন; কিন্তু মন্দির রক্ষা করতে পারলেন না। মন্দিরের পূজারী সহ বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণকে হত্যা করে মামুদের আদেশে মন্দির অপবিত্র করে মন্দিরের সকল বিগ্রহাদি ভেঙে ফেলা হল। এই মন্দির হতে দুই কোটি স্বর্ণমুদ্রা ও বিগ্রহের অলংকারাদি হতে প্রভূত পরিমাণ স্বর্ণ রৌপ্য মণি মুক্তা তিনি লুণ্ঠন করলেন। মন্দির ও প্রতিমা ধ্বংসের সেই আয়াতটি হলো —

"রোজ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র আদেশে তাঁর ফিরিস্তারা প্রতিমাপূজক এবং দেব প্রতিমাগুলোকে একত্র করে জাহান্নামে ছুড়ে মারবে।" (কো- ৩৭/২২-২৩)

সুলতান মাহমুদের পর মোহাম্মদ ঘোরী ভারত আক্রমণ করেন। মোহাম্মদ ঘোরী ভাতিন্দা আক্রমণের পর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন কালে পৃথ্বিরাজ ঘোরীকে ধাওয়া

করেন। থানেশ্বরের নিকট তরাইন নামক স্থানে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হল। ঘোরীর সেনাবাহিনী সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হল এবং ঘোরী স্বয়ং যুদ্ধে আহত হলেন ও বন্দী হলেন। পৃথ্বিরাজ হিন্দু অনুশাসন মতে ঘোরীকে ক্ষমা করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সুযোগ করে দিলেন। এই ভারতীয় নীতিই পৃথ্বিরাজের জন্য ও ভারতের হিন্দুদের কাল হয়ে দাঁড়াল। হতভাগা পৃথ্বিরাজ জানতেন না ভারতীয় নীতি আর কোরানের নীতি এক নয়। আর তাই পরের বছর (১১৯২) কোরানের আদর্শ মতে যুদ্ধের রীতি নীতি ভঙ্গ করে ঘোরী পৃথ্বিরাজকে হত্যা করলেন। এরপর ঘোরী স্থাপত্য শিল্পের এক অনন্য নিদর্শন আজমীরের হিন্দু মন্দির ধূলিসাৎ করে সেখানে মসজিদ ও ইসলাম ধর্মের শিক্ষা কেন্দ্র নির্মাণ করলেন। তারপর হিন্দুর রক্তে রাঙিয়ে তিনি দিল্লী ও বেনারস অভিযান করেন। অসান দুর্গ দখল করে মুসলমানরা নির্বিচারে হিন্দু হত্যা করতে করতে বেনারস পৌঁছায় এবং সেখানেও হিন্দু হত্যা চালাতে থাকে। মুসলমান ঐতিহাসিক হাসান নিজাম তাঁর 'তাজ উল মাসির' গ্রন্থে এই বর্বরতা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, "তার তরবারির ধার সমস্ত হিন্দুকে নরকের আগুনে নিক্ষেপ করল। তাদের কাটা মুণ্ড দিয়ে আকাশ সমান তিন খানা বুরুজ বা গম্বুজ নির্মাণ করা হল এবং কবন্ধগুলো বন্য পশুর খাদ্যে পরিণত হল।"

("By the edge of the swords they (Hindu) were dispatched to the fire of hell. There bastions were raised as high as heaven with their heads and their carcasses become the food of beasts of prey." (Elliot & Dowson, Vol. II, p- 224)

সেই একই ঘটনা মিনহাজ তার 'তাবাকাত-ই-নাসিরীতে' বর্ণনা করেছেন, "জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করল। আর যারা সনাতন ধর্ম ত্যাগ করতে অস্বীকার করল তাদের সবাইকে হত্যা করা হল।"

"..... of the garrison those who were wise and acute were converted to Islam but those who stood by their ancient faith were slain." (Elliot & Dowson, Vol. II, p- 222)

এরপর ঘোরীর উত্তরসূরী কুতুবউদ্দিন এক হাজার ঘোরসওয়ার বিশিষ্ট বাহিনী নিয়ে কাশীর দিকে অগ্রসর হন। পথে অসনি দুর্গ অধিকার করে ব্যাপক লুণ্ঠন চালান। ঐতিহাসিক মিনহাজ লিখেছেন, "সেখানে এত লুটের মাল পাওয়া গেল তা দেখতে দর্শনার্থীদের চোখ ক্লান্ত হয়ে পড়ল।" ("Immense booty was obtained such as the eye of the beholder would be weary to look at." (Elliot & Dowson, Vol. II, p- 223))

কাশী নগরী দখল করার পর কুতুবউদ্দিন মুসলমানদের আদেশ দিলেন, সকল হিন্দু মন্দির ধ্বংস করতে হবে। এ প্রসঙ্গে মিনহাজ লিখেছেন, "তারা প্রায় এক হাজার হিন্দু মন্দির ধ্বংস করল, এবং সেই মন্দিরের ভিতের উপর মসজিদ নির্মাণ করল।"

সেখান থেকে চলে গেলেন আজমীর। সেখানকার ধ্বংসলীলা মিনহাজের বর্ণনায়, "সেখানে ধর্ম (ইসলাম) প্রতিষ্ঠিত হল, বিদ্রোহের পথ বন্ধ হল। বিধর্মী কাফেরদের প্রাধান্য

রুদ্ধ হল এবং মূর্তিপূজার সমস্ত প্রতিষ্ঠান (মন্দির) নির্মমভাবে ধ্বংস করা হল।" ("Religion i.e. Islam was established; the road of rebellion was closed, infidelity was cut off an d foundation of idol worship were utterly destroyed.")

এরপর ১১৯৬ খৃষ্টাব্দে কুতুবউদ্দিন গোয়ালিয়র আক্রমণ করেন। ঘটনাটি বর্ণনা করতে গিয়ে হাসান নিজামী তাঁর 'তাজ উল মাসির'-এ লিখেছেন, "ইসলামের সেনারা সম্পূর্ণ ভাবে বিজয়ী হল। মূর্তি পূজার সমস্ত কেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠানকে (মন্দিরকে) ধ্বংস করা হল এবং সেখানে ইসলামের নিদর্শন স্বরূপ মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ করা হল।"

("The army of Islam was completely victorious and one hundred thousand groveling Hindus were swiftly dispatched to the hell of fire. He destroyed the pillars and foundation of the idol temples and built in there stead Mosques and colleges and precepts of Islam." (Elliot & Dowson, Vol. II, p- 215))

১১৯৭ সালের জানুয়ারী মাসে কুতুবউদ্দিন ও মোঃ ঘোরী গুজরাট আক্রমণ করেন এবং পথে নাহরয়োলা দুর্গ আক্রমণ করেন। মাউন্ট আবুর এক গিরিপথে রাজা করন সিং ও মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে করন সিং হেরে যান। মিনহাজ লিখেছেন, "প্রায় পঞ্চাশ হাজার বিধর্মী কাফেরকে তরবারির সাহায্যে নরকের আগুনে চালান করা হল এবং তাদের শব দেহের স্তূপ পাহাড়ের সমান উঁচু হয়ে গেল। .... বিশ হাজারেরও বেশী ক্রীতদাস কুড়িটি হাতি সহ এত লুটের মাল বিজয়ীদের হাতে এলো যা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।"

("Nearly fifty thousand infidels were dispatched to hell by the sword and from the leaps of the slain the hills and the plain become one level .... more than twenty thousand slaves and twenty elephants and cattle and arms beyond all calculation fell into the hands of victors." (Elliot & Dowson, Vol. II, p- 230)

১২০২ সালে কুতুব উদ্দিন কালিঞ্জর দুর্গ আক্রমণ করেন। মিনহাজ লিখেছেন, "সমস্ত মন্দিরকে মসজিদে রূপান্তরিত করা হল, ৫০ হাজার হিন্দুকে (নারী ও শিশুসহ) ক্রীত দাস হিসাবে পাওয়া গেল এবং (পুরুষ) হিন্দুর রক্তে মাটি পীচের মত কালো হলে গেল।"

(The temples were converted into mosques ... fifty thousand men come under the collar of slavery and the plain become black as pitch with blood of Hindus." (Elliot & Dowson, Vol. II, p- 231)

মুসলমানদের হত্যাযজ্ঞে ভীত হয়ে প্রাণ রক্ষার্থে এবং জিজিয়া কর না দিতে পারার কারণে যারা মুসলমান হতে বাধ্য হয়েছিল, তাদের উপর দয়া করেই মুসলমান শাসকগণ মন্দির গুলোকে ঘষে মেজে ও প্লাস্টার করে মসজিদে রূপান্তরিত করেছিলেন। এই সব নও মুসলমানদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে, তারা নিয়মিত নামাজ রোজা

পালন করে খাঁটি মুসলমান হলে তাদেরকে উচ্চ রাজকর্মচারী পদে নিযুক্ত করা হবে। কিন্তু সাধারণ সৈনিকের কাজ ভিন্ন অপর কোন বৃত্তি গ্রহণের সুযোগ না পাওয়ায় এবং তাদেরকে দিয়ে হিন্দু মন্দির ধ্বংস, হিন্দু হত্যা ও হিন্দু নির্যাতন করালে মুসলমানদের আচরণে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তারা পুনরায় হিন্দু ধর্মে ফিরে আসার উদ্যোগ নিলে গুজরাট হতে ফিরবার পথে সম্রাট আলাউদ্দিনের আদেশে এক দিনে বিশ হাজার নও মুসলমানকে হত্যা করে নারকীয় পৈশাচিক কাণ্ড ঘটানো হল। ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দিন চিতোর আক্রমণ করেন। চিতোর আক্রমণের প্রত্যক্ষ কারণ ও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রাজপুত রানা রতন সিংহের অনন্যা সুন্দরী রাণী পদ্মিনীকে হস্তগত করা। ... রতন সিংহ বীরদর্পে আলাউদ্দিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত পরাজিত ও ধৃত হলেন। রাজপুত বীর গোরাচাঁদ ও বাদল অসাধারণ বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করলেন; কিন্তু বিশাল সুলতানী বাহিনীকে পরাজিত করা অসম্ভব দেখে রাজপুত নারীগণ জহরব্রত অর্থাৎ অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। এ ভাবে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে তারা মুসলমানদের হাতে বন্দী হওয়ার অপমান হতে পরিত্রাণ পেলেন।

["The funeral pyre was lighted within the great subterranean retreat in chambers impervious to the light of the day and the defenders of chitor beheld in procession the queens their own wives and daughters, to the number of several thousands. The fair padmini closed the throne ..... They were conveyed to the cavern and the opening closed upon them to find security from dishonor in the devouring element." [An Advanced History of India, pp- 232-3]

কাজী মুগিস উদ্দিন বলেছেন সম্রাট আলাউদ্দিন কার্যসিদ্ধির (ইসলাম প্রতিষ্ঠার) জন্য ন্যায় অন্যায় বা নীতি আদর্শের ধার ধারতেন না।

"Men are headless, disrespectful and disobey my command: I am then compelled to be severe to bring them to obedience. I do not know whether this is lawful, whatever I think to be for the good of the state or suitable for the emergency, that I decree, and as for as for what may happen to me on the approaching day of judgment that I know not." [Ala-ud-din to Quazi Mughis-un-din, p-81]

অর্থের প্রাচুর্য্য থাকলেই বিদ্রোহের মনোবৃত্তি ও সামর্থ্য জন্মে থাকে; এই ছিল আলাউদ্দিনের ধারণা। এজন্য তিনি ধনবান হিন্দু মাত্রকেই নানা ভাবে শোষণ করে তাদের অর্থবল নাশ করলেন।

"No Hindu could hold up his head and in his house no sign of gold or silver or any super fluty was to be seen." [Smith, Oxford History of India, p-234.]

তিনি দোয়াব অঞ্চলের হিন্দুদের নিকট হতে উৎপন্ন ফসলের অর্ধাংশ রাজস্ব হিসেবে আদায় শুরু করলেন এবং হিন্দু জনসাধারণের উপর এমন অসহনীয় করভার স্থাপন করলেন যাতে তারা এই করমুক্তির আশায় দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

তার এ ধরনের কার্যকলাপে মুসলমান মাওলানাগণ খুব খুশি হয়েছিলেন। মিশরের জনৈক বিখ্যাত ইসলামী আইন বিশারদ আলাউদ্দিন খিলজীকে এক পত্রে লিখেছিলেন, "শুনলাম আপনি নাকি হিন্দুদের এমন অবস্থা করেছেন যে, তারা মুসলমানদের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করছে। এরূপ কাজ করে আপনি ইসলাম ধর্মের অশেষ উপকার সাধন করেছেন। একমাত্র এই কাজের জন্য আপনার সকল পাপের মার্জনা হবে।"

"I have heard you have degraded the Hindus to such an extent that their wives and children beg their bread at the doors to muslims. You are, in doing so, rendering a great service to religion. All your sins will be pardoned by reason of this single act." [An Egyption Jurist to Alauddin, Sinha & Banergee, p-317.]

সম্রাট গিয়াউদ্দিন আলাউদ্দিনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে হিন্দুরা যাতে মুসলমানদের বাড়ীতে ভিক্ষা করে বেড়ায় সেজন্য বিভিন্ন নির্দেশ জারী করলেন। এরপর ক্ষমতায় আসলেন ফিরোজ শাহ্। তিনি ক্ষমতায় এসেই নবীজির আদর্শ অনুসরণ করে বিভিন্ন মন্দিরকে মসজিদে রূপান্তর ও মন্দির সমূহকে অপবিত্র করতে লাগলেন। তিনি পুরীর বিখ্যাত জগন্নাথ দেবের মন্দির অপবিত্র করলেন এবং জগন্নাথ দেবের মূর্তিটি মুসলমানগণ কর্তৃক পদদলিত করাবার উদ্দেশ্যে দিল্লী নিয়ে গেলেন।

"Firuz reached puri, occupied the Raja's palace and took the great idol, which he sent to Delhi to be trodden under foot by the faithful." [Cambridge History of India, Vol-III, p-171]

১৩৬০ সালে ফিরোজ শাহ্ তুঘলক উড়িষ্যা অভিযান করে এবং পুরীর জগন্নাথের (পুনঃ তৈরী) বিগ্রহ নিয়ে সমুদ্রে ফেলে দেয়। ফেরার পথে জাজনগরে এসে শুনতে পেল সেখানকার লোকেরা ভয়ের চোটে সমুদ্রের একটি দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছে। ফিরোজ শাহ সৈন্য নিয়ে সেই দ্বীপে গেলেন এবং এক লক্ষ বিশ হাজার হিন্দুকে হত্যা করে এক তুঘলকি কাণ্ড ঘটালেন। ফিরোজ শাহ্ খাঁটি মুসলমান ছিলেন। এ কারণে অমুসলমান প্রজাবর্গের উপর নানা ধরনের কর আরোপ করে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। অমুসলমান প্রজাদের ধর্মের প্রতি তার বিন্দু মাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি ইসলামী আদর্শে পৌত্তলিকতার বিনাশ সাধন পরম ধর্ম বলে জ্ঞান করতেন। তিনি কোরানের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে গিয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে অমুসলমান প্রজাদের উপর অত্যাচার, জিজিয়া কর স্থাপন, বাধ্যতামূলক নও মুসলমানদের জন্য মন্দিরগুলোকে সামান্য পরিবর্তন করে মসজিদে রূপান্তর এবং হিন্দুদের নানাভাবে নির্যাতন করে মুসলমান হতে বাধ্য করতে লাগলেন।

এরপর ভারত আক্রমণ করেন তৈমুর লঙ। দিল্লীর সুলতানগণ পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ সাধন না করে পৌত্তলিকদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করছে, এই অজুহাতে তিনি দিল্লী আক্রমণ করলেন। দিল্লী অভিমুখে যাত্রাপথে দীপালপুর, ভাতনেইর প্রভৃতি স্থান লুণ্ঠন করে এবং অসংখ্য নর-নারীর প্রাণ নাশ করে দিল্লীর উপকণ্ঠে এসে উপস্থিত

হলেন। সেখানে তিনি প্রায় এক লক্ষ হিন্দু বন্দীকে হত্যা করে এক নারকীয় কাণ্ড করলেন। এরপর তৈমুর দিল্লী পৌঁছালে তাঁর সেনাবাহিনীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে হিন্দু নাগরিকগণ আত্মরক্ষার চেষ্টা করলে এক ব্যাপক হত্যাকাণ্ড শুরু হয়। তৈমুরের দুর্ধর্ষ বাহিনী অগণিত হিন্দু নর নারীর রক্তে রঞ্জিত করল। দিল্লী নগরীতে কয়েকদিন ধরে পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড লুণ্ঠনের পর তৈমুর সিঁরি, জাঁহাপনা ও পুরাতন দিল্লী সহ আরও তিনটি শহরে প্রবেশ করে অনুরূপ লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড ঘটালেন। দিল্লী হত্যাকাণ্ড এমন পৈশাচিক এবং এত পরিমাণ মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল যে, এই হত্যা কাণ্ডের পরবর্তী দু'মাস পর্যন্ত দিল্লীর আকাশে কোন পাখী উড়ে নাই।

"So complete was the desolation that the city (Delhi) was utterly ruined, and those of the inhabitants who were left died while for two whole months not a bird moved wings in Delhi." [Cambridge History of India, vol III, p-201.]

এই হত্যাকাণ্ড এত পৈশাচিক হয়েছিল যে, বিভিন্ন স্থানে মুসলমান রাজকর্মচারীরা এই খবর প্রচার করে করে হিন্দুদেরকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে নির্দেশ দেয়; নির্দেশ না মানলে তৈমুরের বাহিনীকে খবর দেবে, এই ভয়ও দেখানো হয়। ফলে বিভিন্ন স্থানে ভয়ার্ত মানুষ দলে দলে মুসলমান হতে লাগল। সেজন্য বাংলায় এখনো 'শুনে মুসলমান' কথাটি প্রচলিত আছে।

সিকান্দর শাহ ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক মুসলমান। তিনি হিন্দুদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালাতেন। তারই আদেশে মথুরার বিখ্যাত হিন্দু মন্দিরটি ধূলিসাৎ করা হয়েছিল। তিনি হিন্দুদের যমুনা নদীতে স্নানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। জনৈক ব্রাহ্মণ 'হিন্দু ধর্ম ইসলাম ধর্ম অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহে' — এ কথা বলার অপরাধে সুলতানের আদেশে প্রাণ হারিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন প্রচণ্ড হিন্দু বিদ্বেষী ও ইসলাম ধর্ম মতে পরম ধার্মিক মুসলমান শাসক। তার অত্যাচারে এবং আদেশে কাশ্মীরের হিন্দুগণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। (ভারতের ইতিহাস কথা, ড. কে.সি চৌধুরী, পৃ- ১৩৭)

পরম্পরা অনুসারে ১৩৯৪ খৃষ্টাব্দে সিকান্দর কাশ্মীরের গদি পেলেন। তিনি প্রচণ্ড মূর্তি বিদ্বেষী ছিল। কিন্তু যাকে ধর্ম বলা হয় তিনি সেই ইসলামের শ্রীবৃদ্ধি করলেন কিভাবে? হিন্দুদের সামনে তিনটে বিকল্প পথ রাখলেন — ধর্মান্তর, দেশত্যাগ অথবা মৃত্যু। যারা ধর্মান্তর গ্রহণ করল না, অথচ দেশত্যাগও করল না এমন কতজন যজ্ঞোপবীতধারী কিংবা পণ্ডিত হত্যা করলেন তার হিসাব প্রসঙ্গে লরেন্স বলেছেন, সংখ্যা দিয়ে গোনা সম্ভব নয়। তাই শিরচ্ছেদ করার পর সেই হিন্দুদের যজ্ঞোপবীত একত্রিত করে ওজন করা হল। দেখা গেল তার ওজন ৭ মন। সংখ্যা লিখে তারপর কতগুলো শূন্য দিয়ে লম্বা চওড়া একটা রাশি বলা বা মনে রাখার চেয়ে গোনবার বা মনে রাখবার এটা একটা সহজ উপায়। সেই ৭ মন যজ্ঞোপবীত পোড়ানো হল! হিন্দু

শাস্ত্রে বিদ্যাভ্যাসের জন্য কয়েক পুরুষ ধরে যত্ন করে রাখা অগণিত গ্রন্থাবলী এই সুলতান কাশ্মীরের 'ডাল' সরোবরে ডুবিয়ে নষ্ট করলেন।

১৭৫০ থেকে ১৮১৯ পর্যন্ত কাশ্মীর পাঠান আধিপত্যে ছিল। পাঠানদের রাজ্য শাসনকালে এ রকম, কোন কোন ক্ষেত্রে এর চেয়েও ভীষণ, নিষ্ঠুর কার্যক্রম চালু করা হল।

আজাদ খাঁন নামকএক পাঠান প্রশাসকের 'হিংস্র বাতিক' ছিল ব্রাহ্মণদের জোড়ায় জোড়ায় ঘাসের বস্তায় ভরে ডাল সরোবরে ডুবিয়ে মারা। তিনি জিজিয়া করও পুনঃ চালু করলেন। মীর হজর নামক আর এক পাঠান প্রশাসক আজাদ খাঁনের পদ্ধতির একটু পরিবর্তন করলেন। ঘাসের বস্তার বদলে তিনি চামড়ার বস্তা ব্যবহার করতে লাগলেন।

তারপর এলেন মহম্মদ খাঁন। ইনি বেশী অত্যাচার করতেন মেয়েদের উপর। তার হাতে থেকে নিজেদের ঘরের মেয়েদের রক্ষা করতে হিন্দুরা মেয়েদের সৌন্দর্য নষ্ট করার জন্য তাদের মাথা মুড়িয়ে ফেলতেন এবং অনেক সময় নাকও কেটে ফেলতেন। দিনের পর দিন এই সব ভয়ঙ্কর অত্যাচার কাশ্মীরবাসী সহ্য করতে থাকলেন এই আশায় যে, কাশ্মীরে হিন্দু আধিপত্যে আসবে। অনেকে বাধ্য হয়ে মুসলমান হলেন।

রাজা হরি সিং ক্ষমতায় থাকাকালে মুসলমানদের বিশ্বাসঘাতকতা কাকে বলে তা বুঝলেন। পাকিস্তান সৃষ্টির দু'মাস পরে ১৯৪৭-এর ২২শে অক্টোবর পাকিস্তানের মুসলমান গোষ্ঠী কর্তৃক কাশ্মীর আক্রান্ত হলো। তখন কাশ্মীরের নিজস্ব সৈন্যবাহিনী ছিল। সেই সৈন্য ছিল মুজাফরাবাদে। নারায়ণ সিং ছিলেন সেই বাহিনীর প্রধান। অধিকাংশ সৈনিকেরা ছিল মুসলমান। বেতন দিতেন কাশ্মীরের রাজা। যখন আক্রমণ হলো, তখন বাহিনীর মুসলমান সৈনিকেরা অস্ত্র শস্ত্র সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে আক্রমণকারী পাকিস্তানী মুসলমানদের সাথে মিলিয়ে গেল। শুধু তাই নয়, তারা সমস্ত গোপন জায়গা দেখিয়ে দিল এবং যাবার সময় তারা সেনাবাহিনীর প্রধান এবং উপ প্রধানকেও হত্যা করে গেল। ৪ঠা নভেম্বর মুসলমান সৈনিকেরা লে. কর্নেল মজিদ খানের নেতৃত্বে গিলগিটে স্বতন্ত্র রাজ্যের ঘোষণা করলো। সম্পত্তি লুটপাট করা এবং হিন্দু মেয়েদের জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া হলো। ভি. পি. মেনন লিখেছেন, নাদির শাহ'র দিল্লী ধ্বংসের বর্ণনা আমরা পড়েছি। এরা তারই পুনরাবৃত্তি এখানে করেছে। ৮ই নভেম্বর হিন্দুস্থানের সৈন্যরা বারমুল্লা পুনরুদ্ধার করলো। ১৪ হাজার লোক বসতির সেই জায়গায় বড়জোর এক হাজার লোক বেঁচে ছিল। ১১ই নভেম্বর রাজৌরীতে মুসলমানদের অমানুষিক অত্যাচারের নমুনা দেখা গেল। দশ হাজার হিন্দু হত্যা করা হল। তিন হাজার হিন্দু মহিলা তহশিল অফিসের মধ্যে অগ্নিকুণ্ড রচনা করে তার মধ্যে প্রবেশ করলো। হিন্দুস্থানের সৈন্যরা যখন রাজৌরীতে পৌঁছলো তখন তারা দেখলো শুধু মৃত দেহের স্তূপ। ২৫শে নভেম্বর মীরপুরে ১৫ হাজার হিন্দু হত্যা করা হল।

আজও চলছে ...।

আবার একটু পেছনে দিকে ফিরে যাই। ইখতিয়ার উদ্দিন মোহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ বিহার অঞ্চলে ওদন্তপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও বিখ্যাত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে আক্রমণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় তিন হাজার উচ্চতম ডিগ্রিধারী শিক্ষক এবং প্রায় বিশ হাজার ছাত্র ছাত্রীকে হত্যা করেন। (History of Bengal, Dhaka University, Vol. II, p-3) শামস্ উদ্দিন ইলিয়াস শাহ ১৩৪৬ খৃষ্টাব্দে নেপাল আক্রমণ করে স্বয়ম্ভুনাথ স্তুপ ও শাক্য মুনির পবিত্র ধ্বজা ভস্মীভূত করেন।

মোহাম্মদ শাহ (১ম, ১৩৫৮–৭৭) বিজয়নগর সাম্রাজ্য অতর্কিতে আক্রমণ করে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে চার লক্ষ হিন্দুর প্রাণনাশ করেছিলেন এবং বিজয়নগর সাম্রাজ্য লণ্ডভণ্ড করেন। এমন হত্যাকাণ্ড পৃথিবীর ইতিহাসে দ্বিতীয়টি আর নেই।

তাজ উদ্দিন ফিরোজ শাহ বিজয়নগর সাম্রাজ্য লুণ্ঠন করেন এবং একজন রাজকন্যাকে নিজ হারেমের জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন। পরবর্তী কালে ইউসুফ আদিল খাঁ একজন হিন্দু কন্যাকে জোর পূর্বক বিয়ে করেন। বাহমনী সুলতান ফিরোজ শাহ বিজয়নগরের রাজা দেব রায়কে পরাজিত করেন এবং রাজ কন্যাকে তার সঙ্গে বিয়ে দিতে বাধ্য করেন। এই অপমানে বিজয়নগরের জনগণ প্রতিশোধের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়। ফলে ফিরোজশাহ্ পুনরায় আক্রমণ করে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। ফিরোজ শাহ্ এই পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করতে না পেরে মৃত্যু মুখে পতিত হন।

১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের সকল সুলতানী বাহিনী এক সঙ্গে বিজয়নগর আক্রমণ করেন। ফলে সায়নাচার্য্যের স্বপ্নের বিজয়নগরের গৌরবসূর্য তালিকোটার প্রান্তরে চিরতরে অস্তমিত হল। বিজয়ী মুসলমান সৈন্য বিজয়নগরে প্রবেশ করে দীর্ঘ পাঁচ মাস ধরে অবাধ লুণ্ঠন চালালো। বুরহান-ই-মাসির ও ফিরিস্তির বর্ণনা থেকে জানা যায়, কল্পনাতীত পরিমাণ মণি-মুক্তা, ধন-দৌলত, অসংখ্য হাতি, ঘোড়া, উট, দাস-দাসী বিজয়ী সৈন্যগণ কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়েছিল। বিজয়ী মুসলমানগণ কেবলমাত্র মুল্যবান সামগ্রী লুণ্ঠন করেই ক্ষান্ত ছিলেন না; বিজয়নগরকে তারা বিরাট ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে বিজয়নগরের ন্যায় সমৃদ্ধ নগরীর এইরূপ আকস্মিক ধ্বংসস্তুপে পরিণত হওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল। নগরের যাবতীয় মন্দির, প্রাসাদ, হর্ম্যাদি ভস্মস্তুপে পরিণত করেও পরাজিতের প্রতি হিংসাপরায়ণতার অবসান হল না। অবশেষে লক্ষ লক্ষ হিন্দু নর-নারী এবং শিশু বৃদ্ধের রক্তে বিজয়নগরের ধূলি রঞ্জিত করে তারা লুণ্ঠন যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিল।

"Never perhaps in the history of the world has such havoc been wrought so suddenly, on so splendid a city teeming with a wealthy and industrious population in the full plentitude of prosperity one day and on the next seized, pillaged and reduced to ruins, amid scenes of savage massacre and horrors beggaring description." [Sewel: A Forgotten Empire, vide, An Advanced History of India, p-373]

তৎকালীন অন্যান্য মুসলমান শাসকগণের ন্যায় শেরশাহও (১৫৪১) পাইকারী হারে হিন্দু হত্যা, হিন্দু সম্পত্তি লুট, হিন্দু নারীর উপর বলাৎকার এবং হিন্দু মন্দির ধ্বংসের ব্যাপারে সমান পটু ছিলেন। হিন্দুর সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করতে তার কোন দ্বিধা ছিল না। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ্ হবার পর ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দে শেরশাহ রায়সিনের হিন্দু রাজা পুরনমলের দুর্গ আক্রমণ করেন। পুরনমলের সৈন্যরা প্রথমে প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করেন এবং পরে দুর্গের মধ্যে আশ্রয় নিলেন। প্রায় ৬ মাস দুর্গ অবরোধের পর শেরশাহ কামান দিয়ে দুর্গের ক্ষতি করতে থাকেন। পুরনমল তখন খবর পাঠালেন যে, তাকে ও তার লোক জনকে পরিবার পরিজন সহ্ পালিয়ে যেতে দিলে তিনি দুর্গ ছেড়ে চলে যাবেন। শেরশাহ্ তাতে সম্মতি জানান। পুরনমলের লোকজন তখন দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসেন এবং শেরশাহের নির্দেশ মত দুর্গের বাইরে তাবু খাটিয়ে অবস্থান করতে থাকেন। ইতিমধ্যে শেরশাহ্ সবাইকে হত্যা করার গোপন পরিকল্পনা করে এবং পরদিন সকালে শেরশাহের সৈন্যরা তাদের ঘিরে ফেলে। অবস্থা বুঝতে পেরে পুরনমল তার স্ত্রী রত্নাবলীর মাথা তরোয়াল দিয়ে কেটে ফেলেন এবং অন্য সবাইকেও হুকুম দিলেন নিজ নিজ পরিবারের মহিলাদের মাথা কেটে ফেলতে। মুসলমানরা ইতিমধ্যে আক্রমণ শুরু করে দিয়েছে। আব্বাস খাঁ ইংরেজীতে ঘটনাটির যে বর্ণনা দিয়েছেন বাংলায় তা এরূপ —

'হিন্দুরা তাদের নিজ নিজ পরিবারের ও অন্যান্যদের (অর্থাৎ নাবালক ও শিশুদের) হত্যা করতে ব্যস্ত, ইত্যবসরে আফগানরা চর্তুদিক থেকে তাদের ঘিরে ফেলল এবং তাদের হত্যা করতে শুরু করল। শুয়োর খানা-খন্দে পড়ে গেলে যেমন হয় হিন্দুরাও সেই রকম অসহায় হয়ে পড়ল। পুরনমল ও তার লোকেরা বীরত্ব ও বিক্রম দেখাতে চেষ্টা করল বটে, তবে চোখের পলকে আফগানরা সবাইকে কচু কাটা করে ফেলল। যে সব নারী ও শিশুদের হিন্দুরা হত্যা করে উঠতে পারেনি, তাদের সবাইকে বন্দী করা হল। তাদের মধ্য থেকে পুরনমলের এক কন্যা ও তার বড় ভাইয়ের তিন ছেলেকে জীবিত রেখে বাদবাকি সকলকে হত্যা করা হল। শের খাঁ পুরনমলের মেয়েকে কয়েকজন বাজীগরের হাতে তুলে দিল। যাতে তারা তাকে হাটে বাজারে নাচাতে পারে। আর ছেলে তিনটিকে খোজা বানাবার হুকুম দেওয়া হল যাতে অত্যাচারী হিন্দুরা বংশ বিস্তার করতে না পারে।'

"While the Hindus were employed in putting their women and families to death, the Afghans on all sides commenced the slaughter of the Hindus. Puranmal and his companions like hogs at a boy, failed not to exhibit valour and gallantry, but in the twinkling of an eye all were slain, were captured. One daughter of puranmal and three sons of his elder brother were taken alive and the rest were all killed. Sher khan gave the daughter of Puranmal to some ilinerent minstrels (bazigar) that they might make her dance in the bazaars. And orderd the boys to be castrated,

that the race of the oppressors might not increase." [Elliot & J. Dowson, IV, pp-401-3]

রোহতাস দুর্গের হিন্দু রাজা হরেকৃষ্ণ রায় শেরশাহের বন্ধু ছিলেন। ১৫৩৭ সালে হুমায়ুন শেরশাহের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। সেই সময় শেরশাহের হারেমে ১০০০ রমণী ছিল এবং তারা সবাই চুনারগড় দুর্গে বাস করত। চুনার গড় দুর্গ ততটা সুরক্ষিত নয় তাই শেরশাহ রাজা হরেকৃষ্ণ রায়কে অনুরোধ করলেন হারেম শুদ্ধ তার পরিবারকে আশ্রয় দেবার জন্য। এর আগে রাজা শেরশাহের ছোট ভাই মিয়া নিজাম ও তার পরিবারকে রোহতাস দুর্গে আশ্রয় দিয়ে উপকার করেছিলেন। কিন্তু রাজা চট করে শেরশাহের প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পারলেন না। তার ইতস্ততঃ ভাব দেখে শেরশাহ কোরান ছুঁয়ে শপথ করেন এবং এর ফলে রাজা তাকে আশ্রয় দিতে রাজী হন। কিন্তু সেই মূর্খ রাজার জানা ছিল না যে, কোরান হিন্দু ধর্মগ্রন্থের মত নয়। কোরানে আল্লাহ্‌র নির্দেশ আছে, বিধর্মী অমুসলমান কাফেরদের সঙ্গে যেকোন রকম মিথ্যাচার, ছলনা ও বিশ্বাসঘাতকতা করা চলে। ফলে সেই রাতেই শেরশাহ্ রোহতাস দুর্গ দখলের ছক করে ফেললেন। ১২০০ ডুলি সাজানো হল এবং প্রত্যেক ডুলিতে দু'জন করে পাঠান সৈন্য বোরখা পরে অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে বসে রইল। প্রথম কয়েকটা ডুলিতে কিছু মহিলা ছিল। তাই দুর্গের রক্ষীরা প্রথম কয়েকটা ডুলি পরীক্ষা করে চক্রান্ত বুঝতে পারল না। এদিকে শেরশাহ্ রাজার কাছে খবর পাঠালেন যে, তাঁর রক্ষীরা ডুলি পরীক্ষা করে মুসলমান রমণীদের অসম্মান করছেন। কাজেই ডুলি পরীক্ষা বন্ধ হল এবং প্রায় আড়াই হাজার আফগান সৈন্য দুর্গের মধ্যে ঢুকে পড়ল। মুহূর্তে তারা আক্রমণ করে কারারক্ষীদের হত্যা করলো এবং দুর্গ দখল করে নিল। রাজা হরেকৃষ্ণ রায় কোন মতে গুপ্ত পথ দিয়ে পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করলেন। [Elliot & J. Dowson, IV, p-361]

শেরশাহের বাল্য নাম ছিল ফরিদ খাঁ। প্রথম জীবনে তিনি দস্যুদের নেতা ছিলেন। এই দস্যুবৃত্তির কাজ কিভাবে হত? ঐতিহাসিক আব্বাসের বর্ণনা অনুসারে, "তিনি তাঁর ঘোড়সওয়ারদের সর্বক্ষণ গ্রামের চর্তুদিকে পাহারা দিতে বললেন। সমস্ত পুরুষদের হত্যা করতে এবং নারী ও শিশুদের বন্দী করতে হুকুম দিলেন। সমস্ত গরু-বাছুর তুলে আনতে চাষ-আবাদ বন্ধ করতে এবং ক্ষেতের ফসল বিনষ্ট করতে হুকুম দিলেন। গ্রামের কোন লোক পাশাপাশি কোন গ্রাম হতে কিছু যাতে না আনতে পারে, সে ব্যবস্থা করতে আদেশ দিলেন।

১৯৭১-এ বাংলাদেশে ইয়াহিয়া বাহিনী একই নীতি অনুসরণ করেছিল।

হাসান খাঁর অধীনে অনেক আফগান চাকরী করত। তাদের কোন জমি জায়গা বা জায়গীর ছিল না। প্রথমে ফরিদ খাঁ সেই সব আফগানদের জায়গীরের প্রলোভন দেখিয়ে একত্র করে ছোটখাট একটা দস্যু দল গঠন করলেন। তখন বিহারে আরও অনেক আফগান বাস করত। ফরিদ খাঁ সেই সব স্বজাতীয় আফগানদের আহ্বান জানান তার দলে যোগ দেবার জন্য— "যার ঘোড়া আছে সে ঘোড়ার চড়ে এবং অন্যান্যরা

পায়ে হেঁটে আমার দলে যোগ দাও।"

জায়গীর ও লুটের মাল পাবার লোভে তারাও এসে যোগ দিল। এই দল নিয়ে ফরিদ খাঁ.জমিদার ও বিত্তশালী হিন্দুদের টাকা পয়সা সহায় সম্বল লুটপাট করতে শুরু করে দিল। এরকম একটি আক্রমণ বর্ণনা করতে গিয়ে আব্বাস খাঁ লিখেছেন, "অতি প্রত্যুষে ফরিদ খাঁ তার দল-বল নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে সেই সব জমিদারদের, ইসলামী মতে যারা অপরাধী, তাদের আক্রমণ করল। সব পুরুষদের হত্যা করা হল এবং বন্দী নারী ও শিশুদের ক্রীতদাস হিসেবে বেঁচে দিতে অথবা নিজের কাজে ব্যবহার করতে হুকুম দিল। অন্য লোকদের (মুসলমানদের) সেখানে এনে বসতি করতে আদেশ জারি করলেন।"

সম্রাট বাবরের নাম সকলেই জানেন। ফতেপুর সিক্রী আক্রমণ সম্পর্কে এই বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "শত্রুকে পরাজিত করার পর আমরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলাম এবং ব্যাপক ভাবে হত্যা করতে থাকলাম। আমাদের শিবির থেকে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে ছিল তাদের শিবির। সেখানে পৌঁছে আমি মুহম্মদী ও আরও কয়েকজন সেনাপতিকে হুকুম দিলাম তাদের হত্যা করতে, কেটে দু'খানা করতে, যাতে তারা আবার একত্রিত হবার সুযোগ না পায়।" কত হিন্দুকে সেদিন হত্যা করা হয়েছিল তার কোন হিসাব পাওয়া যায় না। বাবর হুকুম দিলেন, কাছাকাছি একটি পাহাড়ের কাছে সমস্ত নরমুণ্ডকে জড়ো করে একটি স্তম্ভ তৈরী করতে। "সেই টিলার উপর কাটা মুণ্ডের একটি মিনার বানাতে হুকুম দিলাম। বিধর্মী (হিন্দু) ও ধর্মত্যাগীদের অসংখ্য মৃত দেহ পথে ঘাটে ছড়িয়ে ছিল। এমন কি দূর দেশ আলোয়ার, মেওয়াট ও বায়না যাবার পথেও বহু মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা গেল।"

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, অন্যান্য মুসলমান হানাদারের মত বাবরও হিন্দু মন্দির ও হিন্দু বিগ্রহ ধ্বংস করার মত বহু স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। বাবর সম্বল ও চান্দেরীর মন্দির ধ্বংস করে মসজিদ নির্মাণ করেন। বাবরের আদেশে তার সেনাপতি মীর বাকি অযোধ্যার রাম জন্মভূমি ভেঙে তাতে প্রায় এক লক্ষ হিন্দুর রক্ত চুন বালিতে মিশ্রিত করে ইঁট গেঁথে বাবরের নামে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। এছাড়া গোয়ালিয়রের নিকট জৈন মন্দির ও বিগ্রহ ধ্বংস করেন। [R.C. Majumdar, BVB, Vol. VII, p-307]

বাবরের পৈশাচিক নরহত্যা, বন্দী নারী ও শিশুদের চামড়ার চাবুক দিয়ে মারা এবং তদের সাথে পশুর মত ব্যবহার করা ইত্যাদি আরও অনেক বর্বর কাজকর্ম গুরু নানক স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ১৫২১ খৃষ্টাব্দে বাবর প্রথমে শিয়ালকোট ও পরে সৈয়দপুর দখল করে এক ব্যাপক গণহত্যার আদেশ দিলেন। ফলে হাজার হাজার অসামরিক হিন্দু প্রজাকে হত্যা করা হল। এসব দেখে গুরু নানক লিখেছেন, "হে সৃষ্টিকর্তা ভগবান, জীবন্ত যম হিসেবে তুমি কি দানবরূপী এই বাবরকে পাঠিয়েছ? অমানুষিক তার অত্যাচার, পৈশাচিক তার হত্যা লীলা, অত্যাচারিতের বুক ফাটা আর্তনাদ

ও করুণ ক্রন্দন তুমি কি শুনতে পাও না? তাহলে তুমি কেমন দেবতা?" [R.C. Majumdar, BVB, Vol. VII, p-307]

১৫২৭ সালের ১৭ই মার্চ বাবর ফতেপুর সিক্রীর অদূরে খানুয়ার প্রান্তরে রাণা সংগ্রাম সিংহের সঙ্গে যুদ্ধে অরতীর্ণ হন। মুসলমানদের বিবরণ অনুসারে, সেদিন দেড় থেকে দুই লক্ষ হিন্দু মুসলমানদের হাতে কাটা পড়েছিল এবং সেই কাটা মুণ্ডু দিয়ে পাহাড় তৈরী করা হয়েছিল।

১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে ভাগ্যের পরিহাসে হিন্দু বীর বিক্রমাদিত্য হেমরাজ ওরফে হিমু বিজয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছেও শেষ পর্যন্ত পরাজিত হলেন। অতিশয় রক্তক্ষরণে মৃতপ্রায় সম্রাট হেমরাজকে বৈরাম খাঁ হাত পা বাঁধা অবস্থায় আকবরের সামনে উপস্থিত করল। এই ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে সমকালীন মুসলমান ঐতিহাসিক আহম্মদ ইয়াদগার 'তারিখ-ই-সালাতিন-ই-আফগানা' গ্রন্থে লিখেছেন, সম্রাট হেমরাজকে ঐভাবে হাত পা বাঁধা অবস্থায় আকবরের সামনে উপস্থিত করে বৈরাম খাঁ বলল, "আজ প্রথম সাফল্যের এই শুভ মুহূর্তে আমাদের ইচ্ছা সম্রাটের মহান হস্ত তরবারির সাহায্যে এই ৰিধর্মী কাফেরের মস্তক ছিন্ন করুক। সেই অনুসারে সম্রাট তার মস্তক অপবিত্র দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করলেন।" (Elliot & J.Dowson, V, pp-65-66]

'আকবর দি গ্রেট' নামের মোঘল সম্রাট যে কতখানি নিষ্ঠুর ও নৃশংস ছিলেন, আর একটি ছোট্ট ঘটনার মধ্য দিয়ে তা আরও সুন্দর ভাবে ফুঠে উঠে। একদা আকবর বিকেলের নামাজ থেকে ফিরে চাকরদের ডাকাডাকি করতে লাগলেন। কিন্তু সাড়া দেবার মত কাছাকাছি কেউ ছিল না। আকবর খুব রেগে গেলেন। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন যে, তার আসনের পাশে এক ছোকরা চাকর মেঝেতে শুয়ে অঘোরে ঘুমাচ্ছে। আকবর পেয়াদাদের ডেকে হুকুম দিলেন, "এক্ষুণি একে মিনারের উপর থেকে নিচে ফেলে দাও। পেয়াদারা তখনি তাকে আগ্রা দূর্গের উপর থেকে নিচে ফেলে দিল। এই ঘটনা বর্ণনা করে মুসলমান ঐতিহাসিক আসাদ বেগ তার 'বিকায়া' গ্রন্থে লিখেছেন, "সিংহাসন ও কৌচের কাছে গিয়ে তিনি (আকবর) দেখতে পেলেন যে, বাতি জ্বালাবার এক হতভাগ্য চাকর কৌচের কাছে মেঝেতে সাপের মত কুণ্ডলি পাকিয়ে মরার মত ঘুমোচ্ছে। ক্রুদ্ধ আকবর সেই চাকরটাকেও মিনারের উপর থেকে নিচে ফেলে দিতে আদেশ দিলেন। তদনুসারে তাকে ছুড়ে ফেলা হল এবং তার শরীর হাজার টুকরো হয়ে গেল। (Elliot & J. Dowson, Vol. VI, p-164) ইনিই মহামতি আকবর, ইংরেজীতে বলা হয় 'Akbar The Great'.

১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে আকবর মেবারের রাণা উদয় সিংহের বিরুদ্ধে অভিযান করেন এবং চিতোর দূর্গ অবরোধ করে দূর্গের দেওয়ালের নিকট বারুদ জমা করে প্রবল বিস্ফোরণ ঘটানো হল। এতে প্রাচীরের অংশ বিশেষ ধ্বংস হয়ে গেল। দূর্গ রক্ষার আর কোন উপায় না দেখে সেদিনই রাজপুত নারীরা জহর ব্রত অনুষ্ঠান করলেন। প্রায় ৩০০ রাজপুত নারী জ্বলন্ত আগুনে আত্মাহুতি দিলেন। দূর্গের মধ্যে তখন মাত্র ৮০০০

রাজপুত সৈন্য অবশিষ্ট ছিল। তারা প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করে সকলেই প্রাণ দিলেন। সব মিটে গেলে পরদিন সকালে বিজয়ী আকবর হাতিতে চড়ে দুর্গে প্রবেশ করলেন। তখন দুর্গের মধ্যে ছিল ৪০ হাজার অসামরিক প্রজা। আশ্রয় নেওয়া ৪০ হাজার রাজপুত কৃষক প্রজার ভাগ্যে কি ঘটল? ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ লিখেছেন, 'দুর্গ অবরোধের সময় ঐ ৪০ হাজার (অসামরিক) কৃষক প্রজা রাজপুত বাহিনীর ৮০০০ সৈন্যকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছিল। সে কারণে সম্রাট তাদের হত্যার আদেশ দিলেন। ফলে সেদিন ৩০ হাজার লোককে হত্যা করা হল।

(The eight thousand Rajput soldiers who formed the regular garrison having been zealously helped during the siege by 40,000 peasants the Emperor orderd a general massacre which resulted in the death of 30,000 (V. A. Smith, p- 90)

ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, সেদিন কত রাজপুত মারা পড়েছিল তার সঠিক সংখ্যা পাওয়া সম্ভব নয়। আবুল ফজল যে ৩০ হাজার সংখ্যা বলেছেন, তা তো শোনা কথা; দেখা নয়। প্রকৃত সংখ্যা ৫০ হাজার, ৮০ হাজার, এক লাখ বা তারও বেশি হওয়া বিচিত্র নয়।

সব থেকে মজার ব্যাপার হল, এই ঘটনার শেষাংশ আমাদের সকল ঐতিহাসিকই সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। কত রাজপুত সেদিন মারা পড়েছিল তা জানতে সম্রাটের খুব ইচ্ছা হয়। কিন্তু অত মৃতদেহ গুনবে কে? শেষে সম্রাটের আদেশে সব মৃত দেহের পৈতা খুলে আনা হল এবং দাঁড়িপাল্লায় ওজন করা হলে মোট ওজন দাঁড়ালো সাড়ে চুয়াত্তর মণ।

ভিনসেন্ট স্মিথ লিখেছেন, "The recorded amount was 74.50 Mans of about eight ounce each. (V.A. Smith, ibid-91)" কাজেই প্রতিটি পৈতার ওজন ৮ আউন্স হলে কত হাজার বা কত লক্ষ পৈতা জড়ো করলে সাড়ে চুয়াত্তর মণ হয় তা অনুমান করা কঠিন কাজ নয়। এর সঙ্গে যোগ করতে হবে মহিলা ও শিশু, যাদের পৈতা ছিল না।

পরবর্তী কালে সম্রাট আওরঙ্গজেব হুকুম জারী করেন যে, প্রত্যেক দিন এমন সংখ্যক হিন্দু হত্যা করতে হবে যাতে তাদের পৈতা জড়ো করলে সোয়া এক মণ হয় এবং এই পরিমাণ পৈতা এনে রোজ তাকে দেখাতে হবে। উত্তর ভারতের প্রতিটি পৈতার ওজন তিন আউন্স। সে হিসাবে প্রতিদিন ২৪ হাজার হিন্দুকে হত্যা করা হত।

সম্রাট আকবরের ঔরসে ও তার হিন্দু স্ত্রীর গর্ভের সন্তানের নাম সেলিম। তিনি সম্রাট আকবরের পর 'নুর উদ্দিন মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাদশাহ গাজী' উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে বসেন। তাঁর স্ত্রীও ছিলেন হিন্দু, অথচ তিনি গাজী (কাফের হত্যাকারী) উপাধি ধারণ করে তার রাজ্যে মন্দির নির্মাণ নিষিদ্ধ করেছিলেন। আমাদের কোন কোন লেখক আকবরের হিন্দু কন্যা বিবাহ ও তার পুত্র এবং উজির-নাজির সহ

কর্মচারীদের হিন্দু কন্যা বিবাহে পুলকিত হয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। কেউ কেউ আকবরকে ধর্মনিরপেক্ষতার অবতার বানিয়ে ছেড়েছেন। কিন্তু যে সব মেয়েকে মোঘল হারেমে যেতে হয়েছে, সেই হতভাগ্যদের জন্মদাতা পিতারাই জানেন আকবরের সঠিক অবস্থান কোথায় ছিল।

সম্রাট আকবর প্রতিটি অভিজাত হিন্দু পরিবার থেকে কন্যা সংগ্রহ করেছেন। তাঁর হারেমে ৫০০০ হিন্দু কন্যা ছিল। হিন্দু মেয়ে সংগ্রহ করে তিনি উদার হয়েছিলেন; কিন্তু কোন মুসলমান মেয়ে হিন্দু পরিবারে বিয়ে দিয়ে উদারতা দেখাননি। হিন্দু পরিবারের ভিত-নষ্ট করে তাদের আত্মগরিমা ধ্বংস করে তাদের ইসলামে টেনে আনাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। আর এ কারণেই সম্রাট আকবর তাঁর সারা জীবনে যতগুলি অভিযান পরিচালনা করেছিলেন তার সবগুলিই ছিল হিন্দু রাজাদের বিরুদ্ধে। নবীজীই এই বিধান দিয়ে গেছেন। আমাদের এক আহাম্মক লেখক দীনেশচন্দ্র সেন হিন্দু কন্যা মুসলমানদের ভোগে লাগায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেছেন, এতে মুসলমান ও হিন্দুর মধ্যে মেল বন্ধন দৃঢ় হয়েছে। কিন্তু মূর্খটা ইতিহাস পড়েনি; পড়লে জানতেন আকবরের ছেলে জাহাঙ্গীর হিন্দু মায়ের সন্তান হয়েও গুরু অর্জুনকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন। তার "মনের বাসনা হয় যত হিন্দু পাই, সুন্নত দেওয়াই আর কলেমা পড়াই।" (চৈতন্য ভাগবত, ২য় ভাগ, পৃ-১৮৮) তার ছেলে শাহজাহান এবং শাহজাহানের ছেলে আওরঙ্গজেবের কথা আপনারা জানেন। এনারা ধর্মনিরপেক্ষতার অবতারের বংশধর ছিলেন।

সম্রাট শাহ্‌জাহান প্রায়ই অন্যান্য ধর্মের সাধু-সন্তদের ধর্মকথা শোনার নাম করে আগ্রায় ডেকে আনতেন। কিন্তু শাহজাহানের ফাঁদে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাদের মুসলমান হবার হুকুম দিতেন। যারা ঐ হুকুম মেনে নিয়ে মুসলমান হতেন, তারা বেঁচে যেতেন। বাকীদের পরদিন সকালেই নানা রকম পৈশাচিক অত্যাচার করে হত্যা করা হত। সব থেকে বেশী অবাধ্যদের হাতির পায়ের তলায় পিষে ফেলে মারা হত। [Trans-Arch. Soc., Agra, 1978, Jan-June, VIII-IX]

Keene লিখেছেন, একবার শাহজাহান ফতেপুর সিক্রী অবরোধ করে নির্মম অত্যাচারের মধ্য দিয়ে হিন্দু প্রজাদের সর্বস্ব লুট করেন এবং অভিজাত রমণীদের বলাৎকার ও স্তন কেটে ফেলেন। হামিদ লাহোরী তাঁর বাদশাহ নামায় লিখেছেন, "একদা বাদশাহের গোচরে আনা হল যে, তাঁর পিতার (জাহাঙ্গীর) আমলে বিধর্মী কাফেরদের শক্ত ঘাঁটি বারাণসীতে অনেক পুতুল পূজার মন্দির তৈরী শুরু হয়েছিল, যা শেষ পর্যন্ত অসমাপ্তই থেকে যায়। কিন্তু বর্তমানে কাফেরের দল সেই সব মন্দির তৈরীর কাজ সম্পূর্ণ করার উদ্যোগ নিয়েছে। শুনে ধর্মের রক্ষক (ইসলামের) মহানুভব সম্রাট আদেশ জারি করলেন যে, বারাণসীসহ তার রাজ্যের যেখানে যেখানে আধা-আধি মন্দির খাড়া হয়েছে তা সব ভেঙে ফেলতে হবে। অধুনা খবর এসেছে যে, তার আদেশ বলে এলাহাবাদ প্রদেশের বারাণসী জেলার ৭৬-টি মন্দির ভেঙে ফেলা হয়েছে।

("It had been brought to the notice of His Majesty that during the

late reign (of his father) many idol temples had been begun, but remained unfinished, at Benares, the great stronghold of infidelity. The infidels were now desirous of completing them. His Majesty, the defender of the faith, (of Islam) gave orders that at Benares, and throught all his dominions in every place, all temples that had been begun should be cast down. It was now reported from the province of Allahabad that seventy-six temples had been destroyed in the distriet of Benares." [Elliot & Dowson, Vol. VII, p-36]

শ্রীকানোয়ার লাল-এর মতে শাহ্জাহান ছিলেন একজন গোঁড়া সুন্নী মুসলমান। তার পত্নী মমতাজের পরামর্শে তিনি নতুন করে হিন্দু মন্দির ভাঙার কাজ শুরু করেন। মুসলমান হিসাবে শাহজাহান কতখানি উগ্র ও গোঁড়া ছিলেন তা আর একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে ভালভাবে বোঝা যাবে। ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীর থেকে ফেরার পথে সম্রাটের নজরে আনা হল যে, রাজৌরী, ভিম্বর ও গুজরাটের কোন কোন স্থানে হিন্দুরা 'নও মুসলমান মহিলাদের' (বাধ্য হয়ে ধর্মান্তরিত হওয়া) পত্নীরূপে গ্রহণ করছে এবং বিবাহ করার পর সেই সব মুসলমান মহিলাদের আবার হিন্দু করছে। শুনে সম্রাটের ভীষণ ক্রোধ হল। সম্রাটের আদেশে সেই সকল হিন্দুদের ধরে আনা হল এবং বিরাট অঙ্কের টাকা জরিমানা ধার্য করা হল। প্রথমে এত বেশী জরিমানা করা হল যে, যাতে কেউ দিতে না পারে। তখন তাদের বলা হল যে, একমাত্র ইসলাম গ্রহণ করলেই তাদের মুক্তি দেওয়া হবে। অন্যথায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। প্রায় সকলেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে তাদের হত্যা করা হল এবং ৪৫০০ মহিলাকে পুনরায় মুসলমান করা হল। [R.C. Majumdar, BVB, Vol.VII, p-312]

ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথের মতে আকবরের হারেমে ৫০০০ রমণী ছিল। পিতার মৃত্যুর পর বাদশা হয়ে জাহাঙ্গীর ঐ হারেমের মালিক হন এবং রমণীর সংখ্যা ১০০০ বাড়িয়ে ৬০০০ করেন। সাধারণত হিন্দু পরিবারের মেয়েদের ধরে এনে এই অভিশপ্ত হারেমে রাখা হাত। কারণ, ইসলামের নিয়ম হল —

(১) হানা দিয়ে সকল পুরুষকে হত্যা করতে হবে।

(২) নারী ও শিশুদের ভাগ বাটোয়ারা করে নিতে হবে, পছন্দ মত ভোগ করতে হবে, বাকীদের বিক্রি করতে হবে।

(৩) অমুসলমানের সমস্ত সম্পত্তি (গণিমতের মাল) ভোগ দখল করতে হবে।

নূতন নূতন রমণীর দ্বারা হারেমের নবীকরণ করা হত এবং পুরনো ও বয়স্কদের তাড়িয়ে দেওয়া হত। নুরজাহানের পিতা ইদমৎ-উদ-দৌলার মতে এইসব হতভাগিনী হারেমবাসিনীদের কন্যা সন্তান জন্মালে তাদের হারেমেই রাখা হত এবং বড় হলে বাদশাহদের ভোগে লাগত। আর পুত্র সন্তান হলে সারা জীবনের জন্য কারাগারে নিক্ষেপ করা হত, খোজা করা হত বা হত্যা করা হত। [P.N. Oak, Tajmahal-The true story, p- 207]

ইউরোপীয় পর্যটক বার্ণিয়ের তাঁর ভ্রমণ কাহিনী 'Travels in the Moghal Empire' -এ লিখেছেন, ''প্রাসাদের মধ্যে ঘন ঘন 'মিনা বাজার' বসিয়ে সেখানে জোর করে ধরে আনা শত শত হিন্দু রমণীদের বেচা-কেনা, সম্রাটের জন্য ধরে আনা শতশত হিন্দু রমণীকে উপহার হিসেবে গ্রহণ করা, সরকারী খরচে বেশ কয়েক শ' নৃত্য পটিয়সী বেশ্যার ভরণপোষণ, হারেম সুরক্ষার জন্য কয়েক শ' খোজা প্রহরী নিয়োগ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে কামুক শাহজাহান তাঁর কামনা ও লালসা চরিতার্থ করতেন।

পর্যটক পিটার মুণ্ডি লিখেছেন, শাহ্জাহানের ছোট মেয়ে চিমনি বেগমের সাথে শাহজাহানের অবৈধ সম্পর্ক ছিল। বড় মেয়ে জাহানারার সঙ্গেও শাহজাহানের অবৈধ সম্পর্ক ছিল। এ ব্যাপারে অধিকাংশ ঐতিহাসিকই একমত। শাহজাহান তার সম্পর্কের কথা প্রকাশ্যেই বলতেন এবং যুক্তি দেখাতেন যে, গাছে ফল ধরলে বাগানের মালিরই অধিকার সবার আগে স্বাদ গ্রহণ করার।

১৫৭৬ সালে রাণা প্রতাপের সঙ্গে হলদীঘাটের যুদ্ধের সময় বদায়ুনী নামে এক সেনাপতি আসফ খাঁর কাছে অভিযোগ করল যে, শত্রু পক্ষ ও মিত্র পক্ষের রাজপুতদের ঠিকমত চেনা যাচ্ছে না। তাই তীর চালাতে অসুবিধা হচ্ছে। তখন আসফ খাঁ তাকে বললেন, অত বাছ বিচার দরকার নেই। তীর চালাতে থাক। কোন পক্ষের রাজপুত মারা গেল তা দেখার দরকার নেই। যে পক্ষের রাজপুত মরুক না কেন তাতেই ইসলামের লাভ। [R.C. Majumdar, B.V.B, Vol.VII, p-132]

মোগল আমলে প্রায়ই ভয়াবহ আকাল হতো। ১৫৭৩-১৫৯৫ সালের মধ্যে পাঁচবার আকাল হয়। ১৫৯৫ সালের আকাল পাঁচ বছর ধরে চলতে থাকে। ১৬১৪-১৬৬০ সালের মধ্যে মোট ১৩-বার আকাল হয়। শাহজাহানের আমলে ১৬৩০-৩১ সালে যে আকাল হয় তা ছিল সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ। সমস্ত দাক্ষিণাত্য ও গুজরাট অঞ্চলে আকাল ছড়িয়ে পড়ে। এই আকাল সম্বন্ধে হামিদ লাহোরী তাঁর বাদশাহ্নামায় লিখেছেন, ''দাক্ষিণাত্য ও গুজরাট এই দুই প্রদেশের মানুষের অবস্থা খুবই শোচনীয় অবস্থায় পৌঁছেছিল। লোকেরা এক খানা রুটির জন্য সারা জীবনের দাসত্ব করতে রাজী ছিল; কিন্তু ক্রেতা ছিল না। এক টুকরো রুটির বদলে একদল মানুষ কেনা যেত; কিন্তু সেই সুযোগ নেবার লোক ছিল না। অনেকদিন ধরে কুকুরের মাংস বিক্রি হল। হাড়ের গুড়া ময়দার সাথে মিশিয়ে বিক্রি করা হল। ক্রমে দুর্দশা এমন পর্যায়ে পৌঁছলো যে, মানুষ মানুষের মাংস খেতে শুরু করল। পিতা মাতার কাছে সন্তানের স্নেহ ভালবাসা থেকে তার শরীরের মাংসই বেশী প্রিয় হয়ে উঠল'।' এমন দুর্ভিক্ষ হওয়ার কারণ কি? কারণ, এর আগেই লক্ষ লক্ষ হিন্দু কৃষকদের মুসলমান না হওয়ার অপরাধে হত্যা করা হয়েছে, ফলে চাষ আবাদ করবে কে? মুসলমানদের এই দুর্ভিক্ষ স্পর্শ করে নাই। কারণ হিন্দু বাড়ী লুটপাট। এই আকালে অনাহারে এত লোক মারা যায় যে, মৃত দেহের স্তূপে রাস্তা ঘাটে চলাচল অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। এইভাবে এক অতি উর্বর শস্য-শ্যামল দেশ শ্মশানে পরিণত হয়েছিল।

(The inhabitants of these countries (the Deccan and Gujrat) were reduced the direst extremely, life was offered for a loaf but none would buy; rank was to be sold for a cake but none cared for it ...... Destitution at last reached such a pitch that men begun to davour each other, and flesh of a son was preferred to his love. The number of the dying caused obstruction on the roads." [Abdul Hamid Lohari, Vide, Smith's 'Oxford History of India', p-393. and 'An Advanced history of India', p-472]

ইংরেজ পর্যটক পিটার মান্ডি নিজের চোখে এই বীভৎস দৃশ্য দেখেছিলেন। তার রচনায়ও অনুরূপ বিবরণ পাওয়া যায়। হতভাগ্যেরা এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে পিটার মান্ডি একটি তাবু খাটাবার মত স্থানও পান নাই। একাধিক ইউরোপীয় পর্যটক ও ঐতিহাসিক শাহজাহানকে অত্যাচারী নিষ্ঠুর, বিলাসপ্রিয় ও ব্যভিচারী বলে চিহ্নিত করেছেন। টমাস রোঁ, চেরী বার্নিয়ে, ডিলিয়েৎ প্রভৃতি ইউরোপীয় পর্যটক ও যাজকদের বর্ণনার উপর ভিত্তি করে ড. স্মিথও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। শাহ্জাহান খৃষ্টান, হিন্দু ও পর্তুগিজদের উপর নির্যাতন করতেন এবং হিন্দু মন্দির ধ্বংস ও নতুন মন্দির নির্মাণে বাধা দিতেন। তিনি হিন্দুদের উপর তীর্থকর পুনরায় প্রবর্তন করেছিলেন।

শাহ্জাহানের পুত্র আওরঙ্গজেব ক্ষমতায় এসেই হিন্দু নির্যাতনের জন্য আরও কঠোর নীতি ঘোষণা করলেন। তিনি জিজিয়া কর পুনঃ প্রবর্তন করলেন। উদয়পুর ও চিতোর অধিকার করে দুই শতেরও অধিক দেব মন্দির ধ্বংস করলেন। শিখ গুরু তেগ বাহাদুর আওরঙ্গজেবের হিন্দু বিরোধী নীতি অমান্য করেন এবং কাশ্মীরের ব্রাহ্মণদের আওরঙ্গজেব প্রবর্তিত হিন্দু বিরোধী নীতি অমান্য করতে উপদেশ দেন। এ জন্য আওরঙ্গজেব তেগবাহাদুরকে বন্দী হিসাবে দিল্লী আনতে আদেশ দিলে তাঁকে আওরঙ্গজেবের সম্মুখে উপস্থিত করা হল এবং মৃত্যুভয় দেখিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বলা হলে তিনি ধর্ম ত্যাগ অপেক্ষা মৃত্যু বরণই শ্রেয় বিবেচনা করলেন। সম্রাটের আদেশে তৎক্ষণাৎ তাকে হত্যা করা হল। পাঞ্জাবের বর্তমান পাতিয়ালা ও মেওয়াট অঞ্চলে 'সৎনামী' হিন্দু সম্প্রদায়ের বাস ছিল। একজন মুসলমান সৈন্য একজন সৎনামী ভক্তকে হত্যা করলে সৎনামীরা বিদ্রোহী হয়, ফলে আওরঙ্গজেবের বাহিনী সৎনামী হিন্দুদের প্রায় সকলকে হত্যা করেন।

আওরঙ্গজেবের সমসাময়িক মুসলমান লিপিকার সাকি মুস্তাইদ খাঁ লিখেছেন, "১০৭৯ হিজরীর ১৭ই জিলকদ (১৮ই এপ্রিল, ১৬৬৯) সম্রাট আওরঙ্গজেবের কাছে খবর পৌঁছালো যে, থাট্টা মুলতান বিশেষ করে বারাণসীর মুর্খ ব্রাহ্মণরা তাদের মোটা মোটা ছেঁড়া গ্রন্থ থেকে কি সব জংলী তত্ত্ব ছাত্রদের শিক্ষা দিচ্ছে। কাফের হিন্দুদের সঙ্গে কিছু মুসলমান ছাত্রও সেখানে এসব ছাই ভস্ম শিখতে যাচ্ছে। এমনকি বহু দূর দেশ থেকেও বহু ছাত্র ওসব ডাকিনী বিদ্যা শিখতে বারাণসী উপস্থিত হচ্ছে। 'এ খবর শোনামাত্র 'ধর্মের দিক নির্দেশকারী" সম্রাট এক হুকুম জারি করে বললেন, সমস্ত প্রদেশের শাসনকর্তারা যেন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ভাবে কাফেরদের মন্দির ও বিদ্যালয়সমূহ

ধ্বংস করে দেন। এই মর্মে তাদের কঠোর নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে যে, তারা যেন মূর্তিপূজা এবং এই ধরনের শিক্ষা কেন্দ্রগুলোকে চিরকালের জন্য স্তব্ধ করে দেন। পরবর্তী রবিউল আউয়াল মাসের ১৫ তারিখে একেশ্বরবাদীদের নেতা ও ধর্মপ্রাণ সম্রাটের কাছে খবর পৌঁছাল যে, সম্রাটের আজ্ঞানুসারে সরকারী কর্তারা বেনারসের বিশ্বনাথ মন্দির ধ্বংস করেছে।" [Elliot & Dowson, VII-183-184]

সাকি মুস্তাইদ খাঁ আরও লিখেছেন, "১০৮০ হিজরীর রমজান মাসে (ডিসেম্বর, ১৬৬৯ খৃ.) সম্রাটের রাজত্বকালের ত্রয়োদশ বছরে অত্যাচারীদের (হিন্দুদের) অবিচল শত্রু ও ন্যায় বিচারের অনুরাগী সম্রাট (আওরঙ্গজেব) 'ডেরা বসুরায়' নামে পরিচিত মথুরার হিন্দু মন্দিরটি ধ্বংস করতে আদেশ দিলে অনতিবিলম্বে মেকী ধর্মের সুদৃঢ় ঘাঁটি মাটিতে মিশিয়ে দেয়া হল। ঠিক সেই জায়গাতেই বহু টাকা ব্যয় করে এক বিশাল মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করা হল।

"The director of the Faith" consequently issued orders to all the govenors of provinces to destroy with a willing hand the schools and temples of the infidels; and they were strictly enjoned to put an entire stop to the teaching and practising of idoletrous forms of worship. On the 15th Rabi-ul-Akhir it was reported to his religions Majesty, leaders of the unitarians, that, in obedience to order, the Government officers had destroyed the temple of Bishanath at Benares" (Elliot & Dowson, Vol. VII, p-184)

"In the month of Ramzan, 1018 A.H. (December, 1669) in the thirteenth year of the reign, this justic-loving monarch, the conastant enemy of tyrants, commanded the destruction of the Hindu temple of Mothura or Mattra, known by the name of Dehra Kesu Rai, and soon that stronghold of falsehood was levelled with the ground. On the same spot was laid, at great expense, the foundation of a vast mosque." [Elliot & Dowson, Vol. VII, p-184]

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল আজও মথুরায় গেলে দেখা যাবে যে, সাবেক মন্দিরকে ধ্বংস বা ধূলিসাৎ করা হয়নি; শুধু তাকে মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়েছে মাত্র। ঠিক তেমনি পূর্ববর্তী বিবরণে কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে; কিন্তু আজও কাশীতে গেলে দেখা যাবে যে, ধ্বংস করার নামে তাকে শুধু মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়েছে মাত্র। এসব ঘটনা ও তার বিবরণ থেকে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে, এই সব বিবরণে যেখানেই মন্দির ধ্বংস করার কথা আছে, সে সমস্ত ক্ষেত্রেই মন্দিরকে মসজিদে রূপান্তর বুঝতে হবে। এটিই নিয়ম, কেননা হযরত মোহাম্মদ মক্কার কেবলে ়র মন্দিরকে ধূলিসাৎ করেননি; শুধু মূর্তিগুলোকে ভেঙে দিয়ে এবং ছবিগুলোকে ফলে দিয়ে 'কাবা শরীফ' নামকরণ করেছেন। এটি একটি সুন্নত। এই সুন্নত অনুস ়ণ করা মুসলমান শাসকদের নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হিন্দু জনসাধারণকে বাধ্যতামূলকভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়ে তাদেরই মন্দিরকে ঘসে

মেজে হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি গুলোকে ধ্বংস করে মসজিদের রূপ দিয়ে নও-মুসলমানের সেখানে নামাজ শিক্ষা দেওয়া ও পড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়।

এক কালে আজকের করাচির নাম ছিল দেবল বা দেবালয়। কারণ, সেখানে সমুদ্রের পাড়ে ছিল বিশাল একটি মন্দির। সমুদ্রের অনেক দূর থেকে এই মন্দিরের চূড়া দেখা যেত। মহাম্মদ বিন কাশিম ৭১২ খৃষ্টাব্দে সেই মন্দিরকে মসজিদে রূপান্তরিত করে উপমহাদেশে এই বর্বর কাজের সূত্রপাত করেন। সেই সময়কার মুসলমান ঐতিহাসিকরা এই দানবীয় কাজকে মেকি দেব-দেবীর বিরুদ্ধে মহান আল্লাহ্‌র মহান বিজয় বলে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

ইসলামী চিন্তাবিদদের মতে মন্দিরকে মসজিদে রূপান্তর করা খুব সোজা এবং তিনটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব। প্রথমত, মন্দিরের বিগ্রহগুলোকে ভেঙে ফেলতে হবে। দ্বিতীয়ত, আজান দেবার জন্য একটি মিনার তৈরী করতে হবে এবং শেষ খুত্‌বা দেবার জন্য মিনার বানাতে হবে। কত কম সময়ের মধ্যে এই কর্ম সমাধান করা সম্ভব আজমীরের 'আড়াই দিন কা ঝোপড়া' তার স্বাক্ষী হয়ে রয়েছে। বিগত ১০০০ বছরে লক্ষ লক্ষ মন্দির মুসলমানরা ভেঙে ধূলিসাৎ করেছে; নয়তো মসজিদে রূপান্তরিত করেছে এমনি উপায়ে। সুলতান মাহ্‌মুদ সোমনাথের সুদৃশ্য মন্দির ধ্বংস করেছে। বাবরের দ্বারা অযোধ্যার রাম মন্দির, আওরঙ্গজেবের দ্বারা কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির ও মথুরার কেশব মন্দির ভাঙা ও মসজিদে রূপান্তর করা এর অন্যতম উদাহরণ। হযরত মোহাম্মদই প্রথম এই পথ দেখিয়েছেন। তাঁর আদর্শ অনুসরণে আজ পর্যন্ত এ কাজ চলছে তো চলছেই। ঢাকার ওয়ারী এলাকার শিব-মন্দির ভেঙে ইসলামী বিদ্যালয়, বানিয়া নগরের সীতানাথ মন্দির, ক্যাপিট্যাল ঈদগাঁ ময়দান, টিকাটুলীর শিব-মন্দির, রাজধানী মার্কেট ও মসজিদ, টিপু সুলতান রোডের রাধা-কৃষ্ণের মন্দির হয়েছে মানিকগঞ্জ হাউস।

সাকি মুস্তাইদ খাঁর বিবরণ অনুসারে বুন্দেলখণ্ডের রাজা নরসিংহ দেব যুবরাজ সেলিমকে নানাভাবে সাহায্য করার পুরস্কার হিসাবে মথুরায় মন্দির নির্মাণ করার অনুমতি লাভ করেন এবং ৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ঐ বিশাল মন্দির নির্মাণ করনেন। আওরঙ্গ জেবেরে আদেশে সেই মন্দিরকে ভেঙে মসজিদ তৈরী করা হয়। এই সংবাদে উল্লসিত মুস্তাইদ খাঁ লিখেছেন, ইনসাল্লা, ভাগ্যগুণে আমরা ইসলামকে দ্বীন হিসাবে পেয়েছি। যে কর্ম সমাধা করা নিতান্ত দুঃসাধ্য ছিল, মেকি দেব দেবীর উপাসনার ধ্বংসকারী এই সম্রাটের রাজত্বে তাও সম্ভব হল। সত্য ধর্মের প্রতি (সম্রাটের) এই বিপুল সমর্থন উদ্ধত হিন্দু রাজাদের চরম আঘাত হানলো পুতুল দেবতার মত তারাও তাদের ভয়ার্ত মুখ দেয়ালের দিকে ফিরিয়ে রাখলো।

"Glory be to God, who has given us the faith of Islam, that, in his reign of the destroyer of false gods, an undertaking so difficult of accomplishment has been brought to a successful termination! This

vigorous support given to the true faith was a severe blow to the arrogance of the Rajas, and, like idols, they turned their faces awe-struck to the wall." [Elliot & Dowson, Vol.VII, p-184]

মন্দির তো ভাঙা হল। কিন্তু মন্দিরের বিগ্রহের কি হবে? সে ব্যাপারে সাকি মুস্তাইদ খাঁ লিখেছেন, "জংলী সেই সব মন্দির থেকে মূল্যবান রত্নখচিত যে সব বিগ্রহ পাওয়া গেল সেগুলোকে আগ্রায় নিয়ে আসা হল এবং সেখানে নবাব বেগম সাহেবার মসজিদের সিঁড়ির নীচে ফেলে রাখা হল; যাতে সত্য ধর্মে বিশ্বাসীরা (মসজিদে যাওয়া আসার সময়) সেগুলোকে চিরকাল পায়ের তলায় মাড়িয়ে যেতে পারে।

(The richly jeweled idols taken from the pagan temples were transferred to Agra and there placed beneath the steps leading to the Nawab Begum Sahib's mosque, in order that they might ever be pressed under foot by the true believers." (Elliot & Dowson, Vol.VII, p-183-184)

সাকি মুস্তাইদ খাঁ আরও লিখেছেন, "রবিউল আখির মাসের ২৪ তারিখে খানজাহান বাহাদুর কয়েক গাড়ী হিন্দু বিগ্রহ নিয়ে যোধপুর ফিরলেন। সেখানকার অনেক মন্দির ভেঙে এ সব বিগ্রহ সংগ্রহ করা হয়েছিল। এই কাজের জন্য মহামান্য সম্রাট তাকে খুবই প্রশংসা করলেন। এই সব বিগ্রহের বেশীর ভাগই মূল্যবান সোনা, রূপা, পিতল, তামা বা পাথরের তৈরী ছিল। সম্রাটের হুকুম হল কিছু বিগ্রহ জঞ্জাল হিসেবে এখানে সেখানে ফেলে রাখতে, যাতে বিশ্বাসীরা মসজিদে যাতায়াতের সময় সেগুলোকে মাড়াতে পারে।

(On the 24th Rabi-ul Akhir, khan-jahan Bahadur arrived fron Jodhpur, bringing with him several cart-loads of idols, taken from the Hindu temples that had been razed. His Majesty gave him the great praise. Most of these idols were adorned with precious stones, or made of gold, silver, brass, copper or stone; it was orderd that some of them should be cast away in the out- offices, and the remainder placed beneath the steps of the grand mosque, there to be trampled under foot." (Elliot & Dowson, Vol.VII, p-187)

পরে পাথরের মূর্তি গুলোকে ভেঙে খোয়া করা হয় এবং সেই খোয়া দিয়ে জাম-ই-মসজিদের চাতাল মোজাইক করা হয়; যাতে নামাজীরা এসব বিগ্রহকে মাড়িয়ে নামাজ করে আল্লার নাম রোশন করতে পারে।

১০৯০ হিজরীর ১২-ই জিলহজ্ব (৬ই জানুয়ারী, ১৬৮০) যুবরাজ মোহাম্মদ আজম ও খানজাহান বাহাদুরকে উদয়পুরে যাবার অনুমতি দেয়া হল। রুহুল্লাহ্ খাঁ এবং ইক্কাতাজ খাঁকে সঙ্গে করে তারা হিন্দু মন্দির ভাঙবার জন্য সেখানে রওনা দিল। মহারাণার প্রাসাদের কাছেই অবস্থিত সেই সব মন্দিরগুলো ছিল সেই যুগের বিস্ময়। কাফেররা গায়ের রক্ত জল করে বহু অর্থ ব্যয় করে সেইসব মন্দির নির্মাণ করেছিল। বিশ জন রাজপুত যুবক মন্দির রক্ষার্থে প্রাণ বিসর্জন দিতে সংকল্প করে। মুসলমানদের সঙ্গে তারা পরম বিক্রমে যুদ্ধ করে বহু মুসলমান হতাহত করে অবশেষে প্রাণ দেয়।

ফলে মন্দির মুক্ত হল এবং অগ্রবর্তী লোকেরা (মুসলমানরা) মন্দিরের বিগ্রহ ধ্বংস করলো।

রাজপুতনায় আওরঙ্গজেবের মন্দির ভাঙার তাণ্ডব বর্ণনা করে সাকি মুস্তাইদ খাঁ আরও লিখেছেন, "১০৯১ হিজরীর ২রা মহরম (২৪শে জানুয়ারী, ১৬৮০ খৃষ্টাব্দ) সম্রাট মহারাণার তৈরী উদিসাগর জলাধারে ভ্রমণ করতে গেলেন। মহামান্য সম্রাট সরোবরের তীরে অবস্থিত তিনটি হিন্দু মন্দিরকেই ভেঙে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হুকুম দিলেন।

("On the 2nd of Muharram, 1091 A.H. (24th January, 1680) the king visited the tank of the Udisagar, constructed by the Rana. His Majesty ordered all three of the Hindu temples to be levelled with the ground." [Elliot & Dowson, Vol.VII, p-188]

৭ই মহরম হাসান আলী খান ফিরে এলেন। সঙ্গে আনলেন রাণার কাছ থেকে কেড়ে আনা বিশটি উট। তিনি খবর দিলেন যে, রাণার প্রাসাদের নিকটবর্তী মন্দিরগুলি সহ আশে পাশের অঞ্চলের আরও ১২২-টি মন্দির তারা ধ্বংস করেছেন।

"On the 7th Muharram Hasan Ali khan made his appearance with twenty camels taken from the Rana and stated that the temples situated near the place and one hundred and twenty-two more in the neighbouring districts had been destroyed." [Elliot & Dowson, Vol.VII, p-188]

সফর মাসের ১লা তারিখে মহামান্য সম্রাট (আওরঙ্গজেব) চিতোর যাত্রা করলেন এবং সেখানে ৬৩-টি মন্দির ভাঙা হল। আবু তুরাবের উপর অম্বরের মন্দির ভাঙার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। ২৪শে রজব সে নিজে এসে খবর দিল যে, ৬৬-টি মন্দির ভেঙে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে।

"His Majesty proceeded to chitor on 1st of safar. Temples to the number to sixty three were demolished.

Abu turab, who had been commissioned to effect the destruction of the idol temples of Amber, reported in person on the 24th Rajab, that three score and six of these edifices had been levelled with the ground." [Elliot & Dowson, Vol.VII, p-188]

আওরঙ্গজেবের মন্দির ভাঙার ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে ঐতিহাসিক জে. এন চৌধুরী লিখেছেন, "সমস্ত সাম্রাজ্যের অসংখ্য মন্দিরের সঙ্গে আওরঙ্গজেব বেনারসের বিখ্যাত বিশ্বনাথ মন্দির, মথুরার বিখ্যাত কেশবদেব মন্দির পাটনের বিখ্যাত সোমনাথ মন্দির ধ্বংস করেন। [R.C. Majumder, B.V.P., Vol. VII, p-235]

এ ব্যাপারে ঐতিহাসিক জি. এস. সরদেশাই লিখেছেন, "১৬৬৯ খৃষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল আওরঙ্গজেব দেশের হিন্দু শিক্ষায়তন ও হিন্দু মন্দির এবং হিন্দুদের সব রকম ধর্ম চর্চা ও শাস্ত্র চর্চাকে সমূলে বিনাশ করার জন্য এক ব্যাপক হুকুমনামা জারি করলেন। হিন্দুদের সমস্ত রকম মেলা এবং উৎসাবাদিও নিষিদ্ধ ঘোষিত হল। ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে

কাশীর বিখ্যাত বিশ্বনাথ মন্দির এবং ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে মথুরার বিখ্যাত কেশব রায় মন্দির ধ্বংস করা হল। এই সংবাদ বিদ্যুৎবেগে সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়ল। উল্লেখিত উভয় মন্দিরের জায়গাতেই বিশাল দুই মসজিদ খাড়া করা হল যা আজও সেখানে দাঁড়িয়ে আছে এবং যে কেউ কাশী বা মথুরা ভ্রমণে গেলে অনেক দূর থেকেই তা দেখতে পাবেন। [R.C. Majumder, BVB, Vol.VII, p- 265]

ঐতিহাসিক এ.কে. মজুমদার লিখেছেন, "মেঘ যেমন পৃথিবীর জল বর্ষণ করে ঔরঙ্গজেব সেই রকম সমস্ত দেশ জুড়ে বর্বরতা বর্ষণ করলেন ... যোধপুরের পতন হল এবং তাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হল। মৈর্ত, দিদোয়ানা ও রোহিত ভূখণ্ডে যত শহর ছিল সকলেরই ঐ একই হাল হল। হিন্দুর সমস্ত রকম পবিত্র প্রতীক পায়ে দলিত হল। হিন্দুর মন্দির ভেঙে ধূলিসাৎ করা হল এবং সে জায়গাতেই মসজিদ খাড়া করা হল।

মধ্য যুগে ভারতে হিন্দু প্রজা পীড়নকারী মুসলমান শাসন বর্ণনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক ইলিয়ট বলেছেন, "আমরা অবাক হব না, যদি দেখি যে, এই সব অত্যাচারী শাসকদের আমলে ন্যায় বিচার কলুষিত ও পক্ষপাত দুষ্ট। অথবা যদি দেখি যে, অকথ্য নির্যাতন ও অত্যাচারের মধ্য দিয়েই সর্বত্র রাজস্ব আদায় করা হচ্ছে। গ্রামবাসীদের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেয়া হচ্ছে বা তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশেষ ভাবে পুরুষের পুরুষাঙ্গ ও মহিলাদের স্তন কেটে ফেলা হচ্ছে অথবা যদি দেখি, যে সব রাজকর্মচারীকে রক্ষকের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তারাই দুবৃর্ত্ত, ডাকাতের সর্দার বা উচ্ছেদকারী হানাদার রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। আমরা অবাক হব না, যদি দেখি যে, এই সব অত্যাচার, অবিচার ও নিষ্পেশনের বিরুদ্ধে তথা উদ্ধত শাসকদের ঔদ্ধতের বিরুদ্ধে প্রতিবিধানের কোন জায়গা সাধারণ গ্রামবাসীদের কাছে অনুপস্থিত।"

" Under such rulers, we can not wonder that the fountains of justice are corrupted; that the state revenues are never collected without violence and outrage; that villages are burnt, and their inhabitants mutilated or sold in to slavery; that the officials, so far from affording protection, are themselves the chief robbers and usurpers; that parasite and eunuchs revel in the spoil of plundered provinces; and that the poor find no redress against the oppressor's wrong and proud man's contumely." [Elliot & Dowson, 1st Volume, Elliot's Original Preface, p-XX.]

"জালালউদ্দিন সিংহাসন আরোহণ করে সুবর্ণ গ্রাম থেকে শেখ জহিরকে নিয়ে এসে তার উপদেশ অনুসারে রাজকার্য পরিচালনা শুরু করেন। তিনি পূর্ববঙ্গে ইসলাম ধর্ম বিস্তারের জন্য ঘোষণা করলেন যে, সকলকে মুসলমান হতে হবে নয়তো প্রাণ দিতে হবে। এই ঘোষণার পরে পূর্ববঙ্গের অনেকে কামরূপ আসাম ও কাছারের জঙ্গলে পালিয়ে যান। কিন্তু তথাকথিত নিম্নবর্ণের অনেক হিন্দুই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। ঐতিহাসিক রজনীকান্ত চক্রবর্তীর মতে জালালউদ্দিনের ইসলাম ধর্ম প্রচারের ফলেই

পূর্ব বাংলায় মুসলমানের সংখ্যা এত বেশী" (গৌড়ের ইতিহাস, রজনীকান্ত চক্রবর্তী, পৃ- ৪৫-৪৬)

কিন্তু আমাদের ঐতিহাসিকরা এইসব বিষয়গুলি সযত্নে এড়িয়ে চলেন। তাঁদের মূল দিক নির্দেশই হল বিদেশী মুসলমান শাসকদের মহান করে দেখাও, মুসলমান শাসনের যুগকে পরাধীনতার যুগ বলে কখনো দেখিও না বরং ভারতের ইতিহাসের স্বর্ণ যুগ হিসেবে দেখাও। ঐসব মুসলমান শাসকরা হিন্দুদের উপর যে নারকীয় অত্যাচার করেছে কোটি কোটি হিন্দুর রক্তে ভারতবর্ষের মাটি কর্দমাক্ত করেছে। হিন্দুর ছিন্ন মুণ্ড দিয়ে যে পাহাড় তৈরী করেছে। তা ইতিহাসের বই থেকে লোপাট করে দাও। তারা লক্ষ লক্ষ হিন্দু মন্দিরকে ধ্বংস করেছে বা মসজিদে রূপান্তরিত করেছে তা ইতিহাসের বই থেকে সম্পূর্ণ মুছে দাও। এই নীতি অনুসরণের কারণ সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ বলেন এর ফলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা হবে। বলা বাহুল্য এই নীতি অনুসরণ করে আমাদের প্রকৃত ইতিহাস জানতে না দিয়ে ঐতিহাসিকগণ জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও যে জঘন্য অপরাধ করে চলেছেন তা ক্ষমার অযোগ্য। এইসব বিশ্বাসঘাতক ঐতিহাসিকদের কল্যাণেই পৃথিবীর মানুষ আজ তেজোমহালয় শিব মন্দিরকে একটি কবর বলে জানে। অথচ সম্রাট শাহজাহানের সভাসদ আবদুর হামিদ লাহোরী তার বাদশাহ নামার ৪০৩ ও ৪০৪ পৃষ্ঠায় তাজমহলের প্রকৃত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। তাজমহল সম্পর্কে সমগ্র মধ্যযুগের এই একমাত্র প্রমাণ্য গ্রন্থ খানাকে উপেক্ষা করে আধুনিক লেখকগণ এক দৈবী বাণী পেয়ে রাজা পরমার্দিদেবের তৈরী শিব মন্দিরটিকে শাহজাহানের স্ত্রীর কবর বলে চালিয়েছেন। শুধু তাই নয়, সভাসদ যেখানে বলেছেন বিশাল ইমারতটি রাজা জয় সিংহের ছিল সম্রাট, শাহজাহান সেটি তার কাছ থেকে নেন। সেখানে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ দৈবী ক্ষমতা বলে সেটি নির্মাণের শ্রমিক থেকে টাকার অংক পর্যন্ত কষে বের করেছেন। অথচ চান্দেলরাজ পরমার্দিদের (পরমল) কর্তৃক ১১৫৬ খৃষ্টাব্দে নির্মিত তেজোমহালয় শিব মন্দিরকে শাহ্জাহান মূর্তি শূন্য করে ইসলামী রূপ দিয়েছিলেন সেকথা তার সভাসদই বর্ণনা করে গিয়েছেন। এমনকি শাহজাহানের স্ত্রীর নাম আরজুমান্দ বানু পরিবর্তন করা হয় মন্দিরের নামের সঙ্গে সংগতি রেখে। মূলতঃ সম্রাট শাহজাহান মন্দিরটিকে অপবিত্র করার জন্যই এমন ব্যবস্থা করেছিলেন। অথচ আজ মিথ্যা প্রেমের কত কাহিনী প্রচার হয়েছে আমাদের জ্ঞানপাপী ঐতিহাসিকদের কল্যাণে।

সুলতান নাসিরুউদ্দিনের সেনাপতি উলুঘ খাঁ হিমালয়ের পাদদেশে গাড়োয়াল অঞ্চলে গিয়ে সৈন্যদের হুকুম দিয়েছিল যে একটা জ্যান্ত কাফের ধরে আনতে পারবে সে দু' টাকা আর যে কাফেরের একটা কাটা মুণ্ডু আনতে পারবে সে এক টাকা পাবে। ক্ষুধার্ত কুকুরের মত মুসলমান কাফেরের খোঁজে চতুর্দিকে বের হয়ে পড়ে। দীর্ঘ ২০ দিন ধরে সেই হত্যা কান্ড চলতে থাকে। কাটা মানুষের মুণ্ডু ও কবন্ধেরর স্তুপ পাহাড়েরর সমান উঁচু হয়ে যায়-এই ইতিহাস আমাদের ঐতিহাসিকরা কেমন করে ভুলে যেতে বলেন?

এদেশ হতে লক্ষ লক্ষ হিন্দু নারী ও শিশুকে ক্রীতদাস-দাসী হিসাবে কাবুল, কান্দাহার, গজনী, বাগদাদ এমনকি সুদূর দামাস্কাসে নিয়ে গিয়ে সেখানকার ক্রীতদাসের হাটে বিক্রয় হতে থাকলো। সুন্দরী হিন্দু নারীরা মুসলমানদের লালসার শিকারে পরিণত হতে থাকলো। উজির নাজিররা নিজেরা হিন্দু কন্যা জোড় করে ধরে আনতে লাগলো, কিছু নিজেরা রেখে কিছু সম্রাটের জন্য উপহার পাঠিয়ে কিছু মিনা বাজারে বিক্রী করে ভারতবর্ষে যে হাহাকার সৃষ্টি করেছিল তা ঐতিহাসিকরা কি করে ভুলতে বলেন?

আগে হিন্দু সমাজের মেয়েরা ঘোমটা কাকে বলে জানত না। মুসলমানদের লালসার হাত হতে রক্ষা পাবার জন্যই হিন্দু নারীদের ঘোমটার প্রচলন শুরু হয়। অনেকেরই জানা নেই যে, বাংলা তথা উত্তর ভারতে হিন্দু মেয়েদের কেন রাতের অন্ধকারে বিয়ে দেয়া হয়। কোন বৈদিক যজ্ঞই রাত্রে করার নিয়ম নেই। দিনের আলো থাকতে থাকতেই যজ্ঞ শেষ করার বিধি, তা সত্ত্বেও উত্তর ভারতে ও বাংলায় কেন রাতে যজ্ঞ করা হয় এবং কেন বর রাতে কনের বাড়ীতে যাওয়ার নিয়ম হল। কারণ রাতের অন্ধকারে কুমারী কন্যাকে পাত্রস্থ করে মুসলমানদের অগোচরে শ্বশুর বাড়ী পাঠিয়ে দেবার জন্যই এই বিধি প্রচলিত হয়। পক্ষান্তরে দাক্ষিণাত্যে মুসলমানদের অনুপ্রবেশ কম হওয়ায় আজও দিনের আলোতেই সেখানে বিবাহ অনুষ্ঠান ও যজ্ঞ সম্পন্ন করা হয়।

মুসলমান শাসকরা তো বটেই, তাদের অনুচররা এবং স্থানীয় প্রভাবশালী মুসলমানরা 'সিন্ধুকী' (গুপ্তচর) লাগিয়ে হিন্দুর ঘরের সুন্দরী মেয়েদের খোঁজখবর নিত এবং গায়ের জোড়ে তাদের ধরে নিয়ে গিয়ে লুটের মালে পরিণত করত। এ ব্যাপারে ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার মহাশয় লিখেছেন, "দীনেশ চন্দ্র সেন হিন্দু মুসলমানের প্রীতির সম্বন্ধে উচ্ছসিত ভাষায় প্রশংসা করেছেন। কিন্তু তিনিও লিখেছেন যে, মুসলমান রাজা ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ 'সিন্ধুকী' (গুপ্তচর) লাগিয়ে ক্রমাগত সুন্দরী হিন্দু ললনাদের অপহরণ করেছেন। ষোড়শ শতাব্দীতে ময়মনসিংহের জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানগণ এবং শ্রীহট্টের বানিয়াচঙ্গের দেওয়ানগণ এই রূপ শত শত হিন্দু কন্যাকে যে বল পূর্বক বিয়ে করেছিলেন তার অবধি নাই। ঢাকার শাঁখারী বাজারের গোপন কুঠুরী ঘর তৈরীর পিছনেও যে ট্রাজেডি বিদ্যমান তা আপনারা সবাই জানেন।

মুসলমান পরাধীনতার যুগের ভারতবর্ষের ইতিহাস একটু মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে যে, যখনই কোন নতুন ব্যক্তি দিল্লীর সিংহাসনে বসেছেন তখনই তাকে রাজ্য বিস্তারের জন্য দৌঁড়াতে হচ্ছে। তাকে গুজরাট, রাজস্থান, মধ্যভারত ও দক্ষিণ ভারতে অভিযান করতে হচ্ছে। গোয়ালিয়র, রাজস্থান, রনথম্ভোর, চিতোর ইত্যাদি দূর্গ দখল করতে হচ্ছে এবং সেজন্য অনেক যুদ্ধ বিগ্রহে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। কাজেই প্রশ্ন হল, কেন একই দূর্গ বা একই অঞ্চল বিভিন্ন বাদশাহ্‌কে বারবার জয় করবার প্রয়োজন হচ্ছে? উত্তর একটাই — মুসলমানরা কোন দূর্গ বা অঞ্চলে বেশীদিন তাদের আধিপত্য অক্ষুন্ন রাখতে সক্ষম হন নাই। স্থানীয় এসব রাজারা ক্রমাগত বিদ্রোহ

করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে; মুসলমান শাসনকে অস্বীকার করেছে। তাই একই অঞ্চল বারবার বাদশাহ্দের জয় করার প্রয়োজন হয়েছে। এই তথ্য থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, ভারতের হিন্দু শক্তি আক্রমণকারী মুসলমান শক্তির সঙ্গে নিরন্তর সংঘর্ষ করেছে এবং অসংখ্য হিন্দু বীর এই সংঘর্ষে রক্ত দিয়েছে; প্রাণ দিয়েছে। বিদেশী মুসলমান শক্তিকে এক মুহূর্তও নিশ্চিন্তে থাকতে দেননি। তাই ড. কে. এম. মুন্সী লিখেছেন, "এ হল স্বাধীনতা রক্ষার খাতিরে নিতান্ত বালক থেকে শুরু করে মৃত্যু-পথ-যাত্রী বৃদ্ধ পর্যন্ত অগণিত মানুষের বিরামহীন সংঘর্ষ, নিরন্তর বীরত্ব প্রদর্শন ও প্রাণ বিসর্জনের এক সুদীর্ঘ ইতিহাস। এ হল মাসের পর মাস, কখনো বছরের পর বছর ধরে দুর্গের অভ্যন্তরে থাকা বীর যোদ্ধাদের যুদ্ধের ইতিহাস। দুর্গ আক্রমণকারী মুসলমানদের বিরুদ্ধে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলতে থাকা এক বিরামহীন সংগ্রামের ইতিহাস। এ হল সম্মান রক্ষার্থে হাজার হাজার হিন্দু নারীর জ্বলন্ত অগ্নিতে আত্মাহুতি দেবার এক দীর্ঘ ইতিহাস। এ হল দাসত্বের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য পিতামাতার দ্বারা অবোধ শিশুকে কূপের জলে নিক্ষেপ করার এক করুণ ইতিহাস। এ হল অন্তহীন হামলাকারীদের নিরন্তর আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য দেশ ও জাতিকে রক্ষা করার জন্য তরুণ যোদ্ধাদের দ্বারা মৃত সৈনিকের স্থান পূরণ করার এক বিভীষিকাময় ইতিহাস।" আমরা সেই মাটিতে বাস করছি, যে মাটি হাজার বছর ধরে কোটি কোটি পিতার, মাতার, ভাইয়ের, বোনের অশ্রুজলে সিক্ত। পিতা মাতা ভাইয়ের সামনে বোনকে টেনে নিয়ে গিয়ে হারেমে নির্লজ্জ কুকুরের মত ব্যবহার করেছে, ভাই খোজা হয়ে তাকে পাহারা দিয়েছে। এ সেই করুণ ইতিহাস যেখানে কন্যা সন্তানের জন্মকে অভিশাপ মনে করে পিতা মাতা গঙ্গাসাগরে ভগবানের নামে উৎসর্গ করে দিয়েছে। নিজ হাতে সন্তান হত্যার বুকফাটা আর্তনাদ পিতা মাতা হাজার বছর চেপে রেখেছে। কারণ সন্তান জন্মের পর বিসর্জনের যে কষ্ট তার চেয়ে বেশী কষ্ট হবে যখন চোখের সামনে মুসলমানরা ধরে নিয়ে কুকুরের মত ব্যবহার করবে। যেখানে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী চলেছে। হিন্দুর রক্তে হোলি খেলা, জিজিয়া, খেরাজ আদায়ের ফলে বুভুক্ষ মানুষের হাহাকার। এ সেই মাটিতে আমরা বাস করছি, যে মাটিতে হাজার বছর ধরে মিশেছে কোটি কোটি হিন্দুর রক্ত ও অশ্রুর বন্যা, পিতার হাহাকার, বোনের আর্ত চিৎকার, ভাইয়ের রক্ত, মাতার অসহায় দৃষ্টি। সে মাটি আজও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

অনেকের মনে এই ধারণা থাকতে পারে যে, মুসলমানদের দ্বারা ব্যাপক হারে হিন্দু হত্যা হিন্দুর সম্পত্তি লুটপাট করে আত্মসাৎ করা, হিন্দু নারীদের জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে লুটের মালে পরিণত করা ইত্যাদি ঘটনা এক কালে মধ্যযুগে ঘটেছে বটে, তবে আজ আর তার পুনরাবৃত্তি হবে না। আজ দেশ ও সমাজ সভ্যতার পথে অনেকটা অগ্রসর হয়েছে; তাই মুসলমানদের কাছ থেকে এই সব বর্বরতার আশঙ্কা নেই। মধ্য যুগ নেই ; তাই মধ্যযুগীয় বর্বরতাও হবে না। এই সব ব্যক্তিদের জানা নেই যে, সমস্ত পৃথিবী সভ্যতার পথে অগ্রসর হলেও ইসলাম ও কোরান এবং সেই সঙ্গে মুসলমান

সমাজ আজও সেই মধ্য যুগেই দাঁড়িয়ে আছে। তারা সভ্যতার পথে এক পাও অগ্রসর হয়নি। যে কোরান ও হাদিস মধ্য যুগের মুসলমানদের সমস্ত রকম বর্বর কাজে অনুপ্রাণিত করত, সেই একই কোরান ও হাদিস আজকের মুসলমান সমাজকেও পূর্বোক্ত সকল রকম কাজে একই ভাবে প্রেরণা যুগিয়ে চলেছে। কোরানের ও হাদিসের কোন পরিবর্তন সম্ভব নয়। তাই কাফেরের প্রতি মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গির কোন পরিবর্তন হয়নি। শুধু সুযোগের অপেক্ষা মাত্র। অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে আজও মুসলমানরা কাফের কেটে রক্ত গঙ্গা বইয়ে দেবে। কাফেরের মৃতদেহ দিয়ে পাহাড় তৈরী করবে, কাফের নারীদের লুটের মালে পরিণত করবে এবং কাফেরদের মন্দির ভেঙে ধূলায় মিশিয়ে দেবে। তফাৎ শুধু এই, এক কালের তলোয়ার, শূল, বর্শা, তীর-ধনুক ইত্যাদির বদলে আজ একে-৪৭ রাইফেল, গ্রেনেড, মর্টার, রকেট, বোমা, বিমান ইত্যাদি উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহার হবে। উদ্দেশ্য একটাই, কাফের নির্মূল করে সারা বিশ্বে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করা। মুসলমানদের মন মানসিকতার যে কোন পরিবর্তন নেই তার উদাহরণ হল ২০০২ সালেও আফগানিস্থানে বামিয়ানের বৌদ্ধ মূর্তি যা সারা বিশ্বের বাধা নিষেধকে অমান্য করে মুসলমানরা ধ্বংস করে ফেলে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে যা ঘটেছিল তা অনেকেরেই হয়ত মনে আছে। আনোয়ার শেখের ভাষায়, "বিগত ১৯৭১ সালে পূর্ব বাংলায় হিন্দুদের উপর যে নারকীয় বর্বরতার অনুষ্ঠান করা হয়েছে, তার তুলনা মানব ইতিহাসে অনুপস্থিত। বহু ক্ষেত্রে সমগ্র অধিবাসীকেই ঘিরে ফেলে অত্যাচার চালানো হয়েছে। মা এবং মেয়েকে এক সঙ্গে তাদের বাবা ভাইয়ের সামনে বলাৎকার করা হয়েছে। মহিলাদের স্তন কেটে ফেলা হয়েছে। গর্ভবতী মহিলাদের গর্ভস্থ সন্তানকে হত্যা করা হয়েছে এবং মেঝেতে আছাড় মেরে শিশুদের মাথা থেৎলে দেওয়া হয়েছে। তারপর বয়স্ক পুরুষদের পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলা হয়েছে। চোখ উপড়ে নেওয়া হয়েছে এবং সব শেষে ধড় থেকে মাথা আলাদা করা হয়েছে। চরম উল্লাসের আনন্দ পাবার জন্য পরিবারের সবাইকে একটা ঘরে ঢুকিয়ে সেই ঘরে আগুন দেওয়া হয়েছে। [Anwar Sheikh, 'This is Jehad']

সবশেষে কয়েকজন মনীষীর বাণী স্মরণ করে এই পর্বের আলোচনা শেষ করব।

'ইসলাম হচ্ছে এক রাজনৈতিক আক্রমণকারী পরধর্ম অসহিষ্ণু বিস্তারবাদী আন্দোলন। যারা আল্লাহ্ মানে না, যাদের কোরানে বিশ্বাস নেই কিংবা মূর্তি পূজার মাধ্যমে উপাসনা করে, এমন নাগরিকদের দেশের উপর আক্রমণ করে তাদের পরাভূত করা, তাদের সম্পত্তি লুটপাট করা, তাদের মহিলাদের "লুটের মাল" হিসাবে সৈনিকদের দ্বারা বলৎকার করানো, তাদের ধর্মান্তিরণ করে মুসলমান করা, আর যারা ধর্মান্তরিত হলো না, তাদের উপর অত্যাচারের পুনরাবৃত্তি অবিরত চালু রাখা — এই হচ্ছে কোরানের শিক্ষা।" — গোপাল গডসে।

"পৃথিবীর দুইটি ধর্ম সম্প্রদায় আছে অন্য সমস্ত ধর্মমতের সঙ্গে যাদের বিরুদ্ধতা অত্যুগ্র— সে হচ্ছে খৃষ্টান আর মুসলমান ধর্ম। তারা নিজেদের ধর্মকে পালন করেই

সন্তুষ্ট নয়, অন্য ধর্মকে সংহার করতে উদ্যত। এই জন্যে তাদের ধর্ম গ্রহণ করা ছাড়া তাদের সঙ্গে মেলবার অন্য কোন উপায় নেই।" — রবীন্দ্রনাথ। (রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃ- ৩৫৬)

"বস্তুত মুসলমান যদি কখনও বলে হিন্দুর সহিত মিলন করিতে চাই, সে যে ছলনা ছাড়া আর কিছু হইতে পারে, ভাবিয়া পাওয়া কঠিন।" ..... "হিন্দু-মুসলমান মিলন একটি গালভরা শব্দ, যুগে যুগে এমন অনেক গালভরা বাক্যই উদ্ভাবিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ গাল ভরানোর অতিরিক্ত সে আর কোন কাজেই আসে নাই।" — শরৎ চন্দ্র। (শরৎ রচনাবলী জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, তৃতীয় খণ্ড, পৃ-৪৭৩)

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "মুসলমানরা এই বিষয়ে সর্বাপেক্ষা অপরিণত ও সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন। তাদের মূল মন্ত্র আল্লাহ্ এক এবং হযরত মুহাম্মদই একমাত্র রসুল। যা কিছু এর বর্হিভূত সে সমস্ত কেবল খারাপ তাই নয়; উপরন্তু সে সমস্তই তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করতে হবে; যে কোন পুরুষ বা নারী এই মতে সামান্য অবিশ্বাসী তাকে নিমিষে হত্যা করতে হবে; যা কিছু এই উপাসনা পদ্ধতির বর্হিভূত তাকেই অবিলম্বে ভেঙে ফেলতে হবে; যে কোন গ্রন্থে অন্যরূপ মত প্রচারিত হয়েছে সেগুলি দগ্ধ করতে হবে। প্রশান্ত মহাসাগর হতে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত ব্যাপক এলাকায় দীর্ঘ পাঁচ শত বছর ধরে পৃথিবীতে রক্তের বন্যা বয়ে গেছে, ইহাই মুসলমান ধর্ম।"

"আরবের পয়গম্বর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ধর্ম দ্বৈতবাদকে যেভাবে আশ্রয় করে আছে, অন্য কোন ধর্মে তেমনটি আর দেখা যায়নি। এমন অন্য কোন ধর্ম পাওয়া যায়নি, যেখানে এই পরিমাণ রক্তপাত হয়েছে এবং অপরের প্রতি এত নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করেছে। কোরানের বিচারে যে ব্যক্তি এর শিক্ষায় অবিশ্বাসী সে নিধনযোগ্য। তাকে হত্যা করার অর্থ তার প্রতি দয়া প্রদর্শন। এই কাফের নিধন হচ্ছে স্বর্গে পৌঁছাবার সুনিশ্চিত পথ। এই স্বর্গ অসামান্য রূপসী হুরিতে পরিপূর্ণ এবং সেখানে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সর্ববিধ ব্যবস্থা রয়েছে"। (স্বামী বিবেকানন্দ রচনাবলী (প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত), ৪র্থ খণ্ড, পৃ- ১২৫ ও ২য় খণ্ড, পৃ- ৩৫২)

"ইসলাম ধর্মীরা কোরানের দুইটি আয়াত, 'পৌত্তলিকদের যেখানে পাও হত্যা কর।" এবং 'অতএব ধর্মযুদ্ধে তাদের বন্দী করে হয় বশ্যতার অঙ্গীকার নতুবা মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দাও' অনুযায়ী ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে বলে যে, বহু দেবদেবীতে বিশ্বাসী পৌত্তলিকদের হত্যা বা নির্যাতন করা ঈশ্বরের নির্দেশ এবং আবশ্যিক। সুতরাং ইসলাম ধর্মীদের ধর্মীয় উন্মাদনা এবং ঈশ্বরের নির্দেশ পালনে অত্যুৎসাহিতা সেই পৌত্তলিকগণকে হত্যা ও নির্যাতন করতে একালে বা সেকালে কখনই বিরত হয় নাই।"

— রাজা রামমোহন রায়।

(তুহফাৎ-উল-মুওয়াহিদ্দীন, রামমোহন স্মরণ, মার্চ ১৯৮৯, পরিশিষ্ট, পৃ-৩১)

আল্লার আইন ও ইসলামী শাসন

"পৃথিবীতে দুইটি ধর্ম সম্প্রদায় আছে অন্য সমস্ত ধর্ম মতের সঙ্গে যাদের বিরুদ্ধতা অত্যুগ্র, সে হচ্ছে খৃষ্টান আর মুসলমান ধর্ম। তারা নিজেদের ধর্ম পালন করেই সন্তুষ্ট নয়, অন্য ধর্মকে সংহার করতে উদ্যত। এই জন্যে তাদের ধর্ম গ্রহণ ছাড়া তাদের সঙ্গে মেলবার অন্য কোন উপায় নেই।" — রবীন্দ্রনাথ (রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ১৩/৩৫৬)

• • •

"আপনার মত *(প্রধানমন্ত্রি লিয়াকত আলী খান)* শিক্ষিত সংস্কৃতিবান এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি আজ এমন দর্শনের প্রচারক হয়ে গেলেন, যে দর্শন মানবতার পক্ষে ভয়াবহ বিপজ্জনক এবং যে দর্শন ন্যায় ও শুভ চিন্তাধারা থেকে উদ্ভুত যাবতীয় নীতিমালার পক্ষে ক্ষতিকারক।"

— মুসলিম লীগের প্রাক্তন সহযোগী সদস্য মি. যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল।

এক

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ বাংলাদেশ; হাজার বছরের বাঙ্গালী সাংস্কৃতির লীলাভূমি বাংলাদেশ। এ দেশ হিন্দু মুসলমানের নয়; এ দেশ বাঙ্গালীদের দেশ।

মুসলিম পণ্ডিতদের ভাষ্য, ইসলাম শ্রেষ্ঠ ধর্ম, শান্তির ধর্ম এবং তারাই একমাত্র বেহেস্ত লাভের অধিকারী।

ভারতবর্ষের সাধারণ হিন্দুরা উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের অত্যাচারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে। এই হল বেশ কিছু সংখ্যক আধুনিক পণ্ডিত ও রাজনীতিকদের গবেষণা।

ঐতিহাসিক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার অবশ্য ভিন্ন মত পোষণ করে বলেছেন, বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোনদিন সম্প্রীতি ছিল না। ইতিহাস ঘেঁটে অবশ্য দেখা যাচ্ছে, শুধু বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমানই নয়; পৃথিবীর কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গেই মুসলমানদের সম্প্রীতি ছিল না এবং এখনো নেই। সারা পৃথিবীতে জাতিগত সন্ত্রাসের প্রায় সবগুলিই মুসলমান সম্প্রদায় কর্তৃক পরিচালিত। এর কারণ অবশ্য ইসলাম ধর্ম। ইসলাম কাউকে সহ্য করে না। পরমত সহিষ্ণুতা ইসলামের অভিধানে নেই। এটা ইসলামের জন্মগত চরিত্র। একজন হিন্দু যখন প্রার্থনা করছেন, সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ হোক, মঙ্গল হোক। পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী ভয়শূন্য হোক, নিরোগ ও শান্তি লাভ করুক; তখন একজন মুসলমান প্রার্থনা করছে, শুধু মুসলিম উম্মাহর (জাতির) উপর শান্তি বর্ষিত হোক। অন্যান্য জাতি ধ্বংস হোক। যেখানে একজন মুক্তবুদ্ধি সম্পন্ন লোক মনে করছেন হত্যা, লুণ্ঠন, বিধর্মী অত্যাচার অন্যায়; সেখানে একজন মুসলমানের কাছে ঐ সব অপকর্মগুলি পরম ধর্ম ও অবশ্য পালনীয় কর্ম। কাফের হত্যা, তাদের সম্পত্তি লুট করা ধর্ম; তাদের বউ, মেয়ে দখল করে ভোগ করা ধর্ম। অমুসলিমের

উপর হানা দেওয়া মুসলমানের কাছে পবিত্র ধর্মযুদ্ধ। আক্রমণ, আগ্রাসন, অমুসলিম হত্যা করে তাদের সম্পত্তি লুট করা এবং নারী ও শিশু অপহরণ আজকের সভ্যতায় বর্বরতা বলে বিবেচিত হলেও মুসলমানের কাছে এই অপকর্মগুলি পরম ধর্ম। বলা বাহুল্য, এ সমস্ত উপায়েই পৃথিবীতে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ইতিহাস না পড়া কিছু স্বঘোষিত পণ্ডিত প্রচার করেছেন, ভারত উপ-মহাদেশে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথা এবং উচ্চবর্ণ নিম্ন বর্ণ বিরোধ। এর ফলে নিম্নবর্ণের লোকেরা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। কথাটি যে সর্বাংশে মিথ্যা তা ইতিহাস পাঠক মাত্রই জানেন। প্রকৃত তথ্য হল— আক্রমণ, আগ্রাসন, লুণ্ঠন, বন্দী, জিম্মি, জিজিয়া এবং অন্যান্য কৌশলে এদেরকে ইসলামে দীক্ষিত হতে বাধ্য করা হয়েছিল। কিন্তু তারা আবার স্বধর্মে ফিরে না আসার কারণ দীর্ঘ দিনের ধারাবাহিক মুসলিম শাসন। ৬৩২ খৃষ্টাব্দে হযরত মুহম্মদের মৃত্যুর পর মদিনার লোকেরা স্বধর্মে ফেরত যাচ্ছিলেন; কিন্তু হজরত আবু বকর কঠোর নীতি অবলম্বন করে তাদেরকে ইসলামে থাকতে বাধ্য করে। ঐতিহাসিক ম্যুর বলেন, "সমগ্র উপদ্বীপের লোক স্বধর্মে ফেরৎ যাচ্ছিলেন।" (এম. এ. ছালাম; ইসলামের ইতিহাস, পৃষ্ঠা- ১৯)

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় অনেক হিন্দু মুসলমান হতে বাধ্য হয়েছিলেন; কিন্তু স্বল্পকালীন যুদ্ধ শেষে তারা আবার স্বধর্মে ফিরে এসেছিলেন। ১৯৬৪ সালে নোয়াখালিতে অনেক হিন্দু মুসলমান হতে বাধ্য হয়েছিলেন; কিন্তু রায়ট শেষ হলে তারা আবার স্বধর্মে ফিরে আসেন। কিন্তু ৬০০ থেকে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যারা মুসলমান হতে বাধ্য হয়েছিলেন তারা আর স্বধর্মে ফিরে আসার সুযোগ পাননি। কারণ, সহস্র বছর তাদের ঘাড়ের উপর ঝুলছিল রেশমী সুতায় বাঁধা তলোয়ার। আজ তাদের সন্তানগণ ভুলেই গেছেন তাদের পূর্ব পুরুষগণ বাধ্য হয়ে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন; মনের তাগিদে হননি।

ইতিহাস পাঠে আমরা জানতে পেরেছি, মধ্যযুগীয় বর্বরতার এক অধ্যায়। ইসলামের আবির্ভাব থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সমগ্র মধ্যযুগ ধরে মুসলমানরা সারা বিশ্বে যে তাণ্ডব করেছে, তার নজির ইতিহাসে দ্বিতীয়টি নেই। ইসলাম-পূর্ব যুগকে ইসলামী চিন্তাবিদগণ আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগ (অন্ধকার যুগ) হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু নানা কারণে আধুনিক মুক্ত চিন্তাবিদগণ ইসলামের আবির্ভাবের দিন থেকেই আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগ শুরু হয়েছে বলে চিহ্নিত করছেন এবং এই সময়টিকে মধ্যযুগ বলে চিহ্নিত করে বর্বরতার যুগ বা মধ্যযুগীয় বর্বরতা নামকরণ করেছেন। আরব, ইরান ও ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্যালোচনা করে এ কথা চরম সত্য বলে এক বাক্যে সবাই গণ্য করেন।

পৃথিবীর বড় বড় সভ্যতা কেমন করে অধঃপতিত হল, সে সম্পর্কে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "জগতের সমস্ত প্রাচীন সভ্য জাতির অধঃপতনের ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন। অর্ধানশনক্লিষ্ট বর্বর যখন বুভুক্ষা

পীড়নের জন্য সভ্য জগতের বিলাসব্যসনে মগ্ন মানবের রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করে তখন প্রথমবার সে প্রত্যাখ্যাত হয়; কিন্তু সে যখন ফিরিয়া আসে, যখন সে বুঝিতে পারে যে, সভ্য মানবের কোমল করকমলে ধৃত আয়ুধ দৃঢ়মুষ্টিতে ধৃত নহে, তখন সভ্য মানবের পক্ষে তাহার গতি রোধ করা অসম্ভব। প্রাচীন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগতে ইহাই সভ্য মানবের সহিত বর্বরের ঘাত প্রতিঘাতের একমাত্র ইতিহাস। অধঃপতন আরাধ্য হইলে সভ্য মানব স্তম্ভিত হইয়া থাকে। অনেক সময় আত্মরক্ষার জন্য হস্তত্তোলন তাহার পক্ষেঅসম্ভব হইয়া পড়ে। তখন আর ইতিহাস রচিত হয় না। বিশাল সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশিষ্ট, বহু ক্লেশে রক্ষিত মহানগরী যখন বর্বর সেনা কর্তৃক আক্রান্ত হয়, সভ্য মানব যখন আত্মরক্ষা অসম্ভব জানিয়া স্তব্ধ হইয়া থাকে, যখন মহানগরীর উদ্যান, প্রাসাদ, সঙ্ঘারাম, মন্দির, নগরবাসীগণের সহিত একত্রে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তখন আর ইতিহাস রচিত হয় না। এই জন্যই জগতের সর্বত্র প্রাচীন সভ্য জাতির অধঃপতনের ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন। বহু আয়াসলব্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড প্রমাণ যোজনা করিয়া অধঃপতনের ইতিহাস লিখিত হইয়া থাকে।" (রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১)

এ কারণেই ভারত উপমহাদেশে হিন্দু সভ্যতা অধঃপতনের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নেই। আর এ কারণেই পণ্ডিতগণ হিন্দু অধঃপতনের ও ইসলাম বিস্তারের কারণ খুঁজতে গিয়ে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়িয়েছেন। কিন্তু ভুল করেছেন মুসলিম ঐতিহাসিকদের রচিত ইতিহাস না পড়ে। অনেকে সবই জানেন; কিন্তু সাম্প্রদায়িক হিসেবে চিহ্নিত হবার ভয়ে সত্য প্রকাশ করেন না। কিন্তু ইতিহাস লিখতে গেলে সত্য ইতিহাসই লেখা উচিত। ইতিহাসে জোচ্চুরি চলে না। অথচ আমাদের দেশে তা দিব্যি চলে আসছে। আমাদের উচিত পরববর্তী প্রজন্মের হাতে একটি সত্যিকার ইতিহাস তুলে ধরা, আচার্য্য যদুনাথ সরকারের সেই বিখ্যাত কথাটি স্মরণ রেখে, "সত্য প্রিয়ই হউক আর অপ্রিয়ই হউক সাধারণের গৃহীত হউক আর প্রচলিত মতের বিরোধী হউক তাহা ভাবিব না। আমাদের স্বদেশ গৌরবকে আঘাত করুক আর না করুক তাহাতে আক্ষেপ করিব না, সত্য প্রচার করিবার জন্য সমাজের বা বন্ধুবর্গের মধ্যে উপহাস ও গঞ্জনা সহিতে হয় সহিব। কিন্তু তবুও সত্যকে বুঝিব, গ্রহণ করিব ইহাই ঐতিহাসিকের প্রতিজ্ঞা।"

ভারতবর্ষের হিন্দুদের অধঃপতনের কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে একই সঙ্গে ইসলাম বিস্তার এবং সেই সঙ্গে মুসলমানদের ধর্ম এবং আচার সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। এ কারণেই আলোচনার প্রথমেই পাঠকদের জানিয়ে দেওয়া দরকার ইসলাম ধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ হল কোরান, যা একটি ঐশীগ্রন্থ বলে পরিচিত। কোরানের পরেই হাদিস। হাদিস হল হযরত মুহাম্মদের প্রামাণিক উক্তি ও কর্ম। মুসলমানগণ এ দু'টি গ্রন্থের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন বলে দাবি করেন এবং মুসলমান বাদশাহ্গণ কোরান-হাদিস অনুযায়ী রাজ্য শাসন করতেন। এ ব্যাপারে সহযোগিতা

নিতেন ওলেমা ও মাওলানাদের। আমি বোঝার সুবিধার্থে কোরান-হাদিসের বাণী এবং তার প্রয়োগ এক সঙ্গে আলোচনা করব যাতে পাঠকগণ বাস্তব অবস্থা ও তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বুঝতে কষ্ট বোধ না করেন।

ইসলামে কাফের হল বিধর্মী, মুশরিক হল পৌত্তলিক কাফের। আর মুনাফেক হল বাইরে ইসলাম ধর্মাবলম্বী; কিন্তু ভিতরে ভিতরে ইসলামের শত্রু। সপ্তম শতাব্দীতে মদিনার নবী বিরোধী গোষ্ঠীকে এই নাম দিয়ে কোরানে বারবার ধিক্কার দেওয়া হয়েছে। এই গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন আব্দুল্লা ইবন উবাই।

ইসলামে আর একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল 'জেহাদ'। কোরানের পরিভাষায় জেহাদ হচ্ছে 'জেহাদ ফি সবিলিল্লা' (আল্লার পথে সংগ্রাম)। বিধর্ম ও বিধর্মীনাশের যুদ্ধই হল জেহাদ। অনেকে বলেন, জেহাদের অর্থ ধর্মযুদ্ধ। এ কথাটা ভুল। জেহাদের নিত্যসঙ্গী হচ্ছে 'গণিমা' বা 'গণিমতের মাল'। জেহাদে কাফেরদের কাছ থেকে যে সব মাল কেড়ে আনা হয়; তার নাম 'গণিমতের মাল'। এর সঙ্গে আর একটি শব্দ জানা প্রয়োজন। এটি হল 'জিজিয়া'। হিদাইয়া গ্রন্থের মতে, "জেদ করে যারা কাফেরির পাপে অটল থেকে যায়, তাদের কাছ থেকে ইসলামী রাষ্ট্রের পাওনা আক্কেল সেলামীর নাম জিজিয়া (Retribution)। এই কর অত্যন্ত হীনতার সঙ্গে পৌঁছে দিতে হয় পবিত্র মুসলমানদের কাছে। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ হচ্ছে 'ফায়' বা 'ফেই'। এর অর্থ হচ্ছে 'বিনা যুদ্ধে পাওয়া লুটের মাল', যার সবটাই পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদের পাওনা। জিজিয়াকে 'ফায়' এর মধ্যে ধরা হয়। 'জিম্মি' শব্দটির তাৎপর্যও আমেদের জানতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্রের জিম্মায় থাকা জিজিয়া করদাতা কাফেররা হচ্ছে 'জিম্মি'। এরা জেহাদে (ইসলামী যুদ্ধে) বিজিত ইসলামী রাষ্ট্রের অধম নাগরিক। এরই সঙ্গে 'গাজী' শব্দটির অর্থও জেনে নিতে হবে। কাফের খুন করে যে মুজাহিদ জয়ী হয় তাকে বলা হয় গাজী। ('One who slays an infidel'- Hughes) হযরত মুহম্মদ তার মদিনা বাসের দশ বছরের মধ্যে ৮২ বার জেহাদ করেছিলেন। তার মধ্যে ২৬/২৭-টিতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি নিজে। এই সব জেহাদকে বলা হয় 'গাজোয়াৎ'। অর্থাৎ প্রতিবারই তিনি 'গাজী' হয়েছিলেন। হাদিসে এও দেখা যায় যে, গাজোয়াৎগুলির বেশীর ভাগই ছিল হানাদারী, অর্থাৎ শত্রুকে নোটিশ না দিয়ে আক্রমণ। বৈরাম খাঁর নির্দেশে নিরস্ত্র ও বন্দী হেমরাজ বিক্রমজিৎ ওরফে হিমুকে হত্যা করে বালক আকবর 'গাজী' হয়েছিলেন।

আসুন, আমরা 'জান্নাতুল ফিরদৌস' বলতে কি বুঝায় তা জেনে নিই। এটি ইসলামের সর্বোচ্চ স্বর্গ। জেহাদে গিয়ে যারা মারা যাবে তারা শহীদ। এরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরাসরি ঐ সর্বাচ্চ স্বর্গে চলে যাবে। জেহাদ না করা মুসলমান যত ধার্মিকই হোক ঐ স্বর্গে যেতে পারবে না। ইসলামের কয়েকটি কথার তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা আগেই তুলে ধরলাম এই জন্য যে, পরে আলোচ্য অংশ পাঠকালে পাঠকদের যেন বুঝতে কষ্ট না হয়।

অপরাধ সম্পর্কে সর্বজনীন মত এবং ইসলামী মত এক নয়। এ সম্পর্কে আমি একটু আগেই বলেছি। প্রসঙ্গতঃ ইসলামের জয়যাত্রা ও ইসলামী নীতি সম্পর্কে একটু আলোকপাত করা প্রয়োজন। হযরত মুহাম্মদ মক্কা জয়ের (জানুয়ারী, ৬৩০) আগে আরব দেশে ইসলাম প্রচারের জন্য ব্যাপক উদ্যোগ নেননি। তিনি ঐ সময় মদিনার মোহাজির (Refugees) ও আনসার (Helpers) গোষ্ঠী মিলিয়ে সে যুগের ছোট আকারের মুসলমান সমাজকে সংহত করে বিভিন্ন আরব ও ইহুদি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অবিরাম 'হানা যুদ্ধ' আর পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ চালিয়ে শক্তি সঞ্চয় করতেই ব্যস্ত ছিলেন। পূর্ণ শক্তির মুহূর্তে তিনি দশ হাজার সৈন্য নিয়ে অতর্কিতে মক্কায় ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং বিনা রক্তপাতেই তিনি মক্কা জয় করেন। মক্কাবাসীরা বিপদে পড়ে ও মৃত্যুর ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। তাদের নেতা আবু সুফিয়ান হযরতের সঙ্গে অলিখিত চুক্তির শর্ত মেনে বাধ্য হন ইসলাম গ্রহণ করতে। স্যার উইলিয়াম ম্যুর এই অলিখিত বোঝা-পড়ার বিবরণ দিয়েছেন এ ভাবে, 'বিশাল বাহিনী সমেত পয়গম্বরের মক্কা অভিযানের খবর পেয়ে আগের দিন সন্ধ্যাবেলা আবু সুফিয়ান মদিনার পথ ধরে তার সঙ্গে দেখা করতে অগ্রসর হন। পথে পয়গম্বরের চাচা আল-আব্বাসের সঙ্গে তার দেখা হয়। আব্বাস তাকে পয়গম্বরের কাছে নিয়ে যান। হযরত তাকে বলেন, 'কাল সকালে আমার সঙ্গে দেখা করবে।' সকাল বেলা আব্বাসের সঙ্গে সুফিয়ান নত শিরে পয়গম্বরের শিবিরে উপস্থিত হন। ম্যুরের ভাষায়, —

"(কোরেশ নেতা যখন কাছে এলেন) পয়গম্বর তীব্রস্বরে বলে উঠলেন; "ধিক তোমাকে আবু সুফিয়ান, তুমি কি আজও বোঝনি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই?" উত্তরে আবু সুফিয়ান বললেন, "হে মান্যবর, আর কোন উপাস্য যদি থাকতেন, তবে তিনি যথার্থ আমার কোন কাজে আসতেন।" (Honoured sir! had there been any beside verily he had been of some avail to me.) নবীজী বললেন, তবে তুমি মানছো যে, আমি আমার প্রভুর রসুল? সুফিয়ান, "হে মান্যবর! এ নিয়ে আমার এখনো একটু আধটু দ্বিধা দ্বন্দ্ব আছে।" (Noble Sir, as to this thing there is in my heart yet some hesitancy.)

একথা শুনে আব্বাস চেঁচিয়ে উঠলেন, "কি আপদ, এটা দ্বিধা দ্বন্দ্বের সময় নয়। এই মুহূর্তে ইসলামের কলেমায় বিশ্বাস কর আর সাক্ষ্য দাও; তা নাহলে বিপদ হবে তোমার গর্দানের।" এই বিবরণ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় আবু সুফিয়ান গর্দানের ভয়েই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং পরের দিন বেশীর ভাগ কোরেশই তার অনুসরণ করে।

হযরত মুহাম্মদ কোরেশদের কেন ইসলামে দীক্ষিত হতে বাধ্য করলেন? কারণ এটি কোরানের বাণী। আল্লাহ্ বলেছেন, 'পৃথিবী থেকে পৌত্তলিকদের উৎখাত করে সারা বিশ্বের আল্লার ধর্ম প্রতিষ্ঠা করাই মুসলমানের পরম কর্তব্য।' (কো- ৮/৩৯) (Make war on them until idolatry is no more and Allah's religion reigns

supreme.)

এইটেই আল্লাহ্‌র পথে শ্রেষ্ঠ কর্মোদ্যম; এইটেই আদি ও অকৃত্রিম 'জেহাদ ফি সবিলিল্লাহ'। যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করত তাহলে তাদের কি করা হত? মধ্য যুগের বিখ্যাত ওলেমা কাজী মুগিসউদ্দিন সুলতান আলাউদ্দিনের নিকট এই রকম একটি প্রশ্নের সমাধান চেয়েছিলেন। উত্তরে মুগিসউদ্দিন বলেছেন, —

"আল্লাহ্‌তালা ইহুদিগকে অসম্মানকজনক অবস্থার মধ্যে রাখা ধার্মিকতার অংশ বলিয়া গণ্য করেন। কারণ ইহারা হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফার ধর্মের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক শত্রু। এই জন্য হযরত ইহুদিগকে হত্যা করা, ইহাদের ধন সম্পদ লুঠ করা এবং ইহুদিগকে দাস-দাসী হিসাবে গ্রহণ করিবার আদেশ দিয়াছেন। আমরা যে ইমামের মাযহাব মানিয়া চলি, সেই ইমাম আজম আবু হানিফাই শুধু ইহুদিগকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা অথবা ইহুদিগকে মারিয়া কাটিয়া ধন-সম্পদ লুট করিয়া দাস-দাসী হিসাবে গ্রহণ করিবার কথা বলিয়াছেন। অন্যান্য ইমাম ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা ইহুদের জন্য দুইটি পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন, হয় তাহারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিবে; নতুবা তাহাদিগকে হত্যা করিতে হইবে।" (জিয়া উদ্দিন বারাউনী, তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, পৃ-২৩৯) বলা বাহুল্য, সম্রাট আলাউদ্দিন এই নীতিতেই ভারত শাসন করতেন।

এখন দেখা যাক, ইসলামে প্রকৃত পক্ষে এ ধরনের বিধান আছে কিনা; নাকি ওলেমা মাওলানাদের খেয়াল খুশী মত ফতোয়া? বিধর্মীদের যে হত্যা করতে হবে এ সম্পর্কে কোরানের বাণী আমরা জেনেছি। সেটি তৎকালে প্রয়োগ হয়েছিল কিনা তা জানা যাবে হাদিস শরীফ হতে। একটি হাদিসে দেখা যাচ্ছে, "বানু কুরাইজা গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আল্লার নবীকে আমি বলতে শুনেছি যে, 'তাদের মধ্যে বয়োপ্রাপ্তদের হত্যা করা উচিত, কিন্তু যে বয়োপ্রাপ্ত হয়নি তাকে রেহাই দেওয়া উচিত।' আবু আল জুবায়েরকে যিনি এই হাদিস বলেন, তিনি বলেন যে, তিনি তখনো বয়োপ্রাপ্ত হননি বলে তাঁকে রেহাই দেওয়া হয়। (মজিদ খাদ্দুরী, মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন, পৃ-৯৪, সারাকসী মবসুত, ভলিউম-১০, পৃ-২৭) অন্যান্য হাদিসেও আছে, "আল্লার নবী বলেন, 'বয়োপ্রাপ্ত অবিশ্বাসীদের তোমরা হত্যা করতে পার। তবে তাদের যুবক ও শিশুদের অব্যাহতি দাও।' (ঐ, পৃ-৯৫, আবু ইউসুফ, কিতাব-আল খারাজ, পৃ-১৯৫) (একজন কমাণ্ডার) খলিফা আবু বকরকে এক পত্র পাঠিয়ে জানতে চান যে, রোমের (বাইজেন্টাইন) যুদ্ধবন্দীকে মুক্তিপণের বদলে ছেড়ে দেওয়া যাবে কিনা। তিনি উত্তর দেন যে, তাকে মুক্তিপণের বদলে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়, এমনকি বেশী পরিমাণ সোনার বদলেও নয়। তাকে হয় হত্যা করতে হবে, আর না হয় তাকে মুসলমান হতে হবে। (ঐ পৃ- ৯৮, সারাকসী মবসুত, ভলিউম- ১০, পৃ-২৪)

অনুরূপ কয়েকটি হাদিস —

১৩১৭। (আবদুলাহ্‌) বিন আব্বাস থেকে মিকসাম (বিন বুজরা), মিকসাম থেকে আল হাকাম (বিন উতায়বা), আল হাকাম থেকে আল-হাসান বিন-উমারা এবং

আল হাসান থেকে মুহাম্মদ বিন আল-হাসান বলেন —

আল্লাহ্‌র বাণী আরব বহুত্ববাদীদের ইসলাম গ্রহণ বা হত্যা ছাড়া আর বিকল্প দেননি। আবু হনিফা, আবু ইউসুফ, এবং মুহাম্মদ (বিন-আল হাসান) এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

১৩১৮। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আরব বহুত্ববাদীরা যদি ইসলাম গ্রহণে অসম্মতি জানায়, তাহলে মুসলমানদের সাথে চুক্তি করার ও জিম্মি হওয়ার সুযোগ তাদের দেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

১৩১৯। তিনি উত্তর দিলেন ঃ তাদের কখনই একাজ করার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। তাদের প্রতি বরং ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানানো উচিত। তারা যদি মুসলমান হয় এবং এটাই তাদের জন্য গ্রহণযোগ্য, অন্যথায় তাদের আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করা উচিত। কারণ, এটাই নীতি বলে আমরা জানি এবং তাদের প্রতি অপর অবিশ্বাসীদের মত আচরণ করা যাবে না।

১৩২০। (আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ) মুসলমানরা যদি তাদের আক্রমণ করে তাদের মেয়েলোক ও শিশুদের বন্দী করে এবং পুরুষদের যুদ্ধবন্দী করে, তাহলে তাদের সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত হবে?

১৩২১। তিনি উত্তর দিলেনঃ মেয়েরা ও শিশুরা অমুসলিমদের কাছ থেকে বিনা যুদ্ধে অর্জিত সম্পত্তির মত বিবেচিত হবে এবং তাদেরকে যুদ্ধলব্ধ মাল হিসেবে ভাগাভাগি করে নেওয়া যাবে। এর মধ্যে এক পঞ্চমাংশ গ্রহণ করা যাবে; পুরুষদের ক্ষেত্রে যারা ইসলাম গ্রহণ করবে তারা হবে মুক্ত। তাদের বিরুদ্ধে কিছু করা যাবে না। কিন্তু যারা ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাবে তাদেরকে হত্যা করতে হবে। (মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন, মজীদ খাদ্দুরি, পৃ-২৩৮, মবসুত, ভলিউম-১০, পৃ-১১৭-১৯)

আর মুহাম্মদের পূর্ববর্তী এক নবী নূহ বলিলেনঃ "হে আমার খোদা; এই কাফেরদের মধ্যে হইতে ভূ-পৃষ্ঠে বসবাসকারী একজনকেও অবশিষ্ট রাখিও না"। (কো-৭১/২৬) যদি আপনি তাদেরকে যমীনে অবশিষ্ট রাখেন, তবে তারা আপনার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং জন্ম দেবে কেবল পাপাচারী ও কাফের। (কো-৭১/২৭)

আজকাল অনেকে বলেন, এসব আইন শুধু আরবদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু তা ঠিক নয়। গোলাম মোস্তাফা বলেছেন, মহানবীর "সমস্ত সংগ্রামের মূল প্রেরণা ছিল পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ সাধন করিয়া তৌহিদকে জয়যুক্ত করা। এ সংগ্রাম প্রকৃত পক্ষে কোরেশদিগের বিরুদ্ধে নয়, মক্কার বিরুদ্ধেও নয়, ইহুদি খৃষ্টানদিগের বিরুদ্ধেও নয়, জগৎজোড়া পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে।" (গোলাম মোস্তাফার 'বিশ্ব নবী', পৃ-২৭০)

ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে আহ্বান জানালে এবং সে ইসলাম গ্রহণ না করলে তাকে হত্যা করা যাবে। ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে এমন শত্রু এলাকায় ইসলামের সেনাবাহিনী আক্রমণ করতে পারে। দিনে বা রাতে শত্রুর উপর আক্রমণ

করা যেতে পারে এবং শত্রুর দুর্গগুলো আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলা, পানি দিয়ে তা প্লাবিত করা, অনুমোদন যোগ্য। মহানবী বর্ণিত অপর এক হাদিসে উল্লেখ আছে, "আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, একথা না বলা পর্যন্ত বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করতে আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।" সুতরাং 'আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই' — একথা যদি তারা বলে তাহলে তাদের রক্ত ও সম্পত্তির ব্যাপারে তারা নিরাপদ থাকবে। (সহি বুখারী, ভলিউম-২, পৃ-২৩৬)

ইসলামে যুদ্ধকে আইনানুগ করা হয়েছে যুদ্ধের পূর্বে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানানোর মধ্য দিয়ে। শত্রুরা যদি ইসলাম গ্রহণে অস্বীকার করে, তাহলে মুসলমানদের জন্য যুদ্ধ ঘোষণা আইনানুগ হবে। (হামিদুলাহ, 'মুসলিম কণ্ডাক্ট অব ষ্টেট', পৃ- ১৯০-৯২, খাদ্দুরী, 'ওয়ার এণ্ড পীস ইন দি ল' অব ইসলাম', পৃ- ৯৬-৯৮)

আমি এর আগে একবার বলেছি, জাহেলিয়ার যুগ ইসলামের আগে ছিল না ইসলাম আবির্ভাবের পরে শুরু হয়েছে তা বলা মুশকিল। কারণ, ইসলামের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় প্রায় সর্বত্রই মুসলমানরাই প্রথমে গায়ে পড়ে আক্রমণ ও চোরা গোপ্তা হামলা চালিয়েছে। 'হয় ইসলাম গ্রহণ কর, নাহলে তোমাকে হত্যা করা হবে, তোমার সম্পদ কেড়ে নেয়া হবে' — এটা কোন নৈতিকতার মধ্যে পড়ে না। অথচ ইসলাম আবির্ভাবের পর থেকে এটাই মুসলমানদের ধর্মীয় বিধি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আরও একটা ব্যাপার লক্ষ্য করার মত। তা হল ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে পবিত্র মাস সমূহে অস্ত্র ধারণ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ এ নিয়ম ভঙ্গ করে পবিত্র মাসেও হত্যা ও লুণ্ঠন চালাতে শুরু করলেন। এ সম্পর্কে কোরানে বলা হয়েছে, "লোকে তোমাকে পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্বন্ধে প্রশ্ন করে, বল সেই সময় যুদ্ধ করা মহাপাপ (২: ২১৭)।" এই নিয়ম ভঙ্গ করে আল্লার নবী (পবিত্র মাস) মুহররমের শুরুতে আল তায়েফের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন এবং সফর মাসে তা দখল না করা পর্যন্ত চল্লিশ দিন যাবৎ অভিযান অব্যাহত রাখেন। এই পবিত্র মাস সমূহে যুদ্ধকে জায়েজ করার জন্য কোরানে পবিত্র মাস সমূহে (পবিত্র মাস হলো শাওয়াল, জিলকদ, জিলহজ্ব এবং মহররম) যুদ্ধ বন্ধ রাখার বিধান (পবিত্র কোরানে উল্লেখিত ২:২১৭) সর্ব শক্তিমান আল্লাহ বাতিল করে দেন।

নবীজী মক্কা থেকে মদীনা যান অর্থাৎ হিজরত করেন ৬২২ খৃঃ। তার আগে জেহাদের কোন আয়াত নাজিল হয়নি। নবীজীর মক্কাবাস কালে ইসলাম ছিল অনেকটা শান্তিপূর্ণ। শান্তিপূর্ণ সহবাসের আয়াতগুলো হিজরতের আগে নাজিল হয়েছিল। কিন্তু মদিনায় হিজরত করার পরেই অবস্থা বদলে যায় এবং জেহাদের আয়াতগুলি নাজিল হতে শুরু হয় এবং আল্লাহ্ মুসলমানদের বলেন, "যদি তোমরা অভিযানে বের না হও তবে তিনি তোমাদের মর্মন্তুদ শাস্তি দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করিবেন।" (কো- ৯/৩৯)

কোরান এবং হাদিসে বহুত্ববাদীদের শত্রু বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এরা কেন

শত্রু? কিভাবে শত্রুতা সৃষ্টি হল? এ সম্পর্কে ইসলামী মত জানা প্রয়োজন। কারণ, আমরা শত্রু বলতে যা বুঝি ইসলামী শত্রুর ধারণা তা থেকে আলাদা। প্রথমে ইসলামী রাষ্ট্র কি, সে সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা যেতে পারে মজীদ খাদ্দুরীর 'মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন' শীর্ষক কিতাব থেকে।

"একক জনগোষ্ঠীর মধ্যে আবির্ভূত এবং পরে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রসারিত ইসলাম রাষ্ট্রকে একটা মতবাদ বা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে তথা সব মানুষকে ধর্মান্তরিত করার হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করে। স্বাভাবিক ভাবেই ইসলামী রাষ্ট্র হয়ে পড়ে একটা সাম্রাজ্য এবং একটি সম্প্রসারণশীল রাষ্ট্র, অন্য মানুষকে ধর্মান্তরিত করে জয় করার প্রচেষ্টায় এই রাষ্ট্র রত ছিল।" (পৃ- ৩)

"আল্লাহর কর্তৃত্বের বাস্তব রূপায়নের সপ্রতিভ অনুভূতি এবং তরবারির সাহায্যে হলেও তার প্রত্যাদেশিত আইনের সুবিধা অন্যান্য জাতির মধ্যে বিস্তৃত করার দৃষ্টান্ত মানবেতিহাসে ভূরি ভূরি রয়েছে।" (পৃ—১৭)

"ইসলামী মতবাদ অনুযায়ী এই পৃথিবী দু'ভাগে বিভক্ত — ইসলাম শাসিত অঞ্চল বা 'দার-উল-ইসলাম'। বিশ্বের বাকি অংশকে বলা হয় 'দার-উল-হরব' বা যুদ্ধের এলাকা।" (পৃ-১২)

ইসলামী রাষ্ট্রের চারদিকের সব জাতি ও এলাকা যা ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনাধিকারে আসেনি তা যুদ্ধরত এলাকা হিসেবেই সামগ্রিক ভাবে পরিচিত। ইসলামী আইন ব্যবস্থায় যুদ্ধরত এলাকা গৌণ, মুখ্য বিষয় নয় এবং এই এলাকাকে ইসলামী রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার আওতায় আনার মত শক্তি অর্জন করলে তা ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা মুসলমান শাসকদের কর্তব্য ছিল। (পৃ-১৩)

হাদিসে আর একটু পরিষ্কার করে বলা হয়েছে, "দার-উল-ইসলাম তত্ত্বগত ভাবে দার-উল-হরব-এর সাথে যুদ্ধরত। কারণ ইসলামের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল সমগ্র বিশ্ব জয় করা। দার-উল-হরব যদি ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে তাহলে বিশ্বব্যাপী ইসলামী সমাজের আইন ও শাসন ব্যবস্থা অন্য সব কিছুকেই বাতিল করে দেবে। (পৃ- ১৪)

"এই দার-উল-হরবকে দার-উল-ইসলামে রূপান্তরিত করার উপায় হল জেহাদ। জেহাদ শুধু ব্যক্তি বিশেষের করণীয় কর্তব্য নয়, ইসলামের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে তথা ইসলামের উপর বিশ্বাস স্থাপনকে সর্বজনীন করা ও বিশ্বে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য রাষ্ট্রের প্রজাদের উপর অর্পিত রাজনৈতিক কর্তব্যও বটে। এই কর্তব্য সম্পাদনে বিফল হওয়া একটা মারাত্মক কর্তব্যচ্যুতি বা নৈতিক অপরাধ।" (পৃ- ১৬)

'ইসলামী আইন অনুযায়ী দার-উল-হরব-এর উপর দার-উল-ইসলামের বিজয় না হওয়া পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করবে। সেই মতে দার-উল-হরব বিলুপ্ত হলেই যুদ্ধাবস্থার সমাপ্তি ঘটবে। ইসলামী মতবাদ অনুযায়ী জেহাদ তাই দার-উল-হরবকে দার-উল-ইসলামে রূপান্তরিত করে ইসলামের আদর্শ স্বরূপ জন-শৃঙ্খলা ও শাসন ব্যবস্থা কার্যকরী করার একটা সাময়িক বৈধ উপায় মাত্র।" (পৃ- ১৭)

অতএব "কোন রাষ্ট্র স্বেচ্ছায় কোন যুদ্ধরত রাষ্ট্রের সাথে শত্রুতামূলক সম্পর্ক বজায় রাখা থেকে বিরত থাকার ইচ্ছাকে যদি নিরপেক্ষতার অর্থ ধরা হয় তাহলে তেমন নিরপেক্ষ সম্প্রদায়ের কোন স্থান ইসলামী আইন ব্যবস্থায় নেই। ইসলামী আইন মতে যেহেতু সব সম্প্রদায়ই ইসলামের সাথে যুদ্ধাবস্থায় বিদ্যমান, সেহেতু তারা যদি দার-উল-ইসলামের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি লাভে ব্যর্থ হয়, তাহলে কেউই জেহাদ থেকে অব্যাহতি পাবে না বা নিরপেক্ষ অবস্থার সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারবে না।

হযরত মুহাম্মদের মক্কা জয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম। প্রসঙ্গক্রমে অন্যদিকেও কিছুটা আলোকপাত করতে হলো। যাই হোক, হযরত মুহাম্মদ মক্কা জয় করে কি করলেন, সে সম্পর্কে ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক সংগ্রাম' পত্রিকার ৩০ শে মার্চ, ১৯৯৭ সংখ্যায় জনৈক সত্যবাদী লিখেছেন, "মক্কা বিজয়ের পর তিনি তার প্রাণের শত্রুদের পর্যন্ত ক্ষমা করেছিলেন, কিন্তু ক্ষমা করতে পারেননি মূর্তিগুলোকে। বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশের পর কাবা ঘরে ঢুকে নবীজীর প্রথম কাজই ছিল ওখানকার মূর্তিগুলি ভেঙে ফেলা। এক এক করে ৩৬০-টি মূর্তি চূর্ণ বিচূর্ণ করে এবং কাবার দেওয়ালের সব চিত্রের বিলুপ্তি ঘটিয়ে কা'বাকে পবিত্র করেছিলেন। এরপর মক্কা শহরের যেখানে যেখানে মূর্তি ছিল তার শেষ চিহ্নটুকু মুছে দিয়েছিলেন। মক্কাকে মূর্তির অভিশাপ মুক্ত করে তিনি নজর দিয়েছিলেন আশে পাশের আরব এলাকার দিকে। সে সকল এলাকার মূর্তি গুঁড়িয়ে দেবার জন্য পরিচালনা করেছিলেন একের পর এক সেনা অভিযান। কুরাইশ ও বনি কানানার সর্বশ্রেষ্ঠ বিগ্রহ ওজ্জার মূর্তি ভাঙার জন্য ত্রিশ জন মুজাহিদ সহ খালেদ সাইফুল্লাহ (রাঃ)-কে পাঠিয়েছিলেন 'নাখলায়'। বনি হোজাইলের 'সোওয়া' নামের মূর্তি ধ্বংস করার জন্য পাঠিয়েছিলেন সাহাবী হযরত আমরকে (রাঃ)। কোদাইল অঞ্চলে আওস ও খাজরাজদের আরাধ্য দেবতা 'মানাতের' মূর্তি ধ্বংস করার জন্য বিশ জন অশ্বারোহী মুজাহিদ সহ পাঠিয়েছিলেন সাহাবী সায়াদ বিন যায়েদ আশহালীকে (রাঃ)। এভাবে মক্কার চারদিকে সেনা ইউনিট পাঠিয়ে সকল মূর্তি চূর্ণ বিচূর্ণ করে সকল বিগ্রহ ধ্বংস করে শিরক ও পৌত্তলিকতার অভিশাপ থেকে চিরতরে মুক্ত করলেন আরব ভূমি।"

শুধু মূর্তি ভাঙাতেই অভিযান শেষ হয়ে যায়নি। সেখানকার লোকগুলির ব্যবস্থা হলো কোরান অনুযায়ী। তা হলো, 'ইসলামী সত্য ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ। সব বিশ্বাসীর (মুসলমানের) উপর আল্লাহ্‌র এই আদেশ — 'যেখানেই বহু দেববাদী পাও তাদের হত্যা কর।' এবং মহানবীর বাণী, 'আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। একথা না বলা পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধ কর'। (কোরান-৯:৫ এবং হাদিস সহীহ বুখারী, ভলিউম-১, পৃ- ১১১।

'হয় ইসলাম গ্রহণ নতুবা মৃত্যু'। মক্কাবাসীরা প্রথমটি বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু মদিনার ইহুদিরা বেছে নিয়েছিলেন দ্বিতীয়টি। ৬২৭ খৃষ্টাব্দে প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক কুরাইজা

ইহুদিকে হত্যা করা হয়েছিল। নারী, শিশু ও সম্পদ 'গণিমতের মাল' হিসাবে মুসলমানরা ভাগ বাটোয়ারা করে নিয়েছিল। "মদিনা বাজারের মাঝখানে বিশাল গর্ত খোঁড়া হল এবং রাত শেষ হলে ভোরের নামাজ পড়ার পরপরই একের পর এক ইহুদিকে সেখানে নিয়ে গিয়ে কেটে ফেলা হল। ঘাতকের ভূমিকায় ছিল আলি এবং তার চাচাত ভাই যুবায়ের। প্রকাশ্য দিবালোকে এবং শত শত সাধারণ মানুষের সামনে এই কোতল পর্ব চলে। সমস্ত দিন ধরে নবী স্বয়ং সেখানে উপস্থিত থেকে প্রবল মানসিক শক্তির পরিচয় রেখেছেন। ঐ যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদের মধ্যে ছিল জমিজমা, অস্থাবর দ্রব্যাদি, পশু এবং ক্রীতদাসী (শিশু বাদে এক হাজার)। মহানবী এর প্রত্যেকটির পাঁচ ভাগের এক ভাগ নিজে রেখে কয়েকজন মহিলাকে তাঁর সাহাবাদের উপঢৌকন দিলেন। অপর মহিলা ও শিশুদের বিক্রির জন্য নেজদ-এ পাঠিয়ে দিলেন।" [From: 'The Life of Mahomet' by Sir Willium Muir, 1st Indian Reprint, 1992, Voice of India, New Delhi, pp-316-322।

নবীজীর জীবনী লেখকরা ইহুদিদের সংখ্যার নানা হিসেব দিয়েছেন। তার মধ্যে '৮০০' সংখ্যাটাই বেশি পাওয়া যায়। এই হত্যাকাণ্ডে কি ন্যায় বিচার লঙ্ঘিত হয়েছিল? কোরানের ৮/৬৭ নং আয়াতে বোঝা যায় অল্লাহ্‌র বিচার এটাই। এটা একটা সুন্না; মুসলমানদের চোখে একটি মহাপবিত্র সুন্না। এটি থেকে প্রেরণা পেয়েই তৈমুর লঙ দিল্লিতে এক লক্ষ নিরস্ত্র হিন্দু হত্যা করেছিলেন। তিনি তার আত্মজীবনীতে এটাকে পুণ্য কাজ বলেই জবাবদিহি করে গেছেন। ভারতের তুর্কী মুসলমান আক্রমণকারীরা এই সুন্নার পদাঙ্ক অনুসরণ করেই পরলোকে সওয়াব (পুণ্য) অর্জন করতে তৎপর হয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালে পাঞ্জাবে যে নরমেধ যজ্ঞ হয় তাতেও এই সুন্না অনুসৃত হয়।

সুন্না সম্পর্কে পূর্বে কোন ধারণা দেওয়া হয়নি। এজন্য এখানে এ সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন। সুন্না হল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রামাণিক উক্তি ও কাজ। কখনো কখনো আবু বকর, ওসমান, ওমর ও আলীর উক্তি ও কাজকেও 'সুন্না' হিসাবে স্বীকার করা হয়। এদের মধ্যে ওমরের স্থান প্রধান। হযরত মুহাম্মদের (সা.) সব কাজ 'সুন্না' নয়। রক্তপাতহীন মক্কা জয় 'সুন্না' নয়। কিন্তু কুরাইজা নামক ইহুদিদের গণহত্যা 'সুন্না'। মক্কা জয়ের পর ব্যাপক দেব প্রতিমা ধ্বংস 'সুন্না'। আধুনিক ভারতে এই 'সুন্না' দু'বার বড় আকারে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। একবার ১৯২১ সালে খিলাফত কমিটির ডাকে এবং আর একবার ১৯৪৬ সালে কোলকাতার ভূতপূর্ব মেয়র মোহাম্মদ ওসমানের ডাকে। মোহাম্মদ ওসমান কাগজে কলমে মোজাহিদদের ডাক দিয়ে বলেন, "এই রমযান মাসে ইসলাম ও কাফেরদের মধ্যে প্রথম প্রকাশ্য যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই রমযান মাসেই আমরা মক্কায় জয় লাভ করি এবং পৌত্তলিকদের নিশ্চিহ্ন করে দেই। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় পাকিস্তান লাভের উদ্দেশ্যে জেহাদ আরম্ভ করার জন্য নিখিল ভারত মুসলিম লীগ এই রমযান মাসটি ঠিক করেছেন।"

নোয়াখালীর রায়টও হয় জেহাদের নামে। গোলাম সারোয়ার নামে তৎকালীন একজন এম. এল. এ. ঐ জেহাদের ডাক দেন। গোলাম সারোয়ারের 'ডাকের' অনুলিপি পাওয়া যায়নি, কিন্তু জর্জ সিমসন রায়টের যে বিবরণ দিয়েছেন, তার এক জায়গায় আছে, "জোর করিয়া ব্যাপক ভাবে দলে দলে হিন্দুদের ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করিবার বিবরণ প্রত্যেক গ্রামেই পাওয়া গিয়েছে। অনেক স্থানে পুরুষেরা আপত্তি করিলে তাহাদের স্ত্রীদের আটক করিয়া তাহাদেরকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হইয়াছে।" (রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড।)

তখনকার কংগ্রেস সভাপতি আচার্য্য জে: বি. কৃপালনী সে সময় নোয়াখালী ঘুরে যা দেখেছিলেন তা তিনি প্রকাশ করেছেন এই ভাষায়, "নোয়াখালী এবং ত্রিপুরার জন উন্মত্তার সব কিছুই ছিল প্রশিক্ষিত নেতৃত্বের অধীনে ব্যাপকভাবে পরিকল্পিত। রাস্তাঘাট কেটে দেওয়া হয়েছিল, যত্র-তত্র বন্দুকের ব্যবহার হয়েছিল এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গুণ্ডাদের বাইরে থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল। হাজার হাজার হিন্দু নারীকে অপহরণ করা হয়েছে অথবা জোর পূর্বক বিবাহ করা হয়েছে। তাদের পূজার স্থানকে অপবিত্র করা হয়েছে। এমনকি শিশুদের প্রতিও কোন রকম করুণা দেখানো হয়নি। (অমৃত বাজার পত্রিকা, ২২/১০/১৯৪৬) স্টেট্‌সম্যান পত্রিকার জনৈক সাংবাদিক নোয়াখালীর দাঙ্গা বিধ্বস্ত অঞ্চলে 'রিপোর্ট' করতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলেন তা মধ্যযুগীয় মুসলমান শাসন ব্যবস্থা বা ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও তৎপরবর্তী কালের আরব ইরান ও অন্যান্য অঞ্চলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছিলেন এভাবে, "নোয়াখালীর রামগঞ্জ থানার একটি বাচ্চা মেয়ে আমাকে ঘটনাটি বলেছিল। ১০ই অক্টোবর সকালে একদল লোক ঐ মেয়েটির বাড়ীতে এসে মুসলিম লীগের তহবিলে পাঁচশো টাকা চাঁদা চায়। চাঁদা না দিলে বাড়ীর সবাইকে খুন করা হবে বলে ওরা হুমকি দেয়। প্রাণের ভয়ে মেয়েটির বাবা ওদের পাঁচশো টাকা দিয়ে দেয়। এর কিছুক্ষণ পর ওরা আবার আসে। সঙ্গে এক বিরাট জনতা। ঐ বাড়ীর জনৈক অভিভাবক, যিনি আবার পেশায় মোক্তার, ঐ উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করতে এগিয়ে যান। কিন্তু কোন কথা উচ্চারণ করার আগেই তার মাথাটা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এরপর গুণ্ডারা পরিবারের সবচেয়ে বয়স্ক লোকটিকে (মেয়েটির দাদু) খুন করে। এবার মেয়েটির বাবার পালা। মেয়েটির বাবাকে তাঁরই সদ্য খুন হওয়া বাবার মৃতদেহের উপর শুইয়ে দেওয়া হয়। তখন মেয়েটির ঠাকুমা তাঁর ছেলেকে বাঁচাবার জন্য ছেলের দেহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং ওদের কাছ থেকে ছেলের প্রাণ ভিক্ষা চাইতে থাকেন। কিন্তু তাতে ওরা ক্রুদ্ধ হয়ে ঐ মহিলার মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করে এবং তার অচৈতন্য দেহ দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এবার আবার ওরা মেয়েটির বাবাকে মারতে উদ্যোগী হয়। মেয়েটি ভয়ে এতক্ষণ ঘরের কোণে লুকিয়ে ছিল। বাবার প্রাণ বাঁচাবার জন্য সে তখন ঘর থেকে বেরিয়ে আসে এবং ঐ ঘাতকদের হাতে গায়ের গহনা ও চারশো টাকা দিয়ে তাকে কাকুতি মিনতি করে তার

বাবাকে না মারার জন্য। ঐ ঘাতক তখন বাঁ হাতে মেয়েটির কাছ থেকে গহনাগুলি গ্রহণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গেই ডান হাতের দা দিয়ে মেয়েটির বাবার মাথা তার দেহ থেকে আলাদা করে ফেলে। (দি স্টেটসম্যান, ২৬.১০.১৯৪৬)

আধুনিক সাংবাদিক ও প্রতিবেদকগণ এ ধরনের ঘটনাকে গুণ্ডাদের কার্যকলাপ বলে চালিয়ে যেতে চান। কিন্তু আপনারা প্রথমেই পবিত্র কোরান, হাদিস ও সুন্নার উল্লেখ থেকে দেখেছেন যে, এগুলোর কোনটিই গুণ্ডা বা স্বেচ্ছাচারী বাদশাহ্‌দের কর্ম নয়। এর প্রতিটি ঘটনাই ইসলাম ধর্মসম্মত পবিত্র কাজ। হযরত মুহাম্মদের আচরণ বিধি বা সুন্না হচ্ছে মুসলমানের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। হযরত মুহাম্মদের জীবনের এই সমস্ত ঘটনা থেকেই জেহাদে ইসলাম প্রসারের অঙ্গরূপে দেব-মন্দির ও দেব-প্রতিমা ধ্বংস অবশ্য কর্তব্য হয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকি গজনীর সুলতান মাহমুদ প্রভৃতি ইসলামনিষ্ঠ সুলতানগণ দেব-প্রতিমা ধ্বংসের সময় কোরানের সেই আয়াতটিই উচ্চারণ করতেন যা কাবা গৃহের দেব-মূর্তি ধ্বংসের সময় সগর্জনে আউড়েছিলেন হযরত মুহাম্মদ নিজে। এম. এম. পিকথলের অনুবাদে, "Truth hath come and falsehood hath vanished away. Lo! Flasehood is ever bound to vanish." (Koran- 17/81)

একই সঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে ফিরোজ শাহ তোঘলক, সিকান্দার, লোদী, আওরঙ্গজেব প্রমুখ ভারতীয় শাসনকর্তাগণ হযরত মুহাম্মদের সুন্না প্রয়োগ করেই কোটি কোটি লোককে ইসলামে দীক্ষিত হতে বাধ্য করেছিলেন। ইরানেও এমনটি হয়েছিল। সমস্ত ইরান ছিল আর্য সভ্যতার লীলাভূমি। মুসলমানরা ৬৫১ খৃষ্টাব্দেই ইরান দখল সম্পূর্ণ করে তাদের দেব-মন্দির সমূহ ধ্বংস করে দিয়েছিল এবং জোর করে ইসলামে দীক্ষিত হতে বাধ্য করেছিল। যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি তারা পালিয়ে যায়। এ সময় শেষ আর্য সম্রাট আপ্তেশ্বর (যর্জদিগিদ) ইরান থেকে পালিয়ে খোরাসানে চলে যান। যারা যাননি (অগ্নি উপাসক আর্যরা) খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে খলিফা অল-মুতারক্কিলের (৮৪৭-৮৬১) সময় তারা চরমভাবে নির্যাতিত হন। অনেকে ইরানের পূর্ব দিকে পার্বত্য কোহিস্থানে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেন। অনেকে আরব সাগর পাড়ি দিয়ে ভারতে আশ্রয় নেন। *(বর্তমানে ভারতের অগ্নি উপাসকরা তাদেরই বংশধর)* বাদবাকি কুল কিনারা না পেয়ে ইসলামে দীক্ষিত হতে বাধ্য হয়। (পার্বতীচরণ চট্টোপাধ্যায়, পারস্য সাহিত্য পরিক্রমা, পৃ- ২)

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের প্রাথমিক ইসলামের ইতিহাসও প্রায় একই রকম। এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক। ইদানীং কিছু লেখক বলে থাকেন, হিন্দুরা ভারত থেকে বৌদ্ধদের তাড়িয়ে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকর বলেছেন, ইসলামের জন্ম হয়েছে 'বুত' বা 'বুদ্ধের' শত্রু হিসেবে। শুধু ভারতেই নয়, পৃথিবীর যেখানে যেখানে ইসলাম গেছে সেখানে সেখানেই তারা বৌদ্ধদের ধ্বংস করেছে। তাঁর ভাষায় —

"Islam came out as the enemy of the 'But'. The word 'But' as everybody knows is an Arabic word and means an idol. Not many people however know what the derivation of the word 'But' is. 'But' is the Arabic corruption of Buddha. Thus the origin of the word indicates that in the Moslem mind idol worship had come to be indentified with the religion of Buddha .... Islam destroyed Buddhism not only in India but wherever it went ". Dr Babasaheb B.R. Ambedkar's Writings and Speeches, Published by Govt. of Maharastra, Vol. 3, p- 229-230)

এবার মূল প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যাক। সমস্ত আরব জুড়ে ইহুদিদের অনেকগুলি গোষ্ঠী ছিল এবং তারা ছিল বিপুল ধন-সম্পদের অধিকারী। প্রথম যুগের মুসলমানরা এদের ধন সম্পত্তি আত্মসাৎ করেই শক্তিশালী হয়। কাইনুকা, নাজির, কুরাইজা, খায়বার এবং মুস্তালিক গোষ্ঠীকে উৎখাত করে বিপুল পরিমাণ সম্পদের অধিকারী হয় মুসলমানরা। নাজির গোষ্ঠীকে উৎখাত করে যে সম্পদ আসে তার সবটাই হযরত মুহাম্মদ নিয়ে নেন। কুরাইজা ধ্বংসের ফলে যে গণিমতের মাল পাওয়া যায় তার পরিমাণ ৪০,০০০ স্বর্ণমুদ্রা (দিনার)। এই ধন সম্পদ লুট করার কৌশলও আছে। হাদিস সহি মুসলিম-এর ৪৬৩ নং হাদিসে এরকম একটি বিবরণ আছে। এই হাদিসের বক্তা আবু হুরাইয়া বলেন, " While we were in the Mosque, the Prophet came out and said, "Let us go to the Jews." We went out till we reached Bait-ul-Midras. He said to them, "If you embrace Islam, you will be safe." অর্থাৎ পয়গম্বর ইহুদিদের মুসলমান হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, এইটেই জেহাদের খাঁটি ও সর্বোত্তম পদ্ধতি। হাদিস এরপর বলছে ইহুদিরা এই প্রস্তাবে রাজী হয়নি, তখন হযরত মুহাম্মদ বললেন, "You should know that the earth belongs to Allah and his Apostle and I want to expel you from this land. [Hadis No. 392 of Sahih Al Bukhari' Vol. IV.] অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্ত ধন সম্পত্তিই মুসলমানের হকের পাওনা। কেননা আল্লাহ ও তার রসুলই তার মালিক। আর এই হাদিস অনুসারেই যে কোন বিধর্মীর সম্পত্তি যে কোন মুসলমান কেড়ে নিতে পারে এবং গনিমতের মাল হিসেবে নির্দ্বিধায় ভোগ করতে পারে। এ হল হাদিসের কথা। দেখা যাক, এ ব্যাপারে কোরান কি বলে। ''সুরাতুল তওবায়' স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে, ''যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করে না ও পরকালেও না এবং সত্য ধর্ম অনুসরণ করে না তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ স্বহস্তে জিজিয়া কর দেয়। (কো-৯/২৯) পৌত্তলিকদের সঙ্গে মুসলমানদের সম্পর্ক কেমন হবে সে কথাও কোরানে আছে। মহান হজের দিনে আল্লাহ্‌ ও তার রসুলের পক্ষ হতে মানুষের প্রতি এ এক ঘোষণা যে, আল্লাহ্‌র সাথে পৌত্তলিকদের কোন সম্পর্ক নেই এবং রসুলের সঙ্গেও নয়, ইত্যাদি (কো-৯/১,২,৩) সেই সূত্রে পৌত্তলিকদের নির্বিচারে হত্যার আয়াতটিও নাজিল হয়। সুরাতুল তওবার (সুরা-৯) ৫নং আয়াতে লেখা আছে, ''নিষিদ্ধ মাস অতীত হলে পর

পৌত্তলিকদের যেখানে পাবে বধ করবে, বন্দী করবে এবং ঘাঁটি গেড়ে ওৎ পেতে থাকবে। কিন্তু তারা যদি তওবা করে এবং যথাযথ নামাজ পড়ে ও যাকাত দেয় তবে তাদের পথ ছেড়ে দেবে। (কো-৯/৫) "আল্লাহ্ বণি আরব বহুত্ববাদীদের ইসলাম গ্রহণ বা হত্যা ছাড়া অন্য কোন বিকল্প দেননি। যদি তারা ইসলাম গ্রহণে অসম্মতি জানায় তাহলে তাদের মুসলমানদের সাথে চুক্তি করার ও তাদের জিম্মি হওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে না। মুসলমানরা যদি তাদের আক্রমণ করে তাদের মহিলা ও শিশুদের বন্দী ও পুরুষদের যুদ্ধবন্দী করে তাহলে মেয়েরা ও শিশুরা অমুসলিমদের কাছ থেকে বিনা যুদ্ধে অর্জিত সম্পত্তির মত বিবেচিত হবে এবং তাদেরকে যুদ্ধলব্ধ মাল হিসাবে ভাগাভাগি করে নেওয়া যাবে। পুরুষদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করবে তারা হবে মুক্ত; কিন্তু যারা ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাবে তাদের হত্যা করতে হবে। (মজিদ খাদ্দুরী, মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন, পৃ- ২৩৮)

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, আল্লাহ্‌র নবী অমুসলিমদের দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—

(১) কিতাবধারী অর্থাৎ ইহুদি ও খৃষ্টান। এবং

(২) যাদের নিকট কিতাব অবতীর্ণ হয়নি অর্থাৎ পৌত্তলিক।

ভারত উপ-মহাদেশের হিন্দু, বৌদ্ধ এবং অন্যান্য সম্প্রদায় এই দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। হযরত মুহাম্মদ প্রথম শ্রেণী অর্থাৎ কিতাবধারীদের প্রতি কিছুটা নমনীয় ছিলেন। কারণ ঐ ধর্মগুলো সেমেটিক। এ কারণে এদেরকে জিজিয়া কর প্রদান করে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসের অনুমতি দেন। যদিও জিজিয়ার উদ্দেশ্যই ইসলামে টেনে আনা। অমুসলিমদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকম ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্য হলো চূড়ান্ত ধর্মীয় লক্ষ্য অর্জন; শত্রুদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস সাধন নয়। নিয়ম অনুসারে ভারতীয় সুলতানগণ ভারতবর্ষের অধিবাসীদের ইসলাম গ্রহণ বা হত্যা ছাড়া আর কোন পন্থা নির্ধারিণের হেতু নেই। যদিও হাদিসে ইমামের উপর এ ধরনের সিদ্ধান্তের ভার দেওয়া হয়েছে যে, অবস্থা বুঝে ইমাম যে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন সেইটিই ইসলাম মতে সঠিক বলে গণ্য হবে। তবে তাকে অবশ্যই চূড়ান্ত লক্ষ্যকে সামনে রেখে সিদ্ধান্ত দিতে হবে। সেই হাদিসটি হল, "আবু ইউসুফের মতে যুদ্ধবন্দীদের ভাগ্য নির্ধারিণ তথা মুসলমানদের স্বার্থে তাদের হত্যা করা অথবা মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দিতে হবে তা নির্ধারিণ করার ভার ইমামের উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত।" (আবু ইউসুফ, 'কিতাব আল রাদ', পৃষ্ঠা- ৮৮-৮৯) ভারতীয় সুলতানগণ কোরান ও হাদিসের নিয়মগুলো প্রয়োগ করতেন আলেম ও মাওলানাদের ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে। "সুলতান আলাউদ্দিন জ্ঞানীদের নিকট এমন একটি পন্থা বা নিয়ম জানতে চাইলেন যা দ্বারা হিন্দুদেরকে শায়েস্তা করা যায়। জ্ঞানীগণ পরামর্শ দিলেন, শুধু হিন্দুদের নিকট যেন এই পরিমাণ মাল দৌলত না থাকে যা দিয়ে তারা ভাল অস্ত্র কিনে, ভাল পোষাক পরে ও মনোমত ভোগ সম্ভোগ করে দিন কাটাতে পারে। ক্ষত্রিয়দের নিকট খেরাজের কোন অংশই মাফ করা হবে না।

এই হিসাব মতে ঘোড়ায় চড়া, তলোয়ার হাতে নেওয়া, ভাল কাপড় পরা, পান খাওয়া প্রভৃতি কাজ বন্ধ হয়ে গেল। বস্তুত হিন্দুদের ঘরে এমন কোন সোনা, চান্দি ও তঙ্কা অবশিষ্ট ছিল না যার বলে তারা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। এই প্রকার অসহায় অবস্থার ফলে হিন্দুর বাচ্চারা মুসলমানদের ঘরে চাকুরী করে দিন যাপন করতে বাধ্য হয়েছিল। (জিয়াউদ্দিন বারাউনী, 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী', পৃষ্ঠা-২৩৭) এখানে আমরা দেখছি যে, কোরানের বাণী 'হয় ইসলাম গ্রহণ নতুবা হত্যা' এই বিধান মানা হয়নি। কারণ, আলেম ও শাসনকর্তাগণ বুঝেছিলেন, এই ব্যবস্থা নিলে ভারতীয়রা বিদ্রোহ করতে পারে এবং তাহলে তাদের এদেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। তাই মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখে একটু কৌশলগতভাবে এগিয়েছিলেন। আমরা দেখছি, এই কৌশলগত এগোনোরও হাদিস আছে; আছে ঐতিহাসিক পটভূমি। ইসলামের ইতিহাসের পাঠক মাত্রই জানেন বদরের যুদ্ধই (৬২৪ খৃ.) বিশ্বজুড়ে ইসলামী জয় যাত্রার প্রথম স্তম্ভ। এই যুদ্ধে অনেক পৌত্তলিক কোরেশ বন্দী হলে হযরত মুহাম্মদের নিকট দু'টি প্রস্তাব আসে। আবু বকর প্রস্তাব করেছিলেন, এদের সকলকেই মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিতে হবে। অন্য একটি প্রস্তাব আসে হযরত ওমরের কাছ থেকে। তিনি সব পৌত্তলিককে সংহার করার প্রস্তাব দেন। হযরত মুহাম্মদ মধ্যাবস্থা অবলম্বন করেন। তিনি কিছু বন্দীকে হত্যা করেন ও বাকিদের মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেন। এখানে হযরত মুহাম্মদের উদ্দেশ্য ছিল বাকিদের ইসলাম ধর্মে টেনে নেওয়া এবং তাতে সফলকামও হয়েছিলেন। তাই এই আয়াতটিকে মুহাম্মদের জীবনের আলোকে মিলিয়ে নিলে এর অর্থ দাঁড়ায় এই রূপ —

(১) ইসলাম গ্রহণের সম্ভাবনা না থাকলে বন্দীদের ব্যাপকভাবে 'নিপাত' করতে হবে।

(২) অল্পাংশের কাছ থেকে নিতে হবে মুক্তিপণ। অবশ্য আবু বকর বাইজেনটাইন যুদ্ধের সময় মত পরিবর্তন করেন যা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি — "হয় মুসলমান হওয়া, না হয় হত্যা।"

যাই হোক, মুসলমান শাসকগণ আলেম ও ওলেমাগণের পরামর্শ মত ভারতীয় হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর আরোপ করেছিলেন। জিজিয়ার উদ্দেশ্য সম্পর্কে হিদাইয়া প্রণেতা শেখ বুরহানুদ্দিন বলেছেন, "কাফেরকে ইসলামে টেনে আনাই জিজিয়ার উদ্দেশ্য। তবে যদি কেউ মুসলমান হয়, তাহলে তার বকেয়া জিজিয়া মকুব করা হয়। হযরত মুহাম্মদ স্পষ্ট জানিয়েছেন, জিজিয়া মুসলমানের জন্য নয়। দ্বিতীয়ত: এটা কাফেরির জন্য এক প্রকার সাজা। সাজা বলেই এর নাম জিজিয়া, যার আক্ষরিক অর্থ আক্কেল সেলামী (Retribution) । এ জন্য ইসলামে দীক্ষিত হলে পর তার সাজা মকুব করতে হয়।

৬২৮ খৃষ্টাব্দে খায়বার বিজয়ের পর প্রথম ইসলামী রাষ্ট্রের দ্বারা বিধর্মীদের উপর কর বসানোর দৃষ্টান্ত দেখা যায়। হযরত মুহাম্মদ প্রথমে খায়বারের ইহুদিদের

জমি জমা কেড়ে নেন। তারপর সেগুলি ফেরত দিয়ে ব্যবস্থা করেন যে, খায়বারের ইহুদিরা ফসলের আধা-আধি তাঁকে কর হিসেবে প্রদান করবে। সম্রাট আলাউদ্দিনও ভারতবর্ষের হিন্দুদের উপর এই হারে কর আরোপ করেছিলেন। এই কর আদায়ের ব্যাপারে "সুলতান কাজী মুগিসকে প্রথমে যে প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করলেন তা হল এই যে, হিন্দুদের নিকট হতে খেরাজ লওয়ার ব্যাপারে শরিয়তে কিরূপ নির্দেশ আছে এবং তারা কিরূপে এই খেরাজ আদায় করবে? কাজী বললেন, "শরিয়তে আছে, যখন দেওয়ানের তহশিলদার তাদের নিকট খেরাজ চাইবে, তৎক্ষণাৎ তারা বিনা দ্বিধায় অত্যন্ত তাজিমের সাথে তা দিয়ে দেবে। যদি কোন কারণে তহশিলদার তাদের মুখে থুথুও দেয়, তবে তা তাদের প্রাপ্য বলে গ্রহণ করবে এবং আরো বেশী করে তহশিলদারের খেদমত করতে থাকবে। এই প্রকার তাজিম তোয়াজ ও থুথু গিলে ফেলবার তাৎপর্য এই যে, জিম্মিরা সর্বদাই অসম্মানের মধ্যে থাকবে। কারণ, এর মধ্য দিয়ে সত্য ধর্ম ইসলামের সম্মান ও মিথ্যা ধর্মের অসম্মান প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। আল্লাহ্‌তালা এদেরকে অসম্মানকর অবস্থার মধ্যে রাখা ধার্মিকতার অংশ বলে গণ্য করেন। কারণ এরা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফার ধর্মের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক শত্রু। এজন্য হযরত এদেরকে হত্যা করা, এদের ধন সম্পত্তি লুঠ করা এবং এদেরকে দাসদাসী হিসেবে গ্রহণ করবার আদেশ দিয়েছেন। আমরা যে ইমামের মাযহাব মেনে চলি সেই ইমাম আযম আবু হানিফাই শুধু এদেরকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা অথবা এদেরকে মেরে কেটে ধন সম্পত্তি লুঠ করে দাস-দাসী হিসেবে গ্রহণ করবার কথা বলেছেন। অন্যান্য ইমাম ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা এদের জন্য দুটি পন্থা নির্দেশ করেছেন — হয় এরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে নতুবা এদেরকে হত্যা করতে হবে"। (জিয়াউদ্দিন বারাউনী, তারিখ-ই-ফিরোজশাহী, পৃ- ২৩৯ এবং ড. আম্বেদকরের ইংরেজী রচনাবলী, ৮ম খণ্ড, পৃ- ৬৩)

হিন্দুদের এইরূপ দুরবস্থার মধ্যে ফেলার উদ্দেশ্য এই যে, যাতে তারা এই দুরবস্থা সহ্য করতে না পেরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। জিয়াউদ্দিন বারাউনী বলেন, "যতদিন হিন্দুরা নিঃস্ব ও অসহায় না হবে ততদিন তারা মুসলমানের আনুগত্য স্বীকার করতে রাজী হবে না। এজন্য আমি হুকুম দিয়েছি যে, এদের নিকট এই পরিমাণ জমি ও সম্পদ রাখা উচিত যাতে তারা কৃষিকাজ করে কোন প্রকারে বছরের আয় দ্বারা সংসার চালাতে পারে। কোন প্রকার বাড়তি সঞ্চয় যেন তাদের ভাগ্যে না জোটে। (ঐ) এতে যে আশাতীত ফললাভ হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। সমসাময়িক পর্তুগীজ বারবোসার সাক্ষ্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি লিখেছেন যে, বাংলার রাজার অধীনে "পৌত্তলিক (হিন্দু) অধ্যুষিত এক বিরাট অঞ্চল ছিল। তাদের (হিন্দুদের) মধ্যে প্রত্যেক দিন বহুলোক রাজা ও শাসনকর্তাদের আনুকুল্য অর্জনের জন্য মুসলমান হয়ে যেত। (শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়ের 'বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল, পৃ- ৪২১-২২) রুশ ইতিহাসবিদ গ্রেগরী কত্রেভস্কিও লিখেছেন, "দিল্লীর সুলতানশাহীর আমলে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্মে পরিণত করা হয়; যদিও অধিকাংশ প্রজা ছিল হিন্দু।

রাষ্ট্রের শাসনকর্তা আমির ওমরাহ্‌রা জোর জবরদস্তি করে তা হিন্দুদের উপর চাপিয়ে দিতেন। হিন্দু অধিবাসীদের বিভিন্ন অংশ এই নুতন ধর্মে দীক্ষিত হয়। তার মধ্যে একটি অংশ বল প্রয়োগের ফলে বাধ্য হয়ে আর অন্যেরা নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা পাবার আশায়। কেননা একমাত্র মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের পক্ষেই সম্ভব ছিল তখন রাজ সরকারে উচ্চ পদ পাওয়া। এছাড়া তৃতীয় একটি অংশ এই পথ অবলম্বন করে অমুসলিমদের উপর মাথা পিছু ধার্য্য কর বা জিজিয়া এড়িয়ে যাবার আশায় (গ্রেগরী কতোভস্কি, ভারতবর্ষের ইতিহাস, পৃ- ৩৪০)। বিধর্মী যতক্ষণ ইসলাম গ্রহণ না করবে ততক্ষণ তাকে নানা ভাবে নির্যাতন করা মুসলমানের পরম কর্তব্য এবং ধার্মিকতার কাজ বলে গণ্য। একজন মুসলমানের জন্য নামাজ রোজা হজ যাকাত পালন অবশ্য কর্তব্য। তবে ওলেমা ও জ্ঞানীগণ বলেন, যদি এগুলো পালন না করে শুধু মাত্র হিন্দু বিধর্মী নির্যাতন করে তবে তিনি ইসলাম ধর্ম মতে যথার্থ ধার্মিক। এ প্রসঙ্গে মওলানা শামসউদ্দীন তুর্ক নামে এক অদ্বিতীয় আলেম বলেন, "পথের মধ্যে শুনতে পেলাম যে সুলতান নামাজ পড়েন না ও জুম্মার নামাজে উপস্থিত থাকেন না। এর ফলে আমি ফিরে এসেছি। অবশ্য সুলতানের ব্যাপারে এমন অনেক কথা শুনেছি, যা একমাত্র ধার্মিক বাদশাহদের মধ্যে পাওয়া যায়। ধার্মিকতার কথা যা শুনেছি তা এই যে, সুলতান হিন্দুদের অতিশয় দুরবস্থার মধ্যে রেখেছেন। এমনকি তাদের পুত্র পরিজন মুসলমানের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়ায়। ইহা যথার্থ ধার্মিকতার কাজ। ইসলামের এই সম্মান ও ধর্মকে এইভাবে উচ্চে তুলে ধরার জন্য সুলতানের প্রশংসা না করে পারা যায় না। হে সুলতান! আপনি যেভাবে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফার ধর্মকে সম্মান দান করেছেন, এই একটি কাজের জন্য আপনার পর্বত প্রমাণ পাপও মার্জনা হতে পারে। যদি তা না হয় তবে কেয়ামতের দিনে আপনি আমার জামা যেন ছিঁড়ে ফেলেন। (জিয়াউদ্দিন বারাউনীর 'তারিখ-ই-ফিরোজ-শাহী', পৃ-২৩৯)

বিভিন্ন ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যাচ্ছে ইসলামী মতে ছলে বলে কলে কৌশলে যে কোন উপায়েই হোক নিজ ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা বাড়াতে হবে। ভিন্ন ধর্মাবলম্বী তো বটেই, যদি দস্যুও ইসলামে দীক্ষিত হয় তবে তাকে মুক্তি দিতে হবে এমন নজির রয়েছে। ১৬৩২ সালে মুঘল বাহিনী চার হাজার পতুর্গীজ দস্যুকে বন্দী করে এদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়; অন্যান্যদের হত্যা করা হয়। (কোকা আন্তোনভার 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', পৃ-৩৪৩) কিছুদিন আগে একটি পত্রিকায় বেড়িয়েছিল আমেরিকার কারাগার গুলিতে অপরাধীরা ব্যাপক ভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ইসলামের সঙ্গে অপরাধ প্রবণতার যোগসূত্র আছে বলেই সম্ভবতঃ এমনটি হয়।

আলাউদ্দিন রচিত সিকান্দার নামায় আমরা দেখি, "বাবল দেশ দখল করে সেখানেও অগ্নি উপাসনা, মন্দির ছারখার করে সেখানে দীন-ই-ইসলাম জারি করলেন। সিকান্দার নবী, কাজেই বল প্রয়োগে বিধর্মীদের স্বধর্মে দীক্ষিত করা ছিল তার পবিত্র

দায়িত্ব ও কর্তব্য। সিকান্দার কোন দেশ আক্রমণের পূর্বে ছদ্মবেশে সৈন্য পাঠিয়ে সেদেশের খাদ্য বস্ত্র স্বর্ণ চড়া দামে ক্রয় করিয়ে আনতেন। তারপর দুর্ভিক্ষ পীড়িত দরিদ্র দেশ সহজে জয় করতেন .... সিকান্দারের আদেশে সে রাজ্যের সবাই "মুসলমানী দ্বীন পুজে রুমীর নিয়মে ...... এরপর গিলান, খোরাসান, নিশাপুর প্রভৃতি দেশ জয় করে এবং অগ্নি উপাসনা নিষিদ্ধ করে হির্বাদে গেলেন, সেখানেও দ্বীন-ই-ইসলাম জারি করলেন। (পৃ- ১২-১৩)

ইসলামের কাছে অমুসলিমের ক্ষমা নেই। দুঃসময়ে সে যত প্রকার উপকার করুক না কেন। প্রকৃত ধার্মিক তিনি যিনি ইসলামের জন্য সব কিছু করতে পারেন। তাতে তিনি উপকারীর উপকার অস্বীকার করলেও তিনি ধার্মিক। ফেরেস্তা মতে হরে কৃষ্ণ রায় নামে এক রাজা রোহতাস নামে এক দুর্গের অধিপতি ছিলেন। তিনি একবার শের খাঁর দুঃসময়ে তার ভ্রাতা নিযাম খাঁ ও তার পরিবারবর্গকে রোহতাস দূর্গে আশ্রয় ভিক্ষা করলে রাজা সম্মত হন এবং দ্বিতীয়বার আশ্রয় ভিক্ষা করলে চূড়ামন নামক এক ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর অনুরোধে দ্বিতীয়বার তার আশ্রয় মঞ্জুর করেন। শের খাঁ শিবিকায় পরিবার বর্গের পরিবর্তে আফগান যোদ্ধাগণকে প্রেরণ করে অল্পায়াসে রোহতাস দূর্গ অধিকার করেছিলেন। (রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাস, পৃ- ১৮৬) প্রায়ে অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়েছিলেন সুলতান হোসেন শাহ।। তিনি কামতাপুর আক্রমণ করে কিছু করতে না পেরে কামতাপুরের অধিপতি নিলাম্বরকে বলে পাঠিয়েছিলেন যে, তাঁহার পত্নী নিলাম্বরের পত্নীর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন এবং বোরখা পরিয়ে মুসলমান সেনা শিবিকায় কামতাপুর প্রবেশ করে নগর অধিকার করে এবং নিলাম্বরকে বন্দী করা হয়। (ঐ, পৃ- ১৩৮) মধ্য যুগের যে সম্রাটকে আমরা উদার বলে জানি সেই হোসেন শাহ্ ও তার বাল্যকালের আশ্রয়দাতা ও শিক্ষাদাতা মনিব যাকে তিনি সম্রাট হবার পর গো-মাংস খেতে বাধ্য করে তার জাতি নষ্ট করেন। ব্রাহ্মণ আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু চৈতন্যদেবের কথায় আত্মহত্যা থেকে বিরত হন। পরবর্তীতে তার অন্য মনিব সুবুদ্ধি রায়কেও বদনার জল মুখে দিয়ে, তার জাতি নষ্ট করেন। (শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দুশো বছরঃ স্বাধীন সুলতানদের আমল, পৃষ্ঠা- ২৮১-২৮২) ওই হোসেন শাহ্ সম্পর্কে চৈতন্য ভাগবতের অন্ত খণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে বৃন্দাবন দাস লিখেছেন —

"হুসেন শাহ সর্ব উড়িয়ার দেশে, দেব মূর্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষে।
.... স্বভাবতই রাজা মহা কাল যমন, মহা তমো গুণ বুদ্ধি জন্মে ঘনঘন।
উদ্র দেশে কোটি কোটি প্রতিম প্রসাদ, ভাঙিলেক কত কত করিল প্রমাদ।"

হোসেন শাহ্ অথবা তার পুত্র নুসরত শাহের রাজত্ব কালের একটি ঘটনা থেকে জানতে পারি বাংলার সুলতানের মুসলমান উজিরেরা কিভাবে কথায় কথায় হিন্দু ধর্ম নষ্ট করতেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন, রাজকর বাকি পড়ার জন্য বেনাপোলের রাজা রামচন্দ্র খাঁনকে বন্দী করে এবং তার বাড়ী-ঘর লুঠ করেও উজিরের তৃপ্তি হল

না, তিনি হতভাগ্য রামচন্দ্রের দূর্গা মণ্ডপে গরু কেটে তার মাংস তিন দিন ধরে রন্ধন করে তবে ক্ষ্যান্ত হলেন। (ঐ, পৃ- ২২৪) শুধু উজির বা রাজ কর্মচারীরা নয়, অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মুসলমানরাও হোসেন শাহের রাজত্বকালে হিন্দুদের উপর অনেক জুলুম করতেন। বিপ্রদাস পিপলাইয়ের মনসা মঙ্গলের চতুর্থ পালায় বিপ্রদাস তৎকালীন মুসলমানদের সম্পর্কে লিখেছেন, —

"কেহবা জুলুম করে কেহ গুনা শিরে ধরে
বজু করি করয়ে নেছাব
যতেক সৈয়দ মোল্লা জপয়ে তো বিসমিল্লা
সদা মুখে কলিমা কেতাব।।
হিন্দুত কলিমা দিল মুছলমানী শিখাইল
তথা বৈসে যত মুসলমান।"

কোথাও হরি সংকীর্তন হলে হোসেন শাহ স্থানীয় কাজীকে শাস্তি দিতেন। জনৈক মুসলমান নবদ্বীপের কাজীকে বলেছিল, —

"হরি হরি করে হিন্দু করে কোলাহল, পাৎসা শুনিলে তোমায় করিবেক ফল।"

সুতরাং হোসেন শাহ ধর্ম বিষয়ে উদার ও হিন্দু মুসলমানে সমদর্শী ছিলেন একথা ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ মাত্র।

অধিকাংশ ঐতিহাসিক আওরঙ্গজেবকে ধর্মান্ধ মুসলমান বলে নিন্দা করেছেন। কিন্তু মূলতঃ তিনিই ছিলেন প্রকৃত ধার্মিক মুসলমান। তিনি ঠাণ্ডা মাথার ও হিসেবী মুসলমান ছিলেন। দারাশিকোর বিরুদ্ধে তার বিজয় সূচিত করেছিল এমন এক রাষ্ট্রনীতির; যার মুল কথা ছিল হিন্দুদের সকল অধিকার হরণ করা। .... ১৬৬৫ থেকে ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি হুকুম দিলেন সমস্ত হিন্দু মন্দিরগুলোকে ভেঙে ফেলতে ও সেগুলির ধ্বংসস্তুপের উপর মসজিদ বানাতে। হিন্দুদের পক্ষে মর্যাদাসূচক কোন চিহ্ন ধারণ করা, হাতির পিঠে চড়া ইত্যাদি নিষিদ্ধ হয়ে গেল ......সবচেয়ে গুরুতর বোঝা স্বরূপ ছিল অমুসলিমদের উপর চাপানো মাথাপিছু কর বা জিজিয়া। (কোকা আন্তোনোভা, ভারতবর্ষের ইতিহাস, পৃ- ৩৫১) কিন্তু আওরঙ্গজেবের জিজিয়া সপ্তদশ শতাব্দীর হিন্দুর উপর পূর্ব যুগের চেয়ে অনেক হালকা ছিল। এরপরও স্যার যদুনাথ সরকার হিসেব করে দেখিয়েছেন আওরঙ্গজেবের সবচেয়ে দরিদ্র হিন্দুকেও এক বছরের খাদ্য শস্যের সমপরিমাণ 'মাথট' দিতে হতো। যদুনাথবাবুর ভাষায়— "In violation of modern canons of taxation, the Jiziya hit the poorest portion of the population hardest.") ফলে আওরঙ্গজেবের হিন্দু প্রজারা দলে দলে মুসলমান হতে বাধ্য হয়। যদুনাথ বলেন "The officially avowed policy in reimposing the jiziya Was to increase the number of Muslims by putting pressure on the Hindus. As the contemporary observer Manucci noticed : Many Hin-dus who were unable to pay turned Muhammaden to obtain relief from

the insults of the collectors. Aurangzeb rejoiced that by such taxations this will be forced in embracing the Muhammadan faith." অনেক আধুনিক লেখক জিজিয়াকে অমুসলমানদের নিরাপত্তার কর বলে উল্লেখ করেন এবং তারা এতে অসম্মানকর কিছু দেখেন না। কিন্তু ইসলামী শাস্ত্র মতে অবিশ্বাসী কর্তৃক জিজিয়া (ব্যক্তির উপর ধার্য কর) প্রদান অবমাননাকর এই ধারণা কুরানের নির্দেশের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। ''কিতাবীদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ আখিরাতে ঈমান আনে না ...... তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না তারা নতি স্বীকার করে জিজিয়া দেয়।'' (কো-৯/২৯ এবং সারাকসী মবসুত, ভলিউম-১০, পৃ-৭৭, ৭৮, ৮২-৮৩)

জিজিয়া সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে। এরপরও কিছু বলতে হবে। হিদাইয়া প্রণেতা শেখ বুরহানুদ্দিন বলেছেন, ''কাফেরকে ইসলামে টেনে আনাই জিজিয়ার উদ্দেশ্য।'' জিজিয়ার হার লক্ষ্য করলে এই সংজ্ঞাই সঠিক বলে প্রতিপন্ন হয়। হযরত মুহাম্মদ জিজিয়ার কোন নির্দিষ্ট হার নির্ধারণ করেন নাই। কোন গোষ্ঠীর উপর বেশী, কোন গোষ্ঠীর উপর কম যখন যেটা সুবিধা সেটাই আদায় করা হত। যেমন আইলা নামক স্থানের খ্রীষ্টানদের উপর জনপ্রতি একটি স্বর্ণ মুদ্রা (দিনার) কর ধার্য্য করা হয়। ৬৩১ খ্রীষ্টাব্দে নজরনের খৃষ্টানদের উপর চাপানো হয় প্রতি ছয় মাসে ১০০০ পোশাক এবং প্রতিটি পোশাকের মূল্য হতে হবে এক আউন্স রূপো। সেই সঙ্গে যুদ্ধের জন্য তিরিশটি লৌহ জালিকা, তিরিশটি ঘোড়া এবং তিরিশটি উট পাঠাতে বাধ্য ছিল। ভারতবর্ষে সম্রাট আলাউদ্দিনও ফসলের অর্ধেক কর ধার্য্য করলে হিন্দু প্রজারা দলে দলে বনে জঙ্গলে পালিয়ে যেতে থাকে। খলিফা ওমর এই কর হারকে সুনির্দিষ্ট করার জন্য ক্রমবর্ধমান মুসলিম সাম্রাজ্যের বিধর্মীদের তিন ভাগে বিভক্ত করেন— সম্ভ্রান্ত, মধ্যবিত্ত ও গরীব। এই তিন শ্রেণীর বার্ষিক মাথাপিছু কর ধার্য্য করা হয় যথাক্রমে ৪৮ দিরহাম, ২৪ দিরহাম এবং ১২ দিরহাম। হাজার বছর পরে আও-রঙ্গজেব এই হারেই হিন্দুদের উপর কর ধার্য্য করলেন। আমরা জানি শায়েস্তা খানের আমলে টাকায় আট মন চাউল পাওয়া যেত। এক দিরহামে যদি চার মন চাউলও পাওয়া যায় এবং একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে যদি ১২ জন লোক থাকে তাহলেও ২৪ x ৪ X ১২ = ১১৫২ মন চাউলের সমপরিমাণ অর্থ জিজিয়া কর হিসেবে প্রতি বছর একজন মধ্যবিত্ত হিন্দুকে পরিশোধ করতে হতো। যদুনাথ বলেছেন, একজন গরীব হিন্দুকেও এক বছরের খাদ্যশস্য কর হিসেবে দিতে হতো। যদি আওরঙ্গজেবের আমলে জিজিয়া কর না দিতে পেরে দলে দলে লোক মুসলমান হতে বাধ্য হয়; তাহলে এক হাজার বছর পূর্বে যখন এই কর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা হয় তখনকার অবস্থা কেমন ছিল? কারণ এই এক হাজার বছরে দিরহাম বা টাকার বিনিময় হার অপরিবর্তিত ছিল তা অবিশ্বাস্য এবং হাজার বছরের মধ্যে দিরহামের ক্রয় ক্ষমতা বদলায়নি সেকথা আরও অবিশ্বাস্য। অর্থাৎ ''কাফেরকে ইসলামে টেনে আনাই জিজিয়ার উদ্দেশ্য''— এটিই সঠিক। এ নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই।

আগেই বলেছি আওরঙ্গজেব ছিলেন পরম ধার্মিক মুসলমান। তিনি যে মন্দির ভেঙে মসজিদ করতে বলেছিলেন, তা ইসলাম ধর্ম পালনের একটি অংশ এবং হযরত মুহাম্মদের একটি অবশ্য পালনীয় সুন্না। দ্বিতীয়ত: তিনি পিতা ও অন্যান্য ভাইদের ও দারাশিকোকে হত্যা করেছিলেন তাও ইসলাম ধর্মসম্মত ভাবেই করেছিলেন। এ বিষয়ে হাদিস বলছে। একজন মুসলমান তার অবিশ্বাসী পিতা, দাদা, ভাই, পিতৃকুল বা মাতৃকুল এক চাচাকে হত্যা করলে তা বৈধ হবে এবং সে তাদের উত্তরাধিকারী হবে। (মসিজদ খাদ্দুরী, ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন, পৃষ্ঠা- ২৫৭-২৫৮, শাফেরী উম, ভলিউম-৪, পৃষ্ঠা-১৪১ এবং সারাকসী মবসুত ভলিউম-১০, পৃষ্ঠা- ১৩২)

দারাশিকোর হিন্দু উপনিষদ চর্চা দেখে আওরঙ্গজেব ধরে নিয়েছিলেন সে অবিশ্বাসী হয়ে গেছে এবং তার অন্যান্য ভাই ও পিতা ইসলামী অনুশাসন মতে রাজ্য শাসক করছিলেন না। তাই তাদের বন্দী করেছিলেন। তৃতীয়ত: হিন্দুদের দুরবস্থায় ফেলা এটাও ধর্মীয় কর্তব্য। এভাবেই কাফেরদেরকে সত্য ধর্ম ইসলামে দীক্ষিত করতে হবে। এজন্য পরকালেও পাওয়া যাবে সর্বোচ্চ বেহেশত 'জান্নাতুল ফেরদৌস'। অবশ্য কোন মুসলমান জান্নাতুল ফেরদৌসে যেতে পারে না; যতক্ষণ না সে জেহাদে অংশ গ্রহণ করে। জেহাদই যে মুসলিম জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য; এ কথা হাদিসে বহুবার বলা হয়েছে। সহী মুসলিমে বলা হয়েছে - "আবু হুরায়রা বলেন, রসুলুল্লাহ বলেছেন, যে ব্যক্তি জিহাদ না করে কিংবা জিহাদের নিয়্যত বা সংকল্প না রেখে মৃত্যুবরণ করে, তার মৃত্যু হল এক প্রকার মুনাফিকের। (মিসকাতুল মাসাবিতের ৪৫১ নং হাদিস)

জিহাদ কি? জিহাদ হল দার-উল-হারবকে দার-উল-ইসলামে রূপান্তরিত করার উপায়। ইসলামী জগতে জিহাদ হলো ইসলামী সত্য বা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ। সব বিশ্বাসীর উপর আল্লাহর আদেশ "যেখানে বহুদেববাদীদের পাও, তাদের হত্যা কর। এবং মহানবীর বাণী হল 'আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই'— একথা না বলা পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধ কর। ইসলামী আইন তত্ত্ব অনুযায়ী দার-উল-হারবের উপর দার-উল-ইসলামের বিজয় না হওয়া পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করে, সেই মতে দার-উল-হারব বিলুপ্ত হলেই যুদ্ধাবস্থার বিলুপ্তি ঘটবে (সহীহ বুখারী ভলিউম-১, পৃ- ১১১; মজিদ খাদ্দুরী, ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন, পৃ—১৭)

হিদাইয়া গ্রন্থে জিহাদ সম্পর্কে বলা হয়েছে, "Jihad is established as a divine ordinance by the word of God who has said in the Koran, 'slay the infidel" and also by a saying of the Prophet 'war is permanently established until the day of the judgment"

দেখা যাক জিহাদ সম্পর্কে কোরানে কি বলা হয়েছে। তলিয়ে দেখলে দেখা যায় কোরানের অষ্টম সুরা 'সুরাতুল আনফাল' এবং নবম সুরা 'সুরাতুল তওবা'-ই যথার্থ জেহাদী সুরা। এ ব্যাপারে সবচেয়ে অর্থপূর্ণ আয়াত অষ্টম ও দ্বিতীয় সুরার একটি আয়াত — "Make war on them until idolatry is no more and Allah's

religion reigns Supreme." (Koran-8/39, 2/193) অর্থাৎ পৃথিবী থেকে পৌত্তলিকদের উৎখাত করে সারা বিশ্বে আল্লাহর ধর্ম প্রতিষ্ঠা করাই মুসলমানের পরম কর্তব্য। এটাই আল্লাহর পথে শ্রেষ্ঠ কর্মোদ্যম। এটাই আদি ও অকৃত্রিম 'জিহাদ ফি সবিলুল্লাহ'। জিহাদের পারলৌকিক ফল হচ্ছে 'জান্নাত উল ফেরদৌস' এবং ইহলোকে ফল হল 'ইসলামের প্রসার, জিজিয়া এবং গণীমা বা লুঠ করা সম্পত্তির প্রাপ্তি যোগ'।

আধুনিক অনেক পণ্ডিত বলেন যে, মুসলমানের সঙ্গে বিধর্মীদের সংঘর্ষ শুরু হলে বা ইসলাম বিপন্ন হলে ইসলামে 'জিহাদ' করা কর্তব্য। কথাটি ঠিক নয়। শাফেয়ী অনেক পূর্বেই বলে গেছেন যে, শুধুমাত্র ইসলামের সাথে সংঘর্ষে উপনীত হওয়ার পর নয়, বিশ্বাস স্থাপন (ইসলামে) না করার জন্য অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করাই জিহাদের উদ্দেশ্য।" (শাফেয়ী, উম, ভলিউম-৪, পৃ- ৮৪-৮৪; মজিদ খাদ্দুরী, মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন, পৃ-৬৩)

পবিত্র কোরানের সুরাতুল তওবা'-র ১৯, ২০, ২১, ২২ নং আয়াতে শান্তিবাদী মুসলমানের সঙ্গে জিহাদী মুসলমানের একটা তুলনা করা হয়েছে। "যারা হাজীদের পানি সরবরাহ করে এবং মসজিদুল হারেমের (পবিত্র কাবার) রক্ষণাবেক্ষণ করে, তোমরা কি তাদের ওদের সমকক্ষ মনে কর; যারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে? আল্লাহর নিকট ওরা সমতুল্য নয়। যারা বিশ্বাস করে তারা আল্লাহর নিকট মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ। (সেই সঙ্গে যারা) ধর্মের জন্য গৃহত্যাগ করে, এবং সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে তারাই তো সফলকাম। তাদের প্রতিপালক তাদের নিজ দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের সংবাদ দিচ্ছেন যেখানে তাদের জন্য স্থায়ী সুখ সমৃদ্ধি রয়েছে, সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী। নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট আছে মহা পুরস্কার। (কো ৯/১৯-২২)

হাদিস মতে হযরত মুহাম্মদ তাঁর দশ বছর মদিনাবাসের মধ্যে ৮২ বার জিহাদ করেছিলেন। তার মধ্যে ২৬-টাতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি নিজে। এই ২৬-টা জেহাদকে বলে গাজোয়াৎ অর্থাৎ এই ২৬ বারই নবীজী গাজী হয়েছিলেন। গাজী মানে কাফেরের বিরুদ্ধে হামলায় জয়ী বা কাফের হত্যাকারী। হাদিসে এও দেখা যায় এই 'গাজোয়াৎ' গুলির মধ্যে বেশীর ভাগই ছিল হানাদারী অর্থাৎ শত্রুকে নোটিশ না দিয়ে আক্রমণ। এই সমস্ত হানাদারীতে নবীজি যে বিপুল পরিমার ধন সম্পত্তি ও বন্দীদের জান মালের অধিকারী হয়েছিলেন তার বিবরণ হাদিসেই আছে।

ইসলামের সঙ্গে শান্তির বিরোধ চিরস্থায়ী। অমুসলিমের সঙ্গে মুসলিমের শান্তিচুক্তি যুদ্ধাবস্থাকে রহিত করে না। কারণ আইনে নির্ধারিত কর্তব্য হলো জেহাদ। মুসলিম রাষ্ট্র যদি কোন কারণে অমুসলিম রাষ্ট্রের সাথে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তবে যে চুক্তি অবশ্যই স্বল্পস্থায়ী হবে। কারণ ইসলামী আইন অনুসারে দার-উল-হারব-র মর্যাদার স্বীকৃতির কোন ইঙ্গিত নেই। (এ, আবেল; দার-উল-ইসলাম, দেখুন: এনসাইক্লোপিডিয়া অব

ইসলাম ও মজীদ খাদ্দুরী, মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন)

ইসলামে নিরপেক্ষ থাকার কোন সুযোগ নেই। এ বিষয়ে পবিত্র কোরান বলেছে, "অবশ্য অপর কতক লোক এমনও পাবে যারা তোমাদের নিকট থেকে নিরাপদ হতে চায়, আর নিজেদের লোক হতেও নিরাপদ হতে চায় ..... তবে তাদের যেখানে পাও কোতল কর।' ইসলামী ধারণায় "শান্তি" হল পৃথিবীর সমস্ত লোককে যে কোন ভাবেই হোক ইসলামে দীক্ষিত করাতে পারলেই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। পৃথিবীতে অমুসলমান শাসিত এলাকা যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ শান্তি এখানে প্রতিষ্ঠিত হবে না। আর তাই পৃথিবীর সমস্ত লোককে ইসলামে দীক্ষিত করার চেষ্টা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয অর্থাৎ অবশ্য কর্তব্য। আর এ জন্যই ইসলাম প্রত্যেক মুসলমানকে জেহাদে অংশ গ্রহণ করতে বলেছে। আগেই একাধিকবার বলা হয়েছে জেহাদই মুসলমানের সর্বোত্তম কর্তব্য। যাদের পক্ষে জেহাদে যোগ দেওয়া অসম্ভব তারা যেন অন্ততঃ মনে মনে বিধর্মী সংহারের সংকল্প রাখে। তা না হলে তারা মুনাফিকের পর্যায়ভুক্ত হবে। এককথায় হাদিস কোরানের চেয়েও জোর গলায় জানিয়েছে 'শান্তিবাদী মুসলমান মুসলমানই নয়।' এই হাদিসের অর্থ বুঝতে হলে আগে 'মুনাফিক' শব্দটার তাৎপর্য বোঝা দরকার। মুনাফিকশব্দটার অর্থ হচ্ছে ভণ্ড বা প্রতারক। কোরানে এ শব্দ কাফের (= বিধর্মী) এবং মুশরিক (= পৌত্তলিক)-এর চেয়েও ঘৃণা বাচক শব্দ। এর লক্ষ্য হচ্ছে মদিনার সেই সমস্ত লোক যারা পয়গম্বর ও তাঁর অনুগামীদের আশ্রয় দিয়ে ইসলামের রক্তাক্ত মূর্তি প্রকাশ পাওয়ার পর অন্তরে অন্তরে বীতশ্রদ্ধ হয়েছিল; কিন্তু প্রকাশ্যে বিদ্রোহের সাহস করেনি। এই শ্রেণীর মদিনাবাসীদের নেতা ছিলেন আব্দুল্লা ইবন উবাই। কোরান এই মানুষটির এবং তার অনুগামীদের সম্বন্ধে কঠোর বিদ্রূপ ও অভিশাপের বাণী প্রচার করেছে। হাদিস জানিয়েছে এদের স্থান নরকের সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্তরে। এমনকি পৌত্তলিকদের স্থানও এর এক ধাপ উঁচুতে।

আপনারা আগেই জেনেছেন, ইসলামের সঙ্গে শান্তির বিরোধ সর্বাঙ্গীণ। শান্তিবাদী ধর্মের প্রতি হযরত মুহাম্মদের কঠোর অবজ্ঞা একটা হাদিসে তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে। "হযরত আবু উমামা বলেন, একদা আমরা রসুলুল্লার সঙ্গে এক যুদ্ধ অভিযানে বাহির হইলাম। এমন সময় আমাদের একজন লোক একটি পানির কূপ ও কিছু সবুজ তরকারী বিশিষ্ট স্থান দিয়া অতিক্রম করিল। উক্ত স্থানটি দেখিয়া তাহার অন্তরে এক আকাঙ্খা জন্মিল যে, যদি আমরা দুনিয়ার মোহ মায়া ত্যাগ করিয়া এই স্থানে বসবাস করিতে পারিতাম, তাহা হইলে কতই না উত্তম হইত। সুতরাং সে রসুলুল্লার অনুমতি চাহিল। উত্তরে হুজুর বলিলেন, 'আমাকে ইহুদি কিংবা খৃষ্টান ধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য পাঠানো হয় নাই। (শুনিয়া লও) এক সকাল কিংবা এক বিকাল আল্লাহর রাস্তায় নিয়োজিত রাখাটা গোটা দুনিয়া এবং তাহার মধ্যে যাহা কিছু আছে, সেই সমস্ত জিনিস হইতে উত্তম। আর যুদ্ধের ময়দানে বন্দী হওয়া ষাট বছর নফল নামাজ পড়ার চেয়ে উত্তম।" (মিসকাতুল মাসাবিহ, ৪৫৪৬ নং হাদিস) এই হাদিস থেকে বোঝা যায়,

নবীর চোখে ইহুদি ও খৃষ্টান ধর্মের আংশিক শান্তিবাদও গ্রাহ্য হয়নি। সে যুগে খৃষ্টানরাও প্রধানত তরবারি দিয়েই ধর্ম প্রচার করতো। তবে তত্ত্বগত ভাবে কিছু কিছু শান্তির কথাও বলত। কিন্তু আমাদের পয়গম্বর তাদের ঐ তাত্ত্বিক শান্তি প্রচারকেও এতটুকু সমর্থন জানাতে প্রস্তুত ছিলেন না।

আধুনিক যুগে যে সমস্ত মুসলমান শান্তিবাদ প্রচার করেন তাঁরা ইসলামের চোখে খাঁটি মুসলমান নন। এমনকি এই শান্তিবাদীদের থেকে জিহাদী মুসলমান আল্লাহর বেশী প্রিয়, সে কথাও হাদিসে আছে। "রসুলুল্লাহ্ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে প্রতিপালক হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে এবং মুহাম্মদকে রসুল হিসাবে সন্তুষ্ট চিত্তে মানিয়া লয়, তাহার জন্য জান্নাত অবধারিত ..... (কিন্তু) এতদ্ভিন্ন আরও একটি বস্তু আছে যাহার দ্বারা আল্লাহ্ তাহার বান্দাকে জান্নাতের মধ্যে আরও এক শত সোপান বুলন্দ করিবেন এবং প্রত্যেকদুই সিঁড়ির ব্যবধান আসমান ও জমিনের দূরত্বের সমান। আবু সায়ীদ জানিতে চাহিলেন ঐ বস্তুটা কি? উত্তরে তিনি বলিলেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ"। এবং এ জিহাদ যে ইসলাম প্রচারের জন্য তাও হাদিসে বলা হয়েছে। আমরা জেনেছি কোরানের মতে ইসলাম প্রসারই জিহাদের চরম লক্ষ্য। হাদিস এই কথাটিকে শুধু জোর গলায় সমর্থন করেই ক্ষ্যান্ত থাকেনি। জেহাদীর লক্ষ্য পরম্পরায় একটি ক্রমান্বয়ও দেখিয়ে দিয়েছে। সহি মুসলিম-এর ৪২৯৪ হাদিস বলছে, " Fight in the name of Allah, in the way of Allah .... Invite them (i.e. the infidels) to accept Islam .... If they refuse to accept Islam demand from them the Jizya .... If they refuse to pay the tax seek Allah's help and fight them." (ডঃ আব্দুল হামিদ সিদ্দিকীর অনুবাদ)

হিদাইয়া বলেছে, " পয়গম্বরের তায়েফ যুদ্ধে দৃষ্টান্তে বোঝা যায়, কাফেরের বিরুদ্ধে সব রকম যুদ্ধাস্ত্র নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। তাদের ঘর বাড়ী জ্বালিয়ে দিতে হবে। পয়গম্বর যেমন জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন বাউইরাদের ঘর বাড়ী এবং বাঁধ খুলে দিয়ে শত্রুপুরির ক্ষেত খামার নষ্ট করতে হবে, যে কোন উপায়ে হীনবল করতে হবে কাফেরদের। এমনকি, "দাস, স্ত্রীলোক, বৃদ্ধলোক এবং শিশুরা থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধরত এলাকার শহর পানি দিয়ে প্লাবিত করা, আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলা বা ম্যানগোলেন দিয়ে আক্রমণ সমর্থনযোগ্য। (তারাবি ইখতিলাখ পৃ- ৬৭, সারাকসী মবসুত, ভলিউম-১০, পৃ-৬৫)

আমরা দেখলাম ঘর বাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়াও একটা সুন্না এবং মুসলমানের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। বাংলাদেশে ১৯৭১ সালে এবং ১৯৪৬, '৫০, '৬২, '৬৪, '৭৩ এবং '৮৯, '৯০ ও ২০০১ সালে এই সুন্নার ব্যাপক প্রয়োগ হয়। ১৯৭১ সালের ২৮শে মার্চ-এর ঘটনা সম্পর্কে চুনু ডোম (ঢাকা পৌরসভা) বলেছেন, "আমরা উক্ত পাঁচজন দেখলাম শাঁখারী বাজারের রাস্তার দু'ধারে ড্রেনের পাশে যুবক, যুবতী, নারী পুরুষের, কিশোর, শিশুর বহু পচা লাশ। দেখতে পেলাম বহু লাশ পচে ফুলে বীভৎস

হয়ে আছে। দেখলাম শাঁখারী বাজারের দুদিকে ঘরবাড়ী জ্বলছে। অনেক লোকের অর্ধ পোড়া লাশ পড়ে থাকতে দেখলাম। দু'পাশে অদূরে সশস্ত্র পাঞ্জাবী সৈন্যদের প্রহরায় মোতায়েন দেখলাম। প্রতিটি ঘরে মানুষ ও আসবাবপত্র জ্বলছে। একটি ঘরে প্রবেশ করে একজন মেয়ে একজন শিশু সহ বার জন যুবকের দগ্ধ লাশ উঠিয়েছি। শাঁখারী বাজারের প্রতিটি ঘর থেকে যুবক যুবতী বালক বালিকা শিশু কিশোর ও বৃদ্ধের লাশ তুলেছি। পাঞ্জাবী প্রহরায় থাকাকালে সেই মানুষের অসংখ্য লাশের উপর বিহারীদের উচ্ছৃঙ্খল উল্লাসে ফেটে পড়ে লুঠকরতে দেখলাম। প্রতিটি লাশ গুলিতে ঝাঁঝরা দেখেছি। মেয়েদের লাশের কারো স্তন পাই নাই। যোনিপথ ক্ষত বিক্ষত এবং পিছনের মাংস কাটা দেখেছি। মেয়েদের লাশ দেখে মনে হয়েছে তাদের হত্যা করার পূর্বে তাদের স্তন সজোরে টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। যোনিপথে লোহার রড কিংবা বন্দুকের নল ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। যুবতী মেয়েদের যোনিপথের এবং পিছনের মাংস ধারালো চাকু দিয়ে কেটে এসিড দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা ১৯৭১ সালের ২৮শে মার্চ শাঁখারী বাজার থেকে প্রতিবারে একশো লাশ উঠিয়ে তৃতীয়বার ট্রাক বোঝাই করে তিনশো লাশ ধলপুর ময়লার ডিপোতে ফেলেছি।" বলা বাহুল্য এটিও একটি জেহাদ, ইসলামের মতে পরম পুণ্যের কাজ এবং জান্নাতুল ফিরদৌস পাওয়ার সোপান। সেখানে রয়েছে অনন্ত সুখ, অনিন্দ্য সুন্দরী হুরপরী এবং আরও অনেক কিছু। অতএব সেই সর্বোচ্চ স্বর্গে যেতে কিছু ধর্মীয় কাজ আধুনিক যুগের মুসলমানরা করেন। মধ্যযুগের মুসলমান সুলতান, আমীর ওমরাহগণ এবং সর্ব স্তরের মুসলমানেরাও করতেন যাকে আধুনিক পণ্ডিতেরা মধ্যযুগীয় বর্বরতা বলে চিহ্নিত করেন তাও আমরা দেখেছি। আমাদের এও মনে আছে ইসলামে পরম ধর্মই হলো ইসলামের প্রসারকল্পে কাফের নিপাত।

অনেকে বলে থাকেন যে, দ্বি-জাতি তত্ত্ব একটি মিথ্যা তত্ত্ব এবং এটি মিঃ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বা কবি আলামা ইকবালের আবিস্কার। আমাদের দৃষ্টিতে এই 'ধারণা' মোটেই ঠিক নয়। মুসলমানরা এই তত্ত্বটি নিয়েছেন তাদের ধর্মশাস্ত্র থেকে। তাদের ধর্মশাস্ত্র অনুসারে ইসলাম খোদার একমাত্র মনোনীত ধর্ম (কোরান-৩/১৯) ধর্ম হিসেবে ইহুদি এবং খ্রীষ্ট ধর্মকে আংশিক ভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে ইসলাম; কিন্তু মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থায়ও তিনি ইহুদীদেরকে আরব ছাড়া করার কথা বলেছেন। (হাদিস নং ২৮৮, মুসলিম শরীফ, ৪র্থ খণ্ড পৃষ্ঠা- ১৮৩)। অন্য কোন ধর্মকে আদৌ স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। নবী প্রচার করেছেন যে, স্বয়ং খোদা ইসলামের মূল নীতিগুলো জিব্রাইলের মাধ্যমে তাঁর কাছে পাঠিয়েছেন। এই নীতিগুলো পরে 'কোরান' নামে একটি গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। পৃথিবীর সকল মুসলমানের দৃষ্টিতে এই কোরান পবিত্র ও অপরিবর্তনীয়। রক্ত মাংসে গড়া কোন মানুষ কোনদিন এই গ্রন্থের একটি অক্ষর বা বিরতি চিহ্নও পরিবর্তন করতে পারবে না। এই গ্রন্থে খোদা সমগ্র বিশ্ববাসীকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন — বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী। যাঁরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবেন তাঁরা

হবেন বিশ্বাসী। আর যাঁরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবেন না, তাঁরা হবেন অবিশ্বাসী। এই তত্ত্বের নাম দ্বি-জাতি তত্ত্ব। মুসলমানদের কাছে এটি একটি 'চির সত্য' (Universal Truth)। ইসলামের আর্বিভাবের পরে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশে এই দ্বিজাতি তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগ ঘটানো হয়েছে। এই তত্ত্বের ভিত্তিতে 'আমরা একটি জাতি আর তোমরা অন্য একটি জাতি'— একথা বলেই ইসলাম থেমে থাকেনি। 'বিশ্বের সমগ্র অধিবাসীদের মহাসত্য ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা এবং সমগ্র পৃথিবী থেকে পৌত্তলিকতা নির্মূল করা মুসলমানদের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য', এই বিধানও জারি করেছে। পৃথিবীতে শেষ অবিশ্বাসী ব্যক্তিটি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করা পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের মুসলমানদের ঐ পবিত্র দায়িত্ব পালন করতে হবে।

কমিউনিষ্ট নেতারা ধর্মকে আফিম হিসাবে ঘোষণা করলেও ইসলামের মধ্যে উদারতা এবং মহানুভবতার মত অমৃত খুঁজে পেয়েছেন। *(ইসলামের মধ্যে অনুরূপ অমৃত খুঁজে পেয়েছেন নাস্তিক তথা বৌদ্ধ বুদ্ধিজীবী রাহুল সাংকৃত্যায়ন, পাবনা থেকে ভারতে পালিয়ে যাওয়া ঠাকুর অনুকুলচন্দ্র, ঢাকা থেকে কলিকাতায় পালিয়ে যাওয়া জন্মসিদ্ধ ঠাকুর বালক ব্রহ্মচারী, বরিশাল থেকে পালিয়ে যাওয়া দুর্গাপ্রসন্ন পরমহংস)* মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবীর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা খুঁজে পাননি চল্লিশের দশকের কমিউনিষ্ট নেতারা। তৎকালীন প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাসিম ১৯৪৪-এ মুসলিম লীগের খসড়া ঘোষণাপত্র (মেনিফেষ্টো) রচনা করেন। খসড়াটি ইসলামের পয়গম্বর ও তার বিশ্বস্ত সাহাবাদের দ্বারা প্রচারিত ও অনুশীলিত ইসলামের তথাকথিত সার্বজনীন মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছিল। হাসিম সাহেব জানাচ্ছেন, " নিখিল চক্রবর্তী নামে একজন খুবই যোগ্য কমিউনিষ্ট যুবক খসড়াটি তৈরী করার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেন।" আসল ব্যাপার হলো হাসিম সাহেবের সাহায্য নিয়ে নিখিল বাবুই মুসলিম লীগের ঐ মেনিফেষ্টো লিখে দিয়েছিলেন।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস ইংরেজদের বলেছিলেন- 'ভারত ছাড়'। তখন জিন্নাহ্ বলেছিলেন, 'ভাগ কর এবং ভারত ছাড়'। তিনি খোদার নামে শপথ করে বলেছিলেন, 'হয় আমরা ভারত ভাগ করব, নয়ত ভারতকে ধ্বংস করব'। এর উত্তরে সর্বধর্ম সমন্বয়কারী এবং অহিংসার পূজারী গান্ধিজী বলেছিলেন, 'জিন্নাহ, মেরে ভাই, তোম প্রধানমন্ত্রী হো'। এই মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ সমগ্র হিন্দু জাতিকে মনুষ্যেতর জীব বলে মনে করতেন। যারা নিজেদের খাঁটি মুসলমান বলে পরিচয় দেন, তারাই বিধর্মীদের, বিশেষত মূর্তি পূজারীদের, মানবেতর জীব বলে মনে করেন।

মুসলিম লীগের মোহাম্মদ আলী এবং শওকত আলীকে (এরা সহোদর দুই ভাগ) গান্ধিজী নিজের ভাই-এর মত বিশ্বাস করতেন এবং ভালবাসতেন। মোহাম্মদ আলী কংগ্রেসেও যোগ দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, ১৯২৩-এ তিনি কংগ্রেসের সভাপতিও হয়েছিলেন। এই মোহাম্মদ আলী ১৯২৪ খৃঃ আজমীঢ়ে ও আলীগড়ে বলেছিলেন- "গান্ধিজীর চরিত্র যত পবিত্রই হোক না কেন, তিনি আমাদের কাছে

একজন চরিত্রহীন মুসলমানের চেয়েও নিকৃষ্ট।'' এর এক বছর পরে লখনৌ-এর এক জনসভায় তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তিনি একথা বলেছেন কিনা। উত্তরে তিনি এর সত্যতা স্বীকার করেন এবং আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেন, ''আমার ধর্ম বিশ্বাস ও রীতি অনুযায়ী একজন লম্পট ও জঘন্য চরিত্রের মুসলমানও আমার কাছে গান্ধিজীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। গান্ধিজী ১৯১৫ খ্রী. যখন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে আসেন, তখন অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিবিদ বলে খ্যাত বরিশালের এ. কে. ফজলুল হক (শেরে বাংলা) গান্ধিজীকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বলেছিলেন। গান্ধিজী এর উত্তরে বলেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি একজন মুসলমান। হক সাহেব একথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে বলেছিলেন। কিন্তু গান্ধিজী সম্মত হননি। সেদিন ভারতে মুসলমানরা জনসমষ্টির শতকরা মাত্র ২৪ শতাংশ হওয়া সত্ত্বেও তাদের প্রথম শ্রেণীর নেতা কংগ্রেসের সর্বাধিনায়ক গান্ধিজীকে এক লম্পট ও জঘন্য চরিত্রের মুসলমান অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলার পরেও গান্ধিজীর কোন ভক্ত এর প্রতিবাদ করেননি।

বরিশালের তফশিলী নেতা মি. যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল হিন্দু মুসলমানের মিলিত স্বর্গ রচনা করার উদ্দেশ্যে সেদিন মুসলিম লীগের সহযোগী সদস্য পদ গ্রহণ করেছিলেন। ভূ-ভারতে তিনিই একমাত্র হিন্দু যিনি গভীর আত্মপ্রত্যয় নিয়ে পাকিস্তানের অর্থ করেছিলেন 'পবিত্র ভূমি'। এই পবিত্র ভূমিতেই তিনি তফশিলীদের আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছিলেন। কোরান তফশিলীদেরও অপবিত্র ঘোষণা করেছে তা মি. মণ্ডলের খেয়াল ছিল না। তবে তাঁর সুখ স্বপ্ন ভাঙতে দেরী হয়নি। মুসলিম লীগের একান্ত বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তিনি ভারতে পালিয়ে এসেছিলেন ১৯৫০ এর সেপ্টেম্বর মাসে। কলকাতায় বসে ১৯৫০ সালের ৮ই অক্টোবর পাকিস্তান মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খাঁনকে উদ্দেশ্য করে লেখা ৮০০০ শব্দ সম্বলিত পৃথিবীর দীর্ঘতম এই পদত্যাগ-পত্রে তিনি মুসলিম ধর্ম শাস্ত্রের বিধান, মুসলিম মানসিকতা এবং মুসলিম রাজনীতির কৌশল বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করেছেন। সিলেট জেলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যোগেনবাবু সম্ভব অসম্ভব এবং নৈতিক অনৈতিক সব কাজই করেছিলেন। সেই যোগেনবাবু সিলেটবাসী হিন্দুদের উপর মুসলমানদের অত্যাচারের মর্মস্পর্শী বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর পদত্যাগ পত্রের ১৩ নং অনুচ্ছেদে।

''ঢাকার বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ''...... ঐ সময় আমি ৯ দিন ঢাকা শহরে ছিলাম। আমি ঢাকা শহর এবং শহরতলীর অধিকাংশ দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করেছি। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথে ট্রেনের মধ্যে শতশত নিরপরাধ হিন্দুকে খুন করা হয়েছে। .....১৯৫০ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী আমি বরিশাল যাই। সেখানকার ঘটনাবলীর বর্ণনা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। ....কাশীপুর মাধবপাশা এবং লাখুটিয়ার মুসলমান দাঙ্গাকারীরা যে বীভৎস তাণ্ডব সৃষ্টি করেছে, তা

শুনে আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেছি। মাধবপাশা জমিদার বাড়ীতে প্রায় ২০০ লোককে হত্যা করা হয়েছে। ......মূলাদি এলাকাটি ভয়াবহ নরকে পরিণত হয়েছিল। ওখানে আমি খবর পেলাম যে এলাকার সব প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ হিন্দুদের খুন করে যুবতী মেয়েদের দুর্বৃত্ত সর্দারদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে। স্থানীয় মুসলমান ও কতিপয় অফিসারের রিপোর্ট অনুসারে একমাত্র মূলাদি বন্দরেই ৩০০-ও বেশী হিন্দুকে খুন করা হয়েছে। ...... বিশদ বিবরণ থেকে জানা গেছে যে, একমাত্র বরিশাল জেলাতেই ২৫০০ জনকে খুন করা হয়েছে। ঢাকা তথা পূর্ববঙ্গের দাঙ্গায় প্রায় ১০,০০০ লোককে খুন করা হয়েছে। সত্যি সত্যি আমি শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়েছিলাম। যে সমস্ত মহিলা ও শিশু তাঁদের আপন জন সহ সব কিছু হারিয়েছেন, তাদের কান্নার রোল আমার হৃদয়কে বেদনাপ্লুত করে দেয়। আমি নিজের কাছে নিজেই প্রশ্ন করলাম - ইসলামের নামে কি আসছে পাকিস্থানে?'' (অনুচ্ছেদে-২২)

পদত্যাগ-পত্রে যোগেনবাবু আরও লিখেছেন, '' ...... উদ্বিগ্নভাবে দীর্ঘ দিন ধরে চিন্তা ভাবনা করে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, পাকিস্থান হিন্দুদের জন্য নয় এবং তাঁদের ধর্মান্তরকরণ বা বিলীন হয়ে যাওয়ার মত অশুভ সম্ভাবনা দ্বারা আচ্ছন্ন। বিরাট সংখ্যক বর্ণহিন্দু এবং রাজনীতি সচেতন তফশিলী পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করেছেন। এই ভেবে আমি ভীত যে, এই অভিশপ্ত প্রদেশে এবং পাকিস্থানে যে সকল হিন্দুরা বসবাস করতে বাধ্য হবেন, তাঁদেরকে ধীরে ধীরে এবং সুপরিকল্পিত ভাবে হয় ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা হবে, নয়তো তাদেরকে সম্পূর্ণ ভাবে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হবে। এটা সত্যই আশ্চর্য্যজনক ঘটনা যে, আপনার মত (প্রধানমন্ত্রি লিয়াকত আলী খান) শিক্ষিত সংস্কৃতিবান এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি আজ এমন দর্শনের প্রচারক হয়ে গেলেন, যে দর্শন মানবতার পক্ষে ভয়াবহ বিপজ্জনক এবং যে দর্শন ন্যায় ও শুভ চিন্তাধারা থেকে উদ্ভুত যাবতীয় নীতিমালার পক্ষে ক্ষতিকারক।''

১৯৭০ এর মার্চ থেকে ১৯৭১ এর জুন পর্যন্ত ঢাকায় মার্কিন কনসাল জেনারেল ছিলেন আর্চার. কে. ব্লাড। প্রত্যক্ষদর্শী এই কুটনীতিক লিখেছেন, '' .... ১৪ই মে আমরা আবার হিন্দু ইস্যুতে ফিরে গেলাম। 'হিন্দু হত্যা' শীর্ষক এক টেলিগ্রামে লিখলাম, অনেক বিশ্বস্ত প্রত্যক্ষদর্শী ও অন্যান্য সূত্রের মাধ্যমে আমরা বিস্তারিত খবর পাচ্ছি যে, সেনা সদস্যরা গ্রামে ঢুকে প্রথমেই খবর নিচ্ছে হিন্দুরা কোথায় থাকে। সেখানে গিয়ে তারা বেছে বেছে হিন্দু পুরুষদের হত্যা করছে। .... সেনাবাহিনী এমন শত্রুকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে প্রদেশ জুড়ে তল্লাসী চালাচ্ছে এবং সব জায়গায় হিন্দুরা এর বলি হচ্ছে। ..... আমাদের মধ্যে এই বিশ্বাস ঘনীভূত হচ্ছিল যে, পাক বাহিনী পূর্ব পাকিস্থানকে হিন্দু-মুক্ত করার জন্য সুপরিকল্পিত নীতি গ্রহণ করেছে। .... একাধিকবার অনেক পাকিস্থানী সৈন্য আমাকে গলা উঁচু করে বলেছিল, তারা পূর্ব পাকিস্থানে এসেছে হিন্দু মারতে। (প্রথম আলো, ২৪শে মার্চ ১৯৯৯) আজকের কলকাতার বিশিষ্ট গবেষক-লেখক দেবজ্যোতি রায় ঐ সময় (১৯৭১) তাঁর জন্মভূমি বরিশালের আটঘর-কুড়িয়ানা

এলাকায় ছিলেন। পাকসেনা পরিবৃত রাজাকাররা তাঁর বাড়িতে (পাড়ায়) যে নৃশংস অত্যাচার করেছে, তা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, তাঁর পিতা সহ কয়েক জন বৃদ্ধকে খুন করার উদ্দেশ্যে বাড়ীর দুর্গা মন্দিরের সামনে নিয়ে গিয়ে বলেছিল, ".... 'শালা মালাউনের বাচ্চা, খুব তো ঘটা হইরা পূজা হরছো .... তোদের হগলের এহানে জবাই করুম। দেহি, ঐ দুয়া মাগি আইস্‌সা তোদের বাঁচায় কিনা।' ..... এই বলে মন্দিরে ঢুকে প্রতিটি প্রতিমার চোখে লোহার রড ঢুকিয়ে দেয় এবং পরে গুড়িয়ে দেয়। এরপর ওরা মন্দির এবং তার সঙ্গে ৩৫-টি ঘরের ৩৪-টিতে আগুন ধরিয়ে দেয়।"

১৯৭১ সালে মুসলমানরা হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নি সংযোগ ও নারী ধর্ষণ করে যে কলঙ্কময় ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, পৃথিবীতে তার নজীর নেই। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই পাকিস্থানের মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী যে নির্দেশ দেন, তাতে স্পষ্ট করেই বলেন, হিন্দুরা হল কাফের। তিনি হিন্দুদের হত্যা করতে এবং তাদের সম্পত্তি ধ্বংস করতে নির্দেশ দেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ৯০ ভাগ হিন্দুর বাড়ী ও সম্পত্তি ধবংস ও লুণ্ঠিত হয়। হামিদুর রহমান কমিশনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে লে. ক. আজিজ আহমেদ খাঁন (স্বাক্ষী নং - ২৭৬) বলেন, ঠাকুরগাঁও এবং বগুড়া পরিদর্শন করতে গিয়ে জে. নিয়াজী জিজ্ঞেস করেছিলেন, কত সংখ্যক হিন্দুকে তোমরা হত্যা করতে পেরেছে? (এইচ.আর. রিপোর্ট, পৃ-৯)

ইসলাম সম্পর্কে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যাক, আলহাজ্ব আবুল হোসেন এম.পি. জানাচ্ছেন - "আওয়ামী লীগের কাছে ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। সেই জীবন বিধানকে সব সময়ই সমুন্নত রাখার পবিত্র ওয়াদা আওয়ামী লীগের। আওয়ামী লীগের ইসলাম তাই বি.এন.পি. বা জামায়াতের ইসলাম নয়। আওয়ামী লীগের ইসলাম পবিত্র কোরানের শিক্ষা এবং রসুলে করিম (সঃ) এর অনুশাসন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু থেকে তদীয় কন্যা শেখ হাসিনা এই একই চিন্তা ও চেতনার অনুসারী। মাদ্রাসা শিক্ষা প্রসারের জন্য মাদ্রাসা বোর্ডও তিনি (শেখ মুজিব) গঠন করেছিলেন। পবিত্র হজ্বের পর মুসলমানদের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমাবেশ তবলিগ জামাতের জন্যে তিনি ঢাকার অদূরে টঙ্গীতে জমি প্রদান করেন। তিনিই প্রথম বাংলাদেশকে ইসলামী উম্মাহর অঙ্গীভূত করার মানসে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা ও.আই.সি.-তে (Organisation of Islamic Countries) যোগদান করেন এবং আনুষ্ঠানিক ভাবে বাংলাদেশকে এই সংস্থাভুক্ত করেন। বঙ্গবন্ধুর সময়ে হজব্রত পালনের জন্য সরকারী অনুদানের ব্যবস্থা করা হয়."

জন্মসূত্রে পাকিস্থানী এবং বর্তমানে বৃটেন প্রবাসী লেখক জনাব আনোয়ার শেখ তাঁর 'ইসলাম আরবের জাতীয় আন্দোলন' শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন, 'ইসলাম শান্তির পক্ষে বিপজ্জনক।" (পৃ- ৪৮)

ঐতিহাসিক উইলিয়াম ম্যুর-এর বিচারে 'মোহাম্মদের তরবারি ও কোরান সভ্যতা, স্বাধীনতা ও সত্যের ভয়ঙ্কর শত্রু" ["The sword of Mohammad, and the Koran

are the most stubborn enemies of Civilization, Liberty, and Truth which the world has yet known." From: W. Muir's 'Life of Mahomet', p-522]

তলোয়ারই মুসলমানের বেহেস্তে যাবার প্রশস্ততম উপায়। এ ব্যাপারে মিসকাত শরীফের ৪৫৪৯ নং হাদিসে আছে, হযরত আবু মুসা বলেন, "রসুলুল্লাহ বলিয়াছেন, বেহেস্তের দ্বার সমূহ তলোয়ারের ছায়াতলে রহিয়াছে।" যারা ইসলামকে শান্তিবাদী হিসাবে প্রচার করেন, তাদের জন্য নিম্নোক্ত হাদিসটি বারবার পাঠ করার জন্য অনুরোধ রাখছি। "হযরত আবু হুরাইরা বলেন, 'রসুলুল্লাহ বলিয়াছেন, সেই পবিত্র সত্তার শপথ করিয়া বলিতেছি, যাহার মুঠার মধ্যে আমার প্রাণ, আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয় বস্তু হইল আমি আল্লাহর পথে নিহত হই, তারপর জীবন লাভ করি, আবার নিহত হই। তারপরেও পুনরায় জীবন লাভ করি। পরে আবার পুনরায় নিহত হই। (মিসকাত-৪৪৮৯) এই নিহত মানে শহীদ হওয়া। শহীদ মানে আল্লাহর পথে শাহাদত। এই শাহাদাতের উত্তমাধম সম্বন্ধে হাদিস আছে। "জিজ্ঞাসা করা হইল (জিহাদে) কি ধরনের মৃত্যুবরণ করা উত্তম? রসুলুল্লা বলিলেন, যাহার রক্ত প্রবাহিত করা হয়, সাথে সাথে তাহার সওয়ারী ঘোড়ার পাও কাটিয়া ফেলা হয়। (মিশকাত শরীফের ৪৫৩০ নং হাদিস) এই হাদিসে জেহাদীর রক্ত পিপাসার কথা খুব স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে। মওলানা এম আফ্লাতুন কায়সার তার নোটে এই স্পষ্ট কথাটা আরও স্পষ্ট করে বলেন, "রক্ত প্রবাহিত করা ও ঘোড়াকে আহত করা ইহার দ্বারা নিজে শহীদ হওয়া এবং সওয়ারীকে নিঃশেষ করিয়া দেওয়া অর্থাৎ জানে ও মালে জিহাদের পূর্ণ হক আদায় করার দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে।" মুসলমানেরা যদি অমুসলমান এলাকা থেকে অস্ত্রশস্ত্র এবং আরোহনযোগ্য পশু ও ভেড়া লাভ করে এবং তা যদি ইসলাম শাসিত এলাকায় আনতে সক্ষম না হয় তা হলে তা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। (আবু ইউসুফ, কিতাব আল রাদ, পৃ- ৮৮-৮৯, মজিদ খাদ্দুরী, মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন, পৃ- ১০৫)

লুটপাট ও অগ্নি সংযোগ ইসলাম ধর্ম পালনের অঙ্গ বিশেষ তা আপনারা জেনেছেন। তবে হাদিস মতে তা অবশ্যই বিধর্মীর ঘরবাড়ী ও ধন সম্পদ হতে হবে। ১৯৮৯ সালের ৩১শে অক্টোবর মোজাম্মেল হক লিখেছেন, "ঢাকার নবাবপুর, তাঁতিবাজার, শাঁখারী বাজার, ইসলামপুর, পাটুয়াটুলিতে হিন্দুদের দোকান লুট, মন্দির আক্রমণ ও অগ্নি সংযোগ চলেছে। একই সময় চট্টগ্রামের প্রধান প্রধান ধর্মীয় মন্দির গুলোর মধ্যে কৃষ্ণানন্দ মঠ, কৈবল্যধাম, পঞ্চানন ধাম, সদরঘাট কালীবাড়ী, মন্দির মিশন পরিচালিত শ্রীশ্রী নিত্যানন্দ ধাম, দেওয়ানেশ্বরী কালীবাড়ী, বাঁশখালির কোকাদণ্ডী ঋষিধাম, সাধনপুর সহ শত সহস্র ঘরবাড়ী, দোকান লুটপাট ও মন্দির ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা পায়নি।" ('আমি হিন্দু বলছি', পৃ- ৪৩) প্রত্যক্ষদর্শী ফজলুল বারী লিখেছেন, " ..... জিন্স পড়া একদল যুবক ছুটছে আগুন হাতে নিয়ে। পুলিশ ঠায় দাঁড়িয়ে আছে পাশে ..... রায়ের বাজার গলির ভেতর থেকে চিৎকার আর কান্নায় ছুটে পালাচ্ছিল এক বালিকা। সম্ভবতঃ কোন হিন্দু পরিবারের সদস্যা হবে। পাষণ্ডের মত কিছু যুবক

পেছনে থেকে ধরধর বলে তাড়া করছিল ..... টিপু সুলতান রোডে অনেকগুলো দোকানের ভেতর আগুন জ্বলছিল তখনো। কোর্টের কাছে ওভার ব্রীজের নীচের রাস্তায় আগুন। এখানে শক্তি ঔষধালয় লুটপাট শেষে আসবাবপত্র রাস্তায় নিয়ে আগুন দেয়া হয়েছে। ...... লুটেরাদের মুখে শ্লোগান ছিল "হিন্দু ধর মালু ধর মালু ধর" (ঐ, পৃ-৪৪-৪৫)

প্রসঙ্গক্রমে ১৯৬৫ সালের দাঙ্গায় রংপুরের একটি ঘটনা পাঠকদের জানানো উচিত বলে মনে করছি। সে সময় সুনীল নামে এক ভদ্রলোক রংপুর জেলে আটকে ছিলেন রাজনৈতিক কারণে। কিছু মুসলমান দাঙ্গাকারীও সে সময় আটক হয়েছিল। ঘটনার বর্ণনা করেছেন সুনীল বাবু নিজে। তার থেকে শ্রীসিতাংশু রায় তাঁর বিখ্যাত 'বিদ্রোহী' নামক পুস্তকে বিবৃত করেছেন, "ঐ সময় রংপুর জেলে মুসলমান দুষ্কৃতিকারীদের যারা এসেছিল তার মধ্যে ৬০/৭০ জনের একটি দল ছিল। তাদেরকে গ্রেফতার করে আনা হয়েছিল, মিঠাপুকুর থানা এলাকা থেকে। ঐ এলাকার একটি হিন্দু জেলেদের গ্রামে তারা হত্যা, লুণ্ঠন, গৃহদাহ এবং নারী ধর্ষণ করে। বলতে গেলে গ্রামটিকে পুরো পুরি ভাবেই শেষ করে দিয়েছিল। গ্রামের সব পুরুষই নিহত হয়েছিল; নয়ত পালিয়ে গিয়েছিল। লুণ্ঠিত এবং ভস্মীভূত হয়েছিল প্রতিটি বাড়ী। আর ধর্ষিতা হয়েছিল ৬/৭ বছর বয়স থেকে ৬০/৭০ বছর বয়স পর্যন্ত প্রতিটি নারী। ধর্ষণের কারণে কয়েকটি বাচ্চা মেয়ে মারাও পড়েছিল। আর ঐ দলটিতে যাদের ধরে আনা হয়েছিল, তাদের মধ্যেও ছিল ১২-১৩ বছর বয়স থেকে ৭০/৮০ বছর বয়স পর্যন্ত বালক ও বৃদ্ধ।" সুনীলবাবু জেলে বসে শুনছিলেন ঐ সমস্ত লোকদের কথোপকথন। তার একাংশ এরূপ— "শেষের দিকে যখন তারা মেয়েদেরকে মাঠের মধ্যে নিয়ে গণধর্ষণের আলোচনায় এসে পৌছেছে, তখন তো আর কথাই নেই। সব আনন্দে ফেটে পড়েছে। কে কিভাবে তখন কি করেছিল, অঙ্গভঙ্গী করে তা দেখাতেই শুরু করে দিয়েছে। আর বারেবারেই বলেছে, "জেলের থিকা ছাড়া পাইলেই এই কয় দিনের কাম একদিনেই উসুল করুম।" এ ব্যাপারে তাদের বাচ্চা বুড়োতে কোনই পার্থক্য নাই। সবাই সমান তালে একই ধরনের কথা বলে চলেছে। এরই মধ্যে একটা ছেলে বলে উঠলো, "আরে আমি যে বাচ্চা চেংড়িডারে লইছিলাম, হেইডারে তো ফাইটা ফুইটা গলগল কইরা রক্ত বাইর হইতে লাগছে। আর হেইডায় যে চিৎকার করতে লাগছে, তবুও আমি হেইডারে ছাড়ি নাই। কাইল আমার যে মামু আইছিল, হ্যায় বইলা গেল ঐ চেংড়িডা নাকি মরছে।" ছেলেটির কথা শেষ হতে না হতেই বছর ৫০-এর এক তাগড়া জোয়ান বলে উঠেছিল, "হ ছাড়ুম কেনে, আমি মইরা গেলেও ছাড়ি নাই। কাম শ্যাষ কইরা তবেই ছাড়ছি। আমি যারে মারলাম সেই ৭/৮ বছরের চেংড়িডারে আগে লইছিল রহমানে, কিন্তু ফাইটা রক্ত বাইর হইতেই রহমান ওরে ছাইর‍্যা দিছে। আর সঙ্গে সঙ্গে আমিও ধরছি। ধরতেই যে চিৎকার দিছে। সেই চিৎকার বন্ধ কইরবার জন্যই তো আমি ওর গলা টিপ্পা ধরছিলাম; যে জন্যই হালী মরলো। কিন্তু তবুও আমি কাম ছাড়ি নাই, মরার পরও চালাইছি।" এই সময়েই একটা ছেলে

বলে উঠেছিল, তুই না হালা মুনসী, কোরান পড়স, তুই এমন কাম করলি। উত্তরে ঐ লোকটি আবারও বলেছিল, "হ কোরান পড়ি বইলাই তো জানি হিন্দুগুলারে এইভাবে মাইরা শেষ করবার কথাই কোরানে আছে।" (শ্রীসিতাংশু রায়, 'বিদ্রোহী', পৃ- ৮১-৮২)

কাফেরদের বাড়ীঘর, দোকান পাট আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া একটি আদর্শ সুন্না। তা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু লুটপাট ও নারী অপহরণ ইসলাম সমর্থন করে কিনা বা হযরত মুহাম্মদের জীবনে পালন করেছেন কিনা তা দেখা যাক। মোজাম্মেল হক ও সাংবাদিক ফজলুল বারী এদের পাষণ্ড বলেছেন। এর কারণ ইসলাম সম্পর্কে তাঁদের অজ্ঞতা পর্বত প্রমাণ।

আমরা জেনেছি জিহাদের পারলৌকিক ফল হচ্ছে 'জান্নাত-উল-ফিরদৌস, আর ইহলৌকিক ফল হলো ইসলাম প্রসার, জিজিয়া এবং গণিমতের মাল বা লুঠ করা সম্পত্তির প্রাপ্তি যোগ। 'গণিমতের মাল' কথাটির পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে 'লুঠের মাল'। বিধর্মীর কাছ থেকে কেড়ে আনা স্থাবর-অস্থাবর সব মালই গণিমতের মধ্যে পড়ে। তারিখ-ই-ফিরোজশাহী নামক বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থে বলা হয়েছে, "মিথ্যা নবুয়তের দাবীদার বর্গকে হত্যা করিবার পর তাহাদের পরিবারবর্গ ও ধন সম্পদকে ইসলামী সৈন্য দলের জন্য গণিমতের মাল হিসাবে গণ্য করা হয়।" কোরানের অষ্টম সূরার নাম 'সুরাতুল আনফাল' বা উপরি পাওনার সূরা। এই সুরার সবটাই গণিমতের মাল সম্বন্ধে। 'গণিমতের মাল'-কে এখানে উপরি পাওনা বলা হয়েছে। এর মধ্যে ইঙ্গিত আছে, জেহাদের আসল লক্ষ্য ইসলাম বিস্তার; গণিমতের মালটা উপরি পাওনা মাত্র। এই সুরার প্রথম আয়াতে আছে, "গণিমতের মাল আল্লাহ ও রসুলের সুতরাং আল্লাকে ভয় কর।" (কো-৮/১) ৪১ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "আরও জেনে রাখো যুদ্ধে যে গণিমতের মাল তোমরা লাভ কর তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ্র রসুল ও রসুলের স্বজন, পিতৃহীন দরিদ্র ও পথচারীদের জন্য।" (কো-৮/৪১) এখানে আমরা দেখছি যে, হযরত মুহাম্মদ নিজেও লুঠের মালের ভাগ পেতেন। অর্থাৎ লুঠ করা ইসলামে ধার্মিকতার একটি অংশ। তবে কোরানে এও বলা হয়েছে, জেহাদী ছাড়া আর কোন মুসলমান গণিমতের মালের ভাগ পাবে না। "তোমরা যখন গণিমতের মাল সংগ্রহের জন্য যাবে, তখন যারা গৃহে থেকে গিয়েছিল, তারা বলবে, তোমাদের সঙ্গে আমাদেরও যেতে দাও। .... বল তোমরা কিছুতেই আমাদের সঙ্গী হতে পারবে না।" (কো-৪৮/১৫) গণিমতের মাল সম্পর্কে আল্লাহর প্রতিশ্রুতিও আছে । "বিশ্বাসীরা যখন বৃক্ষতলে তোমার নিকট আনুগত্যের শপথ করলো .... তখন আল্লাহ তাদের জন্য স্থির করলেন, আসন্ন বিজয় ও বিপুল পরিমাণ গণিমতের মাল যার অধিকারী হবে তোমরা (৪৮/১৮-১৯)

খন্দকের যুদ্ধের পর "আল্লাহ অবিশ্বাসীদের ক্রুদ্ধাবস্থায় বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য করলেন ..... কিতাবীদের মধ্যে যারা ওদের সাহায্য করেছিল তাদের

তিনি দূর্গ হতে অবতরণে বাধ্য করলেন .... এখন তোমরা এক দলকে হত্যা করেছ এবং অপর দলকে বন্দী করিয়া লইতেছ। (কো-৩৩/২৬) "তিনি তোমাদিগকে তাহাদের যমীন, ঘর-বাড়ী এবং তাহাদের ধন-মালের উত্তরাধিকারী বানাইয়া দিয়াছেন।" (কো-৩৩/২৭) কোন বিবেকবান মুসলমান যদি লুঠের মাল না নিতে চায় তাকে আল্লাহ বলেন, "যে গণিমতের মাল তোমরা পেয়েছ তা বৈধ ও উত্তম বলে ভোগ কর। (কো- ৮/৬৯) অতএব বিধর্মীর গৃহ সম্পত্তি লুট করা ইসলামী মতে বৈধ। তাই আধুনিক কালেও মুসলমানেরা সুযোগ পেলেই লুঠপাট করে। ১৯৮৯-তে অযোধ্যায় রাম মন্দির বাবরি মসজিদ নিয়ে সৃষ্ট ঘটনায় বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে হিন্দুদের সহায় সম্পত্তি লুঠপাট হয়েছিল মুসলমানদের দ্বারা। আর ১৯৭১ সালে সারা বাংলাদেশে সমস্ত হিন্দুবাড়ী সহায় সম্পত্তি লুঠপাট হয়েছিল। জনৈক ব্যক্তি ১৯৭১ সালের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন এভাবে — 'নেংটির নিচে হাত দিয়ে দেখি, এই দু'টো জিনিস আছে। আর সবই মুসলমানরা নিয়ে গেছে।' বলা বাহুল্য, এগুলো আধুনিক ধারণায় অপরাধ হলেও ইসলামী মতে পরম ধার্মিকতার কাজ। এখানে একটা জিনিস পরিষ্কার করা ভাল, তা হলো গণিমা ও ফেই-এর মধ্যকার পার্থক্য নিয়ে মত পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। ব্যবহার শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ একমত যে, গণিমার অর্থ হলো শত্রুর কাছ থেকে বলপূর্বক গৃহীত সম্পত্তি। আর বল প্রয়োগ ছাড়াই গৃহীত সম্পত্তি হলো ফেই সম্পত্তি।" (মজিদ খাদ্দুরী, মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন, পৃ-৫২) ইদানিং ফাও খাওয়া বলতে একটি কথা প্রচলিত আছে। শব্দটি মুলতঃ 'ফেই' থেকেই উৎপত্তি।

ইসলাম ধর্ম মতে বিধর্মী পুরুষ কাফের হত্যার যোগ্য হলেও এদের বৌ-ঝি অর্থাৎ স্ত্রী ও মেয়ে কিন্তু ভালো জিনিস; বধযোগ্য নয়। এই বৌ-ঝিরা সম্পদের মত গণিমতের মাল হিসেবেই গণ্য। তাই ইসলামের যাত্রা শুরু থেকে আজ পর্যন্ত মুসলমানগণ কাফেরদের বৌ-ঝি পাবার জন্য লালায়িত। ভারতের অধিকাংশ বাদশাই কাফেরদের বৌ-ঝি কে পরমানন্দে ভোগ করতেন। এ কথা সকলেই জানেন। এসব কাফেরদের বৌ-ঝি যে বল পূর্বক গ্রহণ করতেন তা বলাই বাহুল্য। ইতিহাস আমাদের জানাচ্ছে, ৭১২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে রাওয়ের দূর্গে রাজা দাহিরের স্ত্রী লাদি ও দুই মেয়ে সূর্য দেবী ও পরমল দেবী প্রথম বিন কাশিম অধিকার করেন। কিন্তু রাজা দাহিরের অপর স্ত্রী মুসলমানের হাতে ধরা পড়ার আগেই আগুনে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে কুল-ধর্ম রক্ষা করেন। মাহিসওয়ারের হাত থেকে রক্ষা পেতে শিলাদেবী করতোয়ার জলে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। বগুড়ার তুলসী গঙ্গার ঘাটেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল। ঈশা খাঁ সোনাময়ীকে এভাবেই দখল করেছিলেন। যেখানে আটক অবস্থায় তিনি অঝোরে কেঁদেছিলেন, সেই জায়গার নাম হয়েছে সোনাকান্দা। পরবর্তীতে এই সোনাময়ীও (সোনাবিবি) আগুনে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। এ হলো বীর নারীদের কথা। কিন্তু নারী স্বভাবতই অবলা প্রকৃতির। তাই মুসলমান সুলতানগণ 'সিন্ধুকী' বা মহিলা গুপ্তচর নামিয়ে ক্রমাগত হিন্দু সুন্দরী নারীগণের সংবাদ সংগ্রহ করতেন এবং

তাদের বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করে বিয়ে করতেন বা হারেমে রাখতেন। মধ্য যুগের এসব ঘটনা সবারই জানা। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেও এমন নজীর অহরহ পাওয়া যাচ্ছে। ১৯৪৬ সালের ৬ই ডিসেম্বর একটি রিলিফ সেন্টার থেকে মিস মুরিয়াল লিষ্টার লিখেছেন, "দুর্দশা সবচেয়ে বেশী ছিল নারীদের। এদের মধ্যে অনেকেই স্বচক্ষে আপন স্বামীকে খুন হতে দেখেছেন এবং তারপর বল প্রয়োগে ধর্মান্তরিত হওয়ার পর স্বামীর হত্যাকারীদেরই কোন একজনকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছেন। নারীদের চোখে ছিল মৃতের চাহনি। সে চাহনি হতাশার অভিব্যক্তি নয়। কারণ হতাশারও একটা ক্রিয়া আছে। এ যেন সম্পূর্ণ মসীলিপ্ত অন্ধকার। গো-মাংস ভক্ষণ ও ইসলামে আনুগত্যের শপথ বহু লোকের উপর জোর করে চাপানো হয়েছিল এবং তা না করলে মৃত্যুই ছিল দণ্ড। (V.V. Nagarkar-genesis - 446)

এখন দেখা যাক লুট করে বা কাফেরদের যুদ্ধলব্ধ মেয়ে-বৌদের নির্বিচারে ভোগ করা ইসলামে বৈধ কিনা? কোরানের ৪/২৪ নং আয়াত মতে, ডান হাতে দখল করা (কাফেরদের) বৌ-ঝিদেরকে আল্লাহ্ মুজাহিদদের উপপত্নী হিসেবে 'লিপি করেছেন'। হাদিস এই লিপির কার্যগত প্রয়োগ দেখিয়েছে অত্যন্ত প্রাঞ্জল এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায়। সহী মুসলিম নামক হাদিস সংকলনের ৩৪৩২ নং হাদিসে 'নাযিল হওয়ার বিবরণ দিয়েছে এ ভাবে —

"Abu Sa'id al-Khudri ... reported that at the Battle of Hanain Allah's Messenger (may peace be upon him) sent an army to Autas and encountered the enemy and fought with them. Having overcome them and taken them captives, the Companions of Allah's Messenger (may peace be upon him) seemed to refrain from having intercourse with captive women because of their husbands being polytheists. Then Allah, Most High, sent down regarding that:" And women already married, except those whom your right hands possess (iv. 24)" (i. e. they were lawful for them when their 'Idda period came to an end."'[Sahi Muslim, Book 008, Number 3432]

এই হাদিসের অর্থ হচ্ছে হুনাইনের যুদ্ধে বিধর্মীদের মেয়ে-বৌকে বেঁধে এনে পয়গম্বরের অনুগামীরা তাদের সঙ্গে সহবাস (ধর্ষণ) করতে ইতস্তত করছিল। আল্লাহ কোরানের ৪/২৪ নং আয়াত নাযিল করিয়ে তাদের দ্বিধা দন্দ্ব মুছে দেন।

পৃথিবীর সকল নীতিজ্ঞান সম্পন্ন মানুষ ধর্ষণকে ঘৃণা করলেও ইসলামে তার স্বীকৃতি আছে। দেখা যাক, এ বিষয়ে কোন প্রামাণ্য সুন্না আছে কিনা? অথবা হযরত মুহাম্মদ নিজে তাঁর জীবনে এ জাতীয় কোন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন কিনা বা গণিমতের

মাল হিসেবে নিজে কোন বন্দিনীকে গ্রহণ করেছেন কিনা।

ইতিহাস ঘেঁটে আমরা দেখতে পাচ্ছি হযরত মুহাম্মদ নিজেও "গণিমতের মাল" হিসেবে বন্দিনী কাফের বৌ-ঝিদের গ্রহণ করেছেন এবং অন্যান্যদের গ্রহণ করতে বলেছেন। আগেই বলা হয়েছে, ইসলাম ধর্মমতে কাফের পুরুষগণই কেবল খারাপ; কিন্তু তাদের মেয়ে-বৌ-ঝি ভাল জিনিস এবং আল্লাহর দান। গণিমতের মাল হিসাবে নবী সেগুলোকে দ্বিধা দ্বন্দ না করে গ্রহণ করতে বলেছেন। তিনি নিজেও সে দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছেন। খায়বার গোষ্ঠীর ইহুদিদের নেতা কিনারার পত্নী সাফিয়াকে বন্দী করে এনে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন এবং পত্নী হিসাবে গ্রহণ করেন। মুস্তালিক গোষ্ঠীর আরব কন্যা জুরাইয়া সম্বন্ধে একই রকম তথ্য হাদিসে আছে —

> *Sahi Muslim:Book 019, Number 4292: "...... The Messenger of Allah (may peace be upon him) made a raid upon Banu Mustaliq while, they were unaware and their cattle were having a drink at the water. He killed those who fought and imprisoned others. On that very day, he captured Juwairiya bint al-Harith ....." (সহী মুসলিম- ৪২৯২)*

আমরা আরও দেখি খায়বার যুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত যুদ্ধলব্ধ মালে নবীজীর অংশ আসিব বিন আদির অংশের সাথে সংযুক্ত করা হয়। মহানবী তিন ধরনের অংশ পাওয়ার অধিকারী ছিলেন।

(ক) যুদ্ধলব্ধ মাল বন্টনের পূর্বে তাঁর পছন্দকৃত বস্তু;

(খ) এক পঞ্চমাংশ হিসেবে তাঁর অংশ এবং

(গ) অন্যান্য যোদ্ধাদের সাথে অংশ গ্রহণ করার জন্য যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী হিসেবে তার অংশ এবং একজন যোদ্ধার মত তাকেও সাধারণত এই অংশ দেওয়া হত।

(আবু ইউসুফ, কিতাব আল খারাজ, পৃ- ২৩; সারাকসী মবসুত, ১০/২৭)

কিন্তু সোফিয়ার ক্ষেত্রে একটু অন্যরকম ঘটেছিল। সোফিয়ার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা হলো — সোফিয়া নির্বাসিত নাজির গোষ্ঠীর নেতা হুয়াই (huay) এর মেয়ে এবং খায়বার নেতা কিনানার পত্নী। হুয়াইকে কিছুকাল আগেই গুপ্ত ঘাতক পাঠিয়ে হত্যা করা হয়। কিনানকে হত্যা করা হয় খায়বারের যুদ্ধবন্দী হিসাবে। বলা বাহুল্য সোফিয়া দাসী ছিলেন না। তিনি খায়বার গোষ্ঠীর সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত মহিলা ছিলেন। তিনি দাসী হন জেহাদের বন্দিনী হিসাবে। মাল ভাগাভাগিতে সোফিয়া পড়েন দিহিয়া নামক হযরত মুহাম্মদের এক সহচরের ভাগে। কিন্তু এক ব্যক্তি এসে নবীজীকে বলে, সোফিয়া শুধু আপনারই উপযুক্ত। হযরত মুহাম্মদ তখন দিহিয়াকে ডেকে বলেন, তুমি অন্য যে কোন বন্দিনীকে বেছে নাও। তারপর হযরত তাকে মুক্তি দিয়ে নিজে বিয়ে করেন। তার মুক্তিদানকেই ধরা হয় তার মোহর বা দেনমোহর। (সহি মুসলিম- ৩৩২৫) কোরান,

হাদিস ও হযরত মুহাম্মদের জীবনী থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, অমুসলিম নারী অপহরণ বা বন্দী করে ভোগ করা বৈধ। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) নিজে এ আদর্শ পালন করেছেন এবং অন্যান্যদেরকেও পালন করতে বলেছেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ প্রক্রিয়ায় নারী দেহ নির্বিবাদে ভোগ করলেও ভারতীয় নারীগণ বাদ সাধে, তাই ভারতীয় সুলতানদের অনেক সময়েই হা-হুতাশ করতে হয়েছে। যেমন চিতোরের সুন্দরী নারী পদ্মিনীকে লুট করার জন্য আলাউদ্দিন খিলজী চিতোর আক্রমণ করেন। কিন্তু আলাউদ্দিন ও তার সৈন্য বাহিনীর জান্তব লালসার হাত থেকে নিজেদের সম্মান রক্ষা করতে রাণী পদ্মিনী ও চিতোরের চার হাজার রাজপুত নারী আগুনে ঝাঁপ দিয়ে জহর ব্রত পালন করেন। ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে বাহাদুর শাহ চিতোর দূর্গ দখল করেন। এই যুদ্ধে রাজপুত দূর্গ রক্ষী সৈন্যদলকে অসম সাহসের সঙ্গে নেতৃত্ব দেন চিতোরের তৎকালীন নাবালক রানার গর্ভধারিণী রাজামাতা জহরবাঈ। তিনি রণক্ষেত্রে নিহত হলে বালক রাণাকে কৌশলে দূর্গ হতে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়। অতঃপর দুর্গে অবস্থানকারী সকল পুরুষ উৎসবের গেরুয়া বসন পড়ে দুর্গের বাইরে শত্রুর সঙ্গে প্রাণান্ত সংগ্রামে যোগ দেন এবং প্রত্যেকেই জীবন বিসর্জন দেন। ওদিকে দূর্গে তখনো যারা রয়ে গিয়েছিলেন সেই কয়েক হাজার মহিলা প্রাসাদের মধ্যে অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে তাতে ঝাঁপ দিয়ে রাজপুত জহরব্রত উদযাপন করেন। (কাকা আন্তনোভা, 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, পৃষ্ঠা-২৯৫) পরবর্তী কালে যা একটা প্রথা হয়ে দাঁড়ায়।

আমরা হত্যা, লুণ্ঠন এবং ইসলামে দীক্ষিত হওয়া বাধ্যকরণ আলোচনা করেছি। এখন নির্বাসন সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। কারণ ভারত ভাগের পর পরই বাংলাদেশে ও পাকিস্তান হতে হিন্দুদের নির্বাসন শুরু হয়ে যায়। অবশ্য এটিও ইসলাম মতে সুন্নত। পবিত্র হাদিসে বলা হয়েছে, "মুসলমান অধ্যুষিত কোন শহরে জিম্মিদের বসবাস করার অনুমতি দেওয়া যাবে না। কারণ হাদিসে উল্লেখ আছে, নবী তাদেরকে মদিনা থেকে তাড়িয়ে দেন এবং খলিফা আলী তাদেরকে কুফা থেকে বহিষ্কার করেন। কোন মুসলমান শহরে অমুসলিমদের বাড়ী থাকলে তা বিক্রি করতে বাধ্য করতে হবে। কোন সিনাগগ, গীর্জা বা মন্দির নির্মাণের অনুমতি দেওয়া যাবে না। মুসলমানরা যদি অমুসলিম অধ্যুষিত কোন শহর প্রয়োজন মনে করে তবে তথাকার সব উপাসনালয় ধ্বংস করে দিতে পারবে। (মজিদ খাদ্দুরী, মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন, পৃ-২৯৯ এবং মাওয়াদী, কিতাব আল-আহকাম, পৃ- ৯৯-১০১) এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই রমনা কালী বাড়ী, পূর্ববঙ্গ সারস্বত সমাজ সহ শত শত মন্দির ধ্বংস করা হয়।

এক্ষণে 'দাস' সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা যেতে পারে। অমুসলিম এলাকায় হানা দিয়ে পুরুষদের বন্দী করে তাদের 'দাস' হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। "যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যে সব পুরুষ বন্দীকে আনা হয়, তাদের সবাইকে হত্যা করা বা মুসলমানদের মধ্যে তাদেরকে 'দাস' হিসাবে ভাগ করে দেওয়া — এর কোনটা ইমামের উচিত

এমন প্রশ্নের উত্তর বলা হয়েছে, ইসলাম শাসিত এলাকায় তাদের নিয়ে গিয়ে যোদ্ধাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া বা যুদ্ধরত এলাকায় তাদের হত্যা করা — এ দু'টোর যে কোন একটা পন্থা ইমাম গ্রহণ করতে পারেন। (আবু ইউসুখ, কিতাব আল খারাজ পৃ- ১৯৬, সারাকসী মবসুত ভলিউম-১০ পৃ- ৩৭, মজিদ খাদ্দুরী, মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন, পৃ- ১০৬) এই দু'টি পন্থার মধ্যে কোনটি উৎকৃষ্ঠ, এমন প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে, "মুসলমানদের সুবিধার্থে পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই ইমামের উচিত। তাদের হত্যা করা যদি মুসলমানদের জন্য সুবিধাজনক হয় তাহলে হত্যা করা উচিত। তারা যদি মুসলমান হয়ে যায় তাহলে ইমামের উচিত হবে না তাদেরকে হত্যা করা। তাদের তখন যুদ্ধলব্ধ মাল হিসাবে গণ্য করা হবে এবং তা মুসলমানদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে। (তারাবি, কিতাব, ইখতিলাক -পৃ-১৪৪)

কোন মুসলমান ভৃত্য তার অমুসলমান প্রভুকে হত্যা করা ইসলামে বৈধ এবং সে যদি প্রভুর সব মাল পত্র নিয়ে ইসলাম অধ্যুষিত এলাকার ফিরে আসে তাহলে তার নিয়ে আসা সমস্ত সম্পত্তি তার নিজস্ব বলে গণ্য হবে। সে মুক্ত মানুষ বলে গণ্য হবে এবং তার বিরুদ্ধে কিছুই করা যাবে না। (আবু ইউসুফ, কিতাব আল-রাদ পৃ-১২৬, মজিদ খাদ্দুরী, মুসলমি আন্তর্জাতিক আইন, পৃ- ১৬৮)

যে কোন কারণেই হোক ইসলামের ফাঁদে যে কেউ একবার পা দিতে বাধ্য হলে আর ফিরে যাওয়ার সুযোগ নেই। "ইসলাম ত্যাগের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড" (আবু ইউসুফ, কিতাব আল খারাজ, পৃ- ১৭৯, আবু দাউদ সুনাম, ভলিউম-২ পৃ- ৮৪৮) স্বধর্ম ত্যাগীর সম্পত্তি বিনা যুদ্ধে অসুমলিমদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সম্পত্তির মত বিবেচিত হবে। কোন মহিলা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করলে তাঁকে ফাঁসি না দিয়ে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা হবে। শাফেয়ী অবশ্য ভিন্ন মত পোষণ করেন। তার মতে, স্বধর্ম ত্যাগী মহিলা যদি পুনরায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে অস্বীকার জানায়, তবে তাকে হত্যা করতে হবে। (আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ- ১৭৯-৮৯, সারাকসী কিতাব সারাহ আল সীয়ার আল কবীর (হায়দ্রাবাদ), ভলিউম-৪, পৃ- ১৬২) পুরুষ বা মহিলা ভৃত্যও যদি ইসলাম ত্যাগ করে তাকেও হত্যা করতে হবে, যদি সে পুনরায় মুসলমান না হয়। কোন লোকের ইসলাম ত্যাগ ইসলাম অনুমোদন করে না। তাকে হয় ইসলামে ফিরে আসতে হবে অথবা তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। জিম্মিরা যেভাবে জিজিয়া কর প্রদান করে, তার কাছ থেকে তা-ও গ্রহণ করা হবে না। কিন্তু কোন মহিলা পুনরায় মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত বন্দী রাখা হবে এবং মুসলমান হতে বাধ্য করা হবে। (মজিদ খাদ্দুরী, মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন, পৃষ্ঠা- ২১৯) ইসলাম ত্যাগীকে ভৃত্যে পরিণত করা হবে না। তাকে অবশ্যই ইসলামে ফিরে আসতে হবে। অথবা তাকে হত্যা করতে হবে। দার-উল ইসলামে তার বসবাস করার প্রশ্নই উঠে না। (ঐ, পৃ- ২২৮-২২৯) ইসলাম ত্যাগী যে কেউ পুনরায় ইসলামে ফিরে না আসলে কোন পূর্ব

কোন মুসলমানকে কোন অমুসলমান টাকা ধার দিলে তার দাবী ছেড়ে দিতে হবে, দেনাদারকে এ টাকা শোধ দিতে হবে না। (সারাকসী মবসুত, ভলিউম-১০, পৃ-৬৭, মজিদ খাদ্দুরী, আন্তর্জাতিক আইন, পৃ-১৭২) কোন মুসলমান কোন মুস্তামিনের হাত কেটে ফেললে বা হত্যা করলে তার কোন শাস্তি হবে না। (সারাকসী, কিতাব আল-সীয়ার-আল-কবীর (হায়দ্রাবাদ), ভলিউম-৪, পৃ- ২৩৯) কোন মুসলমান ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করলে তাকে প্রথমে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানানো হবে। তাকে হয় তা গ্রহণ করতে হবে অথবা সময় প্রার্থনা করতে হবে। সময় প্রার্থনা না করলে তৎক্ষণাৎ তাকে হত্যা করতে হবে। যদি সময় চায়, তাহলে তাকে সর্বোচ্চ তিন দিনের সময় দেওয়া যাবে। কোন মুসলমান অন্য যে কোন ধর্মে গেলে তাকে অবশ্যই ইসলামে ফিরে আসতে হবে অথবা ফাঁসি হবে। (আবুল ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ, পৃ-১৭৯-১৮০, মজিদ খাদ্দুরী, মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন, পৃ- ২০৪, ১৫৫, ২২১) বলা বাহুল্য আণ্ডার ওয়ার্ল্ড-এ জড়িত টেররদের ক্ষেত্রেই বর্তমানে এই নিয়ম প্রযোজ্য।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার মধ্যে আপনারা জেনেছেন, আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদের ধর্ম প্রচার করার পদ্ধতি। কোরানের সেই মহান বাক্যটি নিশ্চয় আপানদের স্মরণে আছে, "হে ঈমানদার লোকেরা, এই কাফেরদের সাথে লড়াই কর, যেন শেষ পর্যন্ত ফেতনা খতম হইয়া যায় এবং দ্বীন পুরাপুরি ভাবে আল্লাহরই জন্য হইয়া যায়।" (কো-৮/৩৯) পঞ্চাঙ্গ জিহাদের প্রথম ও পরম অঙ্গও এইটিই। এই পরম অঙ্গের সঙ্গে কাফের নিপাত, জিজিয়া চেপে ইসলাম ধর্মে বাধ্য করা, সম্পত্তি লুঠ এবং নারী ও শিশু লুঠ মিলিয়ে জেহাদের সর্বাঙ্গ সম্পন্ন হয়। সব অঙ্গের জন্যই হযরতের "সুন্না" আছে, তাও আপনারা ইতিমধ্যে জেনেছেন। এই পরম অঙ্গের অর্থাৎ জবরদস্তি ইসলাম প্রচারের আবার দু'টি দিক আছে (১) বিজিত দেশ, জাতি এবং গোষ্ঠীকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা ও (২) তা না করা গেলে তাদের হত্যা করা। এ কথাও আপনারা ইতিমধ্যে জেনেছেন। আধুনিক পণ্ডিতদের মধ্যে প্রচলিত মত এই যে, যারা মুসলমান ও হযরত মুহাম্মদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করত, মুসলমানরা শুধু তাদের বিরুদ্ধেই আক্রমণ করতো। এখানে বলে রাখা ভালো, মুস্তালিক গোষ্ঠি ও খায়বার গোষ্ঠীর সঙ্গে মুসলমান বা হযরত মুহাম্মদের কোন বিরোধ ছিল না। তারা মদিনা থেকে ১০০ মাইল দূরে বসবাস করতো। তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণের কারণ তারা ধর্মে অমুসলমান ও প্রচুর ধন সম্পদের মালিক। ভারতের ক্ষেত্রেও তা সমভাবে প্রযোজ্য।

আধুনিক পণ্ডিতদের আর একটি ফতোয়া এই যে, সামরিক দায় হতে অব্যাহতির জন্য জিজিয়া। কথাটি একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। হিদাইয়া মতে "মাথট কর (capitation tax) হচ্ছে কাফেরদের উপর চাপানো এক ধরনের শাস্তি, তারা জেদ করে কাফেরিকে আঁকড়ে ধরে আছে বলেই এই শাস্তি তাদের পাওনা। এই জন্যই কাফের যদি কোন লোক মারফত এই কর পাঠায় তবে তা গ্রাহ্য হবে না। কর গ্রাহ্য হবে তবেই, কাফের যদি অপমানিত ও লাঞ্ছিত ভাবে নিজে এসে তা প্রদান করে। কালেক্টর থাকবেন

বসে এবং কাফের ঐ করটা দেবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। একটি হাদিসে আছে, কালেক্টর তার গলা চেপে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলবেন, এই জিম্মি টাকা দে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে জিজিয়া কর হচ্ছে শাস্তি। এই করের হার সম্পর্কেও একটু বলা প্রয়োজন। সপ্তম শতাব্দীতে খলিফা ওমর যে কর হার ধার্য্য করেছিলেন, এক হাজার বছর পর আওরঙ্গজেব সেই হারটি পুনঃ নির্ধারণ করেন। আওরঙ্গজেবের পূর্বাপরে এই হার বেশী ছিল। আওরঙ্গজেব মূলতঃ ইসলামী অনুশাসন মেনে চলতেন বলেই তিনি এই হারটা বজায় রেখেছিলেন। সেই হারটা হলো ধনীদের মাথাপিছু ৪৮ দিরহাম, মধ্যবিত্তের ২৪ দিরহাম এবং শ্রমজীবীদের ১২ দিরহাম। দিরহাম মানে রৌপ্য মুদ্রা। আমরা জানি, শায়েস্তা খানের আমলে টাকায় ৮ মন চাউল পাওয়া যেত। সে অনুপাতে ১ দিরহামে ৮ মন না হোক অন্ততঃ ৪ মন হলেও ১২ দিরহামে ৪৮ মন চাউলের সব পরিমান অর্থ একজন সবচেয়ে গরীব হিন্দুকে কর হিসেবে প্রদান করতে হতো। যে পরিবারে ১০ জন সদস্য তাকে ৪৮০ মন চাউলের সম পরিমান অর্থ একজন গরীব হিন্দুকেও প্রতি বছর পরিশোধ করতে হতো। এই অর্থ পরিশোধ করতে না পারার অর্থ তাকে ইসলামে দীক্ষিত হতে বাধ্য হওয়া এবং এই কর না দিতে পারার কারণেই ভারতবর্ষের কোটি কোটি লোক ইসলামে দীক্ষিত হতে বাধ্য হয়েছে। এই বাস্তব সত্যটা মেনে নিতে অনেকেরই বুক কাঁপে।

ধর্মের বিভিন্ন আচার আচরণের কারণেই ধর্মে ধর্মে বিভেদ হয়। ভারতীয়রা যুগ যুগ ধরে যা ধর্ম বলে মনে করে এসেছেন, মুসলমানের ধারণা থেকে তা পৃথক। বিধর্মী হত্যা, তাদের মেয়ে-বৌ-সহায় সম্পত্তি লুঠ করাকে ভারতীয়রা মনে প্রাণে ঘৃণা করেন। পক্ষান্তরে মুসলমানরা বিধর্মীর সম্পদ লুঠ করাকে পবিত্র কোরান মতে জায়েজ মনে করে। অন্যের উপাসনালয় ধ্বংস করা, অন্য ধর্মাবলম্বীদের জোর জবরদস্তি করে নিজ ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য করা, গ্রন্থাগার ধ্বংস করা, ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়া ইত্যাদি ভারতের অমুসলমানরা ঘৃণা করলেও মুসলমানদের নিকট তা বেহেস্তে যাবার চাবিকাঠি।

মুসলমানরা এদেশে আসার আগে এদেশের রাজাদের মধ্যেও যুদ্ধ হতো। সেই যুদ্ধের সময় অনেক নিয়ম কানুন মানা হতো। সেই সব আইন কানুন কেমন ছিল মহাভারত থেকে তার আভাস পাওয়া যাবে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শুরু হবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ভীষ্ম যুদ্ধের কিছু আইন কানুন ঘোষণা করেন, যা পূর্বাপর ভারতীয় রাজারা মেনে চলতেন। ভীষ্মপর্বের প্রথম অধ্যায়ে, ২৭-৩২ নং শ্লোকে সেই সব আইন কানুন বলা হয়েছে। যেমন —

(১) সন্ধ্যা বেলা যুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষিত হলে কোন রকম বৈরিতা থাকবে না, সকলের মধ্যে প্রেম ভালবাসা অক্ষুন্ন থাকবে।

(২) যে ব্যক্তি বাগ্‌যুদ্ধে রত রয়েছে, তার সাথে শুধু বাগ্‌যুদ্ধই করতে হবে।

(৩) রথীর সঙ্গে রথী, হাতী সওয়ারের সাথে হাতী সওয়ার, ঘোড়সওয়ারের

সাথে ঘোড়সওয়ার এবং পদাতিকের সঙ্গে পদাতিকরাই যুদ্ধ করবে।

(৪) যার যেমন যোগ্যতা, ইচ্ছা, উৎসাহ এবং বল তার সাথে সেই রকম প্রতিপক্ষই যুদ্ধ করবে এবং এ ব্যাপারে প্রতিপক্ষকে আগে থেকে সাবধান করবে।

কোন কোন ব্যক্তি অবধ্য সে ব্যাপারে নিয়ম হল —

(১) যে সৈন্যবাহিনী থেকে বাইরে গিয়েছে,

(২) যে ব্যক্তি অসাবধান বা অপ্রস্তুত রয়েছে,

(৩) যে ব্যক্তি যুদ্ধ দেখে ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়েছে,

(৪) যে সৈনিক এক জনের সাথে যুদ্ধে রত রয়েছে,

(৫) যে বশ্যতা স্বীকার করেছে,

(৬) যে পিঠ দেখিয়ে পালাচ্ছে, এবং

(৭) যার অস্ত্র ভেঙ্গে গিয়েছে বা কবচ কেটে গিয়েছে তারা সকলেই অবধ্য।

এছাড়া রথের সারথী, অস্ত্রবাহক এবং ভেরী ও শঙ্খ বাহকরাও অবধ্য। যুদ্ধ শুধুই সামরিক বাহিনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। দুই রাজার সৈন্যদের মধ্যে যখন যুদ্ধ হত তখন অসামরিক সাধারণ প্রজারা যুদ্ধ দেখতে চর্তুদিকে জড়ো হতো।

কিন্তু মুসলমানরা যখন ভারত আক্রমণ করল তখন তারা কোন নিয়ম নীতির ধার ধারলো না। লক্ষ লক্ষ পরাজিত হিন্দু সৈন্যকে কেটে রক্ত গঙ্গা বইয়ে দিল। লক্ষ লক্ষ অসামরিক নিরীহ প্রজাকে হত্যা করে মৃত মানুষের পাহাড় তৈরী করল। এইসব ঘটনা থেকে এটাই পরিষ্কার হয় যে, অত্যন্ত সুসভ্য হিন্দু সংস্কৃতির পরিবেশে লালিত পালিত হবার ফলে এদেশের রাজাদের পক্ষে মুসলমানদের চরিত্রই বুঝে উঠা সম্ভব হয়নি। এদেশের রাজারা যুদ্ধের মধ্যেও শিষ্টাচারের কথা ভাবতেন। রাজা যুধিষ্ঠির কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শুরুর আগের দিন রাতে কৌরব শিবিরে গিয়ে সকল গুরুজনদের প্রণাম জানিয়ে এসেছিলেন। তখন কেউ তাকে বাধা দেয়নি বা বৈরিতা করেনি। ভারতীয় রাজারা বুঝতে পারেননি যে, মুসলমানরা এই সব শিষ্টাচারের ধার ধারে না। মুসলমানের যুদ্ধ কোন সামরিক যুদ্ধ নয়, কোরানের কাফের নিধনের তত্ত্ব দ্বারা চালিত হানা যুদ্ধ। কৌরব না হয়ে মুসলমান হলে কুরুক্ষেত্রের ঐ পরিস্থিতিতে কুরুরা রাজা যুধিষ্ঠিরকে পণবন্দী করে পাণ্ডব সৈন্যদের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করতো।

আমরা দেখেছি মহর্ষি চার্বাক বেদকে স্বীকার করতেন না। এমনকি ঈশ্বরেও বিশ্বাস করতেন না। তাঁর তত্ত্ব ছিল, "যত দিন বাঁচ সুখে বাঁচবে, প্রয়োজনে ঋণ করে ঘি খাও।" তাঁর সূক্ষ্ম যুক্তির কারণে ভারতীয়রা তাঁকে ঋষি বলে মান্য করেন। পরমত শ্রদ্ধা হিন্দু ধর্মের একটি অঙ্গ। ইসলামে পরমত শ্রদ্ধা বলে কিছু নেই। এ কারণেই বিন কাশিম এবং সুলতান মাহমুদ থেকে ভারতে যত মুসলমান শাসক ছিলেন, তারা প্রত্যেকেই মন্দির ধ্বংস করেছেন, লুঠপাট করেছেন, ভারতীয়দের জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করে মুসলমান করেছেন। যারা রাজি হননি তাদের হত্যা করেছেন। জোর করে হিন্দু মেয়ে ধরে এনে হারেমে রেখেছেন। কখনো কখনো বিয়ে করেছেন। এতে বিভিন্ন

আলেম ও মাওলানাগণ এইসব কর্মকে পরম ধার্মিকতার কাজ বলে গুণকীর্তন করেছেন।

এই সমস্ত কর্মকে অনেকে আবার ভুল করে মধ্যযুগীয় বর্বরতা বলে চিহ্নিত করেন। আসলে তাও ঠিক নয়। ইসলামের শুরুতেই এ সমস্ত তাদের ধর্মীয় উপাসনার অঙ্গ বলে গণ্য হয়েছে এবং এখনো তা বহাল আছে। বাংলাদেশের কথা বলেছি, পাকিস্থান সৃষ্টির প্রাক্কালের কথাও কিছু বলেছি। অনেকে এগুলো অশিক্ষিত মূর্খ মুসলমানদের কাজ বলে মনে করেন। এ কথা ঠিক নয়। শিক্ষিত মুসলমানরাও তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। যেমন, ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগের জেহাদ ঘোষণার আগে ২৯শে অক্টোবর আমেরিকা সফরে গিয়ে ভাষণ দিয়েছিলেন বেগম শা নেওয়াজ। মুসলিম লীগের প্রতিনিধি হিসেবে পাঞ্জাব আইন সভার সদস্যা শা নেওয়াজ এবং মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য এ এইচ ইস্পাহানীও আমেরিকায় এসেছেন। যদিও সরকারী ভাবে তাদের উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্থানের যৌক্তিকতা মার্কিনীদের বুঝিয়ে বলা, কিন্তু সুযোগ করে তাঁরা জানিয়ে দিয়েছেন, পাকিস্থান যতদিন ভূমিষ্ঠ না হবে ততদিন দাঙ্গা অবশ্যম্ভাবী এবং মুসলমানরা পাকিস্থানের জন্য সব কিছু করতে প্রস্তুত। (অমৃত বাজার পত্রিকা, ২৫.১০.১৯৪৬) মুসলিম লীগ তাদের পরিকল্পনা গোপন করেনি। পাকিস্থানের জন্য দেশের সর্বত্র দাঙ্গা বাধানো হবে। কোলকাতা ও নোয়াখালীর ঘটনাবলী পাকিস্থান বানাবার লক্ষ্যে ভারতব্যাপী যুদ্ধের একটা ছোট্ট প্রদর্শন মাত্র। "That the events in East Bengal were part of All-India battle for Pakistan."- V.P. Menon, 'Transfer of Power in India', p-320-21)

এরপর কি হল ..... "বৃটিশ শাসন রজ্জু একটু শিথিল হতেই মুসলমানরা রে রে করে হিন্দু প্রতিবেশীর ধন-জন-সম্ভ্রমের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। নোয়াখালীর ক্ষুদ্র দেহের বিভিন্ন অংশে তখনো হত্যা, লুণ্ঠন, গৃহদাহ, নারী নির্যাতিনের দগদগে ঘা ..... যারা পরাধীন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিন্দুমাত্র রক্তদান করেনি, তারা শুধুমাত্র ভিন্নধর্মী নিরপরাধ প্রতিবেশীর রক্ত ঝড়িয়ে ছয় মাসের মধ্যে একটা আলাদা রাষ্ট্র কায়েম করে ফেললো। ইতিহাসে এ এক নজিরবিহীন ঘটনা। ...... হিন্দুদের তখন আছি কি নাই, থেকেও নাই, কেন আছি, কেন নাই, কখন আছি কখন নাই, কোথায় আছি, কোথায় যাই এমনই এক শূন্য মানসিকতা; যা বোঝা যায় কিন্তু বোঝানো যায় না। ...... হিংসা ও তাণ্ডবের প্রথম ধাক্কায় যারা মাতৃভূমি থেকে উৎখাত হয়েছে, তারা পিছন ফিরে তাকাবার, চোখের জল ফেলার অবকাশ পায়নি। আতঙ্কে বিভীষিকায় বীভৎসতায় তাদের অশ্রু শুকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন কিঞ্চিৎ শান্ত অবস্থার মাঝেও ক্রমে ক্রমে দু'টি একটি করে পরিবার চোখের জল মুছতে মুছতে অনিশ্চিতের পথে পাড়ি দিচ্ছে। সাত পুরুষের ভিটে মাটির সঙ্গে তারা নাড়িচ্ছেদের মর্ম বেদনা অনুভব করছে। হিন্দুদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, এ দেশের অন্ন জল তাদের ফুরিয়েছে। নূতন রাষ্ট্র নূতন জামানায় তারা অসহায় অবাঞ্ছিত অরক্ষিত। এমন সাধের স্বাধীনতার স্বাদ রক্তে ও

চোখের জলে মাখামাখি হয়ে তাদের কাছে নোনতা বিস্বাদ হয়ে গেল। ...... পৃথিবীর কোন মুসলমান দেশেই অন্য ধর্মাবলম্বীদের স্থান হয়নি। তাদের মেরে কেটে মুসলমান করেছে, নাহয় দেশ ছাড়া করেছে। পাকিস্থানেও তার অন্যথা হবে না। তারা ধুতি আর লুঙ্গি এক সাথে থাকতে দেবে না। হয় ধর্ম ছাড়ো, না হলে দেশ ছাড়া করবেই। (ড. দীনেশচন্দ্র সিংহ, পূর্ববঙ্গের কবিয়াল, কবি-সঙ্গীত, পৃ- ১০-১১)

কবি নকুলেশ্বর সরকার সে সময় পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ড. দীনেশ চন্দ্র সিংহকে নিয়ে একটি কবিতা লেখেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে লেখেন —

"বঙ্গ বিভাগ হওয়ার ফলে — সকল গেল রসাতলে
যবনিকার অন্তরালে — ডুবে গেল দেশ
বাংলা পড়লো পাকিস্থানে — রাষ্ট্র পেল মুসলমানে
দেশ বরেণ্য কবি গানে — ভাটা পড়ে যায়।
পড়ে পাকিস্থানের হাতে — দেশ বিভাগের সাথে সাথে
স্বনাম ধন্য কবি যত — কেউ জীবিত কেউ বা মৃত
সবাই হয়ে বাস্তুচ্যুত — করে পলায়ন।
প্রাণ বাঁচাবার অভিলাষে — পশ্চিমবঙ্গে ছুটে আসে
ঘৃণ্য যাযাবরের বেশে — করেন কালযাপন।।
এসেছি এই তরজার দেশে — তরজা তারা ভালবাসে
কবিদের এই কাব্যরসে — তুষ্ট হয় না মন।"

এই হল ভারত উপমহাদেশে তথা বিশ্বে ইসলামী শান্তির সংক্ষিপ্ত কথা। স্বামী বিবেকানন্দ যার সংজ্ঞা দিয়েছেন এ ভাবে —

"প্রশান্ত মহাসাগর হইতে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত ব্যাপক এলাকায় দীর্ঘ পাঁচশত বছর ধরিয়া পৃথিবীতে যে রক্তের বন্যা বহিয়া গিয়াছে, ইহাই মুসলমান ধর্ম। "(স্বামী বিবেকানন্দ রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ- ১২৫)

নিরপেক্ষ বলে কোন শব্দ ইসলামে নেই; পরমত সহিষ্ণুতা বা শ্রদ্ধা তো নেই-ই। কাফেরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করতেও আল্লাহ্ নিষেধ করেছেন। সর্বশক্তিমান এবং পবিত্র আল্লাহ্ বলছেন —

"অতএব হে নবী, কাফের লোকদের কথা কস্মিণকালেও মানিও না। (কো- ২৫/৫২)" হে ঈমানদারগণ ঈমানদার লোকদিগকে ত্যাগ করিয়া কাফেরদিগকে নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না।" (কো ৪/১৪৪) "যে সব লোক আমাদের আয়াত মানিয়া লইতে অস্বীকার করিয়াছে তাহাদিগকে নিঃসন্দেহে আমরা আগুনে নিক্ষেপ করিব। যখন তাহাদের চামড়া গলিয়া যাইবে, তখন তদস্থলে অন্য চামড়া সৃষ্টি করিয়া দিব,

যেন তাহারা আযাবের স্বাদ পুরোপুরি গ্রহণ করিতে পারে। (কোরান- ৪/৫৬) "নিঃসন্দেহে তোমরা ও তোমাদের সেই সব মা'বুদ (দেব দেবী) যাহাদের তোমরা পূজা-উপাসনা করিতে জাহান্নামের ইন্ধন (জ্বালানি) হইবে, তোমাদেরও সেইখানে যাইতে হইবে"। (কোরান-২১/৯৮)

কোরানের ৯/২৮ নং আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন যে, 'মূর্তি পূজারীরা অপবিত্র জীব'। কোরানের ২/২২১ নং আয়াতে বলা হয়েছে, ... একজন ঈমানদার ক্রীতদাস কোন উচ্চ বংশীয় মুশরিক (পুতুল পূজারী) অপেক্ষা অনেক ভাল।" কোরানের ৮/৫৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তালা'র নিকট যমীনের বুকে বিচরণশীল জন্তু-প্রাণীর মধ্যে নিকৃষ্ঠতম হইতেছে সেই সব লোক যাহারা মহাসত্যকে মানিয়া লইতে অস্বীকার করিয়াছে; পরে তাহারা কোন প্রকারেই তাহা কবুল করিতে প্রস্তুত হয় নাই।"

আজকাল অনেকেই ইসলামী রক্তলোলুপ ভাষ্যগুলোকে আধুনিকভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা চালান; যদিও তাদের মধ্যে কোরান হাদিসের উপর বিশেষজ্ঞের সংখ্যা কম। মূলতঃ ইসলামের ইতিহাস এতই স্বচ্ছ যে, এ নিয়ে বিতর্কের সুযোগ কম। হযরত মুহাম্মদ থেকে আজ পর্যন্ত পর্যাপ্ত সংখ্যক ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হয়েছে। কোরান হাদিস তো আছেই। প্রতিটি প্রামাণ্য পয়গম্বর জীবনীতে লেখা আছে, মূর্তিপূজা ও মূর্তি পূজারীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ এবং রাতের অন্ধকারে মক্কা থেকে সিরিয়াগামী বণিক দলের উপর আগ্রাসী হানাযুদ্ধ চালিয়েই ইসলামের জয় যাত্রা শুরু হয় এবং বদর যুদ্ধের মস্ত বড় সাফল্যের কারণে ঐ আক্রমণের ধারাটাই চিরস্থায়ী হয়ে দাঁড়ায়। আরব থেকে ভারত পর্যন্ত সর্বত্রই লুণ্ঠনের ইতিহাস। এমনকি সুলতান মামুদও ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেন শুধুমাত্র মূর্তি ধ্বংস ও লুণ্ঠনের জন্য। ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীও লুঠপাট ও মন্দির ধ্বংস করতেই বাংলা আক্রমণ করেন।

আর কাফের হত্যা? ৬২৭ খৃষ্টাব্দে মদিনার বাজারে ৮০০ জন মাত্র ইহুদির প্রাণ গিয়েছিল। ঐ সংখ্যাটা অতি সামান্য। কেউ যদি তাদের ঐ অপরাধের দিতে তাকিয়ে ঐ সামান্য সংখ্যাকে উপেক্ষা করতে চান, তাতে দোষ নেই। কিন্তু তিনি যেন মনে রাখেন ঐ ঘটনা ৬২৭ খৃষ্টাব্দে মদিনা বাজারেই শেষ হয়ে যায়নি; ইসলামের ইতিহাসে যুগ যুগ ধরেই তার অনুরণন চলছে এবং ভবিষ্যতে চলবে না এমন কথা কেউ জোর দিয়ে বলতে পারবে না; বরং কোরান হাদিস যতদিন থাকবে ততদিন এ কু-আদর্শ ফলে ফুলে পুষ্পিত হবে, তা যে কোন ব্যক্তিই জোর দিয়ে বলতে পারেন।

বাঙ্গালী সাংস্কৃতি ও উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী

"বস্তুত মুসলমান যদি কখনও বলে হিন্দুর সহিত মিলন করিতে চাই, সে যে ছলনা ছাড়া আর কিছু হইতে পারে, ভাবিয়া পাওয়া কঠিন .... হিন্দু মুসলমান মিলন একটি গালভরা শব্দ, যুগে যুগে এমন অনেক গালভরা বাক্যই উদ্ভাবিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ গাল ভরানোর অতিরিক্ত সে আর কোন কাজে আসে নাই।" — শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বাঙালী সংস্কৃতি ও উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী

ইদানিং বাঙ্গালী সংস্কৃতির ঢেউ চারদিকে আছড়ে পড়ছে। হিন্দু নয় মুসলমানও নয় আমরা বাঙ্গালী। এই হলো বাঙ্গালী সাংস্কৃতিক প্রবক্তাদের অভিমত। এ মতের প্রবক্তরা আরো বলেন, হাজার বছরের ঐতিহ্য এটি। কেউ আবার বলেন, এক বৃন্তে দু'টি ফুল হিন্দু মুসলমান। তারা আরো বলেন, এ দেশের মানুষ কোনদিনই সাম্প্রদায়িক ছিলেন না এবং এখনও নাই ইত্যাদি ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, তথাকথিত কিছু হিন্দু নামধারী অতি দুর্বল রাজনীতিক ও তাদের অনুজীবীরাই এই মতের আবিষ্কারক ও পৃষ্ঠপোষক। মুসলমানগণ কোনদিনও এই সম-নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না; আজও নেই।

১৯৪৬-এর সাধারণ নির্বাচনে অখণ্ড বাংলার কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী বলে পরিচিত মুসলমান প্রার্থীদের সকলের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। সেদিন বাঙালী সেন্টিমেন্ট বা বাঙালী সংস্কৃতির তত্ত্ব একেবারেই কোন কাজে আসেনি। ঐ নির্বাচনের আগে মুসলিম লীগ যে গোপন প্রচারপত্র বিলি করেছিল, সেটি পড়লেই এ কথার প্রমাণ পাওয়া যাবে। আসুন দেখি, কী লেখা হয়েছিল ঐ প্রচারপত্রে।

১৯৪৬-এর প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রস্তুতি পর্বে মুসলিম লীগ কর্তৃক প্রচারিত গোপন প্রচার পত্র।

(1) All Muslims of India should die for Pakistan.
(2) With Pakistan established whole of India should be conquered.
(3) All people of India should be converted to Islam.
(4) All Muslim kingdoms should join hands with the Anglo-American exploitation of the whole world.
(5) One Muslim should get the right of five Hindus, i.e., each Muslim is equal to five Hindus.
(6) Until Pakistan and Indian Empire is established, the following

steps should be taken : –

(a) All factories and shops owned by Hindus should be burnt, destroyed, looted and loot should be given to League Office.

(b) All Muslim Leaguers should carry weapons in defiance of order.

(c) All nationalist Muslims if they do not join League must be killed by secret Gestapo.

(d) Hindus should be murdered gradually and their population should be reduced.

(e) All temples should be destroyed.

(f) Muslim League spies in every village and district of India.

(g) Congress Leaders should be murdered, one in one month by secret method.

(h) Congress upper offices should be destroyed by secret Muslim Gestapo, single person doing the job.

(i) Karachi, Bombay, Calcutta, Madras, Goa, Vizagapatam should be paralysed by December 1946 by Muslim League volunteers.

(j) Muslim should never be allowed to work under Hindus in Army, Navy, Government services or private firms.

(k) Muslim should sabotage whole of India and Congress Government for the final invasion of India by Muslims.

(l) Financial resources are given by Muslim League. Invasion of India by Nizam communist, few Europeans, Khoja by Bhopal, few Anglo-Indians, few Parsis, few Christians, Punjab, Sind and Bengal will be places of manufacture of all arms, weapons for Muslim Leaguers invasion and establishing of Muslim Empire of India.

(m) All arms, weapons should be distributed to Bombay, Calcutta, Delhi, Madras, Bangalore, Lahore, Karachi, branches of Muslim League.

(n) All sections of Muslim League should carry minimum equipment of weapons, at least pocket knife at all times to destroy Hindus and drive all Hindus out of India.

(o) All transport should be used for battle against Hindus.

(p) Hindu women and girls should be raped, kidnapped and converted into Muslims from October 18, 1946.

(q) Hindu culture should be destroyed.

(r) All Leaguers should try to be cruel at all times to Hindus and boycott them socially, economically and in many other ways.

(s) No Muslim should buy from Hindu dealers. All Hindu produced films should be boycotted. All Muslim Leaguers should obey these instructions and bring into action by September 15, 1946.

[Collected by Shri Debajyoti Roy from: 'Stern Reckoning' – G.D.Khosla, Oxford University Press, N.D. – 110 001.]

১৯৪৬-এর আগে বা পরে বা আজও দু'একজন পত্র-পত্রিকায় বিবৃতি দেন অথবা সভা সমিতিতে দু'এক ছত্র অসাম্প্রদায়িক বক্তব্য রাখেন বটে; তবে তা নিতান্তই নানা স্বার্থ সিদ্ধির জন্য। কখনও নারী লোভে, কখনো বা সম্পত্তির লোভে। আবার কখনও ভোটের আশায়। মুসলমানরা যে বাঙ্গালী সংস্কৃতিকে মনে প্রাণে ঘৃণা করে তার প্রমাণ তাদের অতীত ও বর্তমান কার্যাবলীই। এ ব্যাপারে আলোচনার জন্য মুসলমানগণ হিন্দুদের কি চোখে দেখতেন, তা আলোচনা করতে পারি। ইতিমধ্যে আমরা অনেক কিছু জেনেছি। তাই এখানে কিছু সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি এ প্রবন্ধটিতে স্থান পাবে।

❑ বাংলাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী। ইনি বহু হিন্দু মন্দির ধ্বংস ও বহু হিন্দুকে ইসলামে দীক্ষিত হতে বাধ্য করেছেন। ঐতিহ্যবাহী নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়টিকে তিনি ১২০৫ খৃষ্টাব্দে ধ্বংস করেছেন এবং এর নয়তলা বিশিষ্ট দু'টি গ্রন্থাগার সহ চারটি গ্রন্থাগারের সব ক'টি ধ্বংস করে ফেলেন।

❑ সম্রাট গিয়াস উদ্দিনকে মুজাফফর শাম্স বলখি ৮০০ হিজরায় (১৩৯৭) একটি চিঠিতে বলেন যে, মুসলিম রাজ্যে বিধর্মীদের উচ্চপদে নিয়োগ করা একেবারেই উচিত নহে। গিয়াসউদ্দিন রাজ্যের সমস্ত উচ্চপদ হতে বিধর্মী হিন্দুদের অপসারিত করেছিলেন। চিনা দূতেরা লিখেছেন, বাদশাহের অমাত্য ও উচ্চপদস্থ কর্মচারী সকলেই মুসলমান। একজনও অমুসলমান ছিল না।

❑ জালালউদ্দিন সম্পর্কে বুকাননের বিবরণীতে আছে, তিনি অনেক হিন্দুকে জোর করে মুসলমান করেছিলেন। তার অত্যাচারে বহু হিন্দু কামরূপ পালিয়ে গিয়েছিল।

❑ শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ পাণ্ডুয়ায় (হুগলী জেলা) হিন্দুদের সূর্য ও নারায়ণের মন্দিরকে মসজিদ ও মিনারে পরিণত করেছিলেন এবং ব্রহ্মশিলা নির্মিত সূর্যমূর্তির বিকৃতি সাধন করে তার পৃষ্ঠে শিলালিপি খোদাই করিয়েছিলেন। পাণ্ডুয়ার পূর্বোক্ত মসজিদ এখন বাইশ দরওয়াজা নামে পরিচিত। এর মধ্যে

হিন্দু মন্দিদের বহু শিলাস্তম্ভ ও ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়।

❑ জালালুদ্দিন ফতেহ্ শাহ্ সম্পর্কে বিজয় গুপ্তের মনসা মঙ্গলে হাসান হোসেন পালায় লেখা আছে, হোসেনহাটি গ্রামের কাজী হাসান হোসেন হিন্দুদের উপর অপরিসীম অত্যাচার করতেন। ব্রাহ্মণদের নাগাল পেলে তারা তাদের পৈতা ছিঁড়ে ফেলে মুখে থু থু দিতেন।

❑ চৈতন্য ভাগবত হতে জানা যায় যে, হরিদাস মুসলমান হয়েও কৃষ্ণনাম করতেন। কাজী যখন তাকে নিরস্ত করতে পারলেন না, তখন তিনি হরিদাসের বিরুদ্ধে মুলুকপতির (অঞ্চলিক শাসনকর্তা) নিকট নালিশ করেন। মুলুকপতি বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও হরিদাস কৃষ্ণনাম ত্যাগ করে 'কলেমা' উচ্চারণ করতে রাজী হলেন না, তখন কাজীর আদেশে তাকে বাজারে নিয়ে গিয়ে বেত্রাঘাতে হত্যা করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। চৈতন্য ভাগবত হতে আরও জানা যায় যে, যবন হরিদাসকে যে সময় বন্দীশালায় প্রেরণ করা হয়েছিল, সে সময় বহু হিন্দু জমিদার সেখানে কারারুদ্ধ ছিলেন।

❑ জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল হতে জানা যায় যে, চৈতন্যদেবের জন্মের অব্যবহিত পূর্বে নবদ্বীপের নিকটবর্তী পিরল্যা গ্রামের মুসলমানরা গৌড়েশ্বরের কাছে গিয়ে মিথ্যা নালিশ করে যে, নবদ্বীপের ব্রাহ্মণেরা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। এ কথা শুনে গৌড়েশ্বর 'নবদ্বীপ উচ্ছন্ন' করতে আদেশ দিলেন। তার লোকেরা তখন নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের প্রাণবধ ও সম্পত্তি লুঠ করতে লাগলো এবং নবদ্বীপের মন্দিরগুলি ধ্বংস করে তুলসী গাছগুলি উপড়ে ফেলতে লাগলো। বিখ্যাত পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম এই অত্যাচারে সন্ত্রস্ত হয়ে সপরিবারে উড়িষ্যায় চলে গিয়েছিলেন।

❑ চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য চরিতামৃত ও চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক, উড়িষ্যার মাদলাপঞ্জী হতে জানা যাচ্ছে যে, হোসেন শাহ্ উড়িষ্যা আক্রমণ করে সেখানকার বহু দেব মন্দির ও দেব মূর্তি ধ্বংস করেছিলেন। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের প্রায় সমস্ত দেবমূর্তি তিনি নষ্ট করেন। চৈতন্যচরিত গ্রন্থগুলির রচয়িতারা কোন সময়েই বলেননি যে, হোসেন শাহ্ ধর্ম বিষয়ে উদার ছিলেন। বরং তাঁরা তার বিপরীত কথাই লিখে গেছেন। বৃন্দাবন দাস চৈতন্য ভাগবতে হোসেন শাহকে 'পরম দুর্বার যবন রাজা' বলেছেন। হোসেন শাহের অধীনস্ত আঞ্চলিক শাসনকর্তা ও রাজকর্মচারীদের আচরণ সম্পর্কে যে সব তথ্য পাই, সেগুলি হতেও হোসেন শাহের হিন্দু মুসলমানে সমদর্শন সম্বন্ধীয় ধারণা সমর্থিত হয় না। চৈতন্য ভাগবত হতে জানা যায় যে, যখন চৈতন্যদেব নবদ্বীপে হরিনাম সংকীর্তন করছিলেন তখন নবদ্বীপের কাজী কীর্তনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন এবং কেউ কীর্তন করলেই তার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে জাতি নষ্ট করবেন বলে শাসিয়ে দিয়েছিলেন।

- কাশ্মীরের বর্তমান শাহ্ হামজান মসজিদটি এক সময় হিন্দু মন্দির ছিল। দেওয়ালে ও সিলিং-এ তার প্রমাণ আছে।
- অবন্তীপুর ও মার্তণ্ড মন্দির দু'টোই মুসলমানদের আক্রমণে বিধ্বস্ত।
- থানেশ্বর হিন্দু তীর্থ ১০১১ সালে গজনীর সুলতান মাহমুদ ধ্বংস করেন।
- অমৃতসর মন্দির, শিখ জাগরণের ভয়ে ভীত জাহাঙ্গীর ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুদণ্ড দেন গুরু অর্জুনকে। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে আহম্মদ শাহ্ আবদালী মন্দিরটি ধ্বংস করেন।
- দিল্লীর কওয়াৎ-উল-ইসলাম মসজিদটি হিন্দু মন্দিরের উপর গড়ে উঠেছে। এর পিলারগুলি সেখানকার ২৭-টি হিন্দু জৈন মন্দির থেকে এসেছে।
- আলাউদ্দিন খিলজী ও আওরঙ্গজেবের হাতে ধ্বংস হয় কাশী বিশ্ববিদ্যালয় ও নানান মন্দির।
- কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির মুসলমানরা পরপর চার বার ধ্বংস করার পর সম্রাট আকবরের সময় পুনরায় গড়া হলে আওরঙ্গজেব সেটি ধ্বংস করেন এবং তৈরী করান মসজিদ।
- মথুরার দ্বারকাধীশ মন্দির ১০১৭ খৃষ্টাব্দে সুলতান মাহমুদ লুণ্ঠন করেন। দ্বিতীয়বার আক্রমণ করেন সেকেন্দার লোদী। ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে আওরঙ্গজেব মথুরা ধ্বংস করেন। লাল পাথরের মসজিদটি রূপ পায় তারই হাতে কংসের কারাগারের উপর।
- রাজস্থানের ওশিয়াতে মুসলমানরা ১৬-টি মন্দির ধ্বংস করে। ধ্বংসাবশেষ এখনো রয়েছে।
- চিতোর শহরটি ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে প্রথমে আলাউদ্দিন খিলজী, দ্বিতীয়বার বাহাদুর শাহ্ এবং তৃতীয়বার আকবর মন্দিরসহ সমগ্র শহর ধ্বংস করেন।
- বারোলীতে ৭-টি মন্দির ধ্বংস করা হয়, যার ধ্বংসাবশেষ এখনো আছে।
- আড়াই দিন-কা ঝোপড়া। এটি ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে মোহাম্মদ ঘোরী তৈরী করান। ১১৫৩ খৃষ্টাব্দে এটি সংস্কৃত কলেজ ও মন্দির রূপে বিশালদেব বিগ্রহ রাজা দ্বিতীয়বার তৈরী করেন। ফরমান এলো মোহাম্মদ ঘোরীর; আড়াই দিনের মধ্যে এটাকে তার প্রার্থনা সভা অর্থাৎ নামাজ পড়ার ঘর করে দিতে হবে। যেমন আজ্ঞা, তেমনি কাজ। এটি আড়াই দিনেই রূপ পেল মসজিদে। এর পিলারগুলি আজও হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি শোভিত। এমনকি হিন্দু স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন বলেও এটি স্বীকৃত। এখানকার হিন্দু দেব-দেবীরা স্থান পেয়েছে যাদুঘরে।
- মধ্য প্রদেশের আশরাফি মহল অতীতে ছিল একটি সংস্কৃত স্কুল; পরে হয়েছে মাদ্রাসা। তারপর ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে মাহমুদ শাহের সমাধি। এর প্রবেশ দ্বারের স্তম্ভে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন স্থাপত্যের নিদর্শন রয়েছে। হিন্দু রাজার আম দরবারই

রূপান্তরিত হয়েছে মসজিদে।

- ❑ মধ্য প্রদেশের জামে মসজিদটি এক সময় হিন্দু মন্দির ছিল।
- ❑ সাঁচিতে সম্রাট অশোকের ৮-টি স্তুপের ৫-টি আওরঙ্গজেব ধ্বংস করেন।
- ❑ সোমনাথ মন্দিরে ২০০০ জন পুরোহিত এক সঙ্গে পূজা অর্চনায় রত হতেন। পূজার জন্য এখানে গঙ্গা হতে জল এবং কাশ্মীর হতে ফুল আনা হতো। ১০২৬ খৃষ্টাব্দে সুলতান মাহমুদ মন্দিরে আঘাত হানে। মন্দির ধ্বংস হয়, লুণ্ঠিত হয় এর ধনরত্ন। বিধ্বস্ত হয় মন্দির, বিচূর্ণ হয় দেবতার বিগ্রহ। আওরঙ্গ জেবের হাতে ৫-ম বার বিনষ্টের পর ইন্দোরের রাণী অহল্যাবাঈ এটি পুনরায় নির্মাণ করেন।
- ❑ মহারাষ্ট্রের দৌলতাবাদ দুর্গটিও এক সময় শিব মন্দির ছিল। আলাউদ্দিন বাহমনী ১৪৩৫ খৃষ্টাব্দে এটিকে দুর্গতে রূপান্তরিত করে।
- ❑ ফা হিয়েন ও হিউয়েন সাঙ পুরুষপুরের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত পাণিনির জন্মস্থান স্বাত পরিদর্শন করেন। গান্ধার এবং পেশোয়ারে তারা প্রায় এক হাজার বৌদ্ধ মঠের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পান।
- ❑ সুলেমান কররানীর সেনাপতি কালাপাহাড় হিন্দু রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান এবং হিন্দু মন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংসের জন্য ইতিহাসে কুখ্যাত হয়ে আছেন। কথিত আছে, ইনি প্রথম জীবনে হিন্দু ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং পরবর্তীকালে মুসলমান হয়েছিলেন বলে কিংবদন্তী আছে। কিন্তু এই কিংবদন্তীর কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। আবুল ফজলের আকবরনামা, বদাউনীর মন্তখর-উৎ-তওয়রিখ এবং নিয়ামতুল্লাহর মখজান-ই-আফগানী হতে প্রামাণিকভাবে জানা যায় যে, কালা পাহাড় জন্মসূত্রে মুসলমান ও আফগান ছিলেন। তিনি সিকান্দার সুরের ভ্রাতা ছিলেন। তার নামান্তর রাজু। শেষোক্ত বিষয়টি হতে অনেকে কালা পাহাড়কে হিন্দু মনে করেছেন। কিন্তু রাজু নাম হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচলিত। ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি নিহত হন। এই কালা পাহাড় পুরীর জগন্নাথ মন্দির, হাজো, কামাক্ষ্যা ও অন্যান্য স্থানের মন্দির ধ্বংস করেন।
- ❑ ফরাসী অধ্যক্ষ জ্যাঁল সিরাজ-উদ-দৌলার বন্ধু ছিলেন। তিনি তার সম্পর্কে যা লিখেছেন তার সারমর্ম হলো, "আলীবর্দীর মৃত্যুর পূর্বেই সিরাজ অত্যন্ত দুশ্চরিত্র বলে কুখ্যাত হয়েছিলেন। তিনি যেমন কামাসক্ত তেমনি নিষ্ঠুর ছিলেন। গঙ্গার ঘাটে যে সকল হিন্দু মেয়েরা স্নান করতে আসতো, তাদের মধ্যে সুন্দরী কেউ থাকলে সিরাজ তার অনুচর পাঠিয়ে ছোট ডিঙ্গিতে করে তাদের ধরে আনতেন। লোক বোঝাই ফেরি নৌকা ডুবিয়ে দিয়ে জলমগ্ন স্ত্রী-পুরুষ ও শিশুদের দুরবস্থা দেখে সিরাজ আনন্দ অনুভব করতেন। কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে খুন করতে হলে আলীবর্দী একাকী সিরাজের হাতে এর ভার দিয়ে নিজে দূরে

থাকতেন, যাতে কোন আর্তনাদ কানে না যায়। সিরাজের ভয়ে সকলের অন্তরাত্মা কাঁপতো ও তার জঘন্য চরিত্রের জন্য সকলেই তাকে ঘৃণা করতো।

- □ খাজনা দিতে না পারার কারণে মুর্শিদকুলি খাঁ বহু হিন্দু জমিদারকে স্ত্রী পুরুষ সহ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে বাধ্য করতেন। অনেক সময় মাথা নিচু ও পা উপরের দিকে করে তাদেরকে ঝুলিয়ে রেখে বেত্রাঘাত করা হতো। বিষ্ঠাপূর্ণ গর্তে তাদের ডুবিয়ে রাখা হতো। এই গর্তের নাম দেওয়া হয়েছিল 'বৈকুণ্ঠ'।
- □ ভারত চন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে কৃষ্ণচন্দ্রের লাঞ্ছনাকারী আলীবর্দীর বিরুদ্ধে অসন্তোষ ফুটে উঠেছে। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে লিখিত একখানি পত্রে কোম্পানীর একজন ইংরেজ কর্মচারী তার এক বন্ধুকে লিখেছিলেন যে, হিন্দু রাজা ও প্রজা সকল শ্রেণীর লোকই মুসলমান শাসনে অসন্তুষ্ট এবং মনে মনে তাদের দাসত্ব হতে মুক্তি লাভের ইচ্ছা পোষণ করে এবং এর সুযোগ সন্ধান করে।
- □ মীর কাশিম হিন্দু জমিদারদের সন্দেহের চোখে দেখতেন এবং অনেককে নির্মম ভাবে হত্যা করেন। ..... এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নবাব আলীবর্দী উড়িষ্যায় যে অত্যাচার করেছিলেন, হিন্দু ধর্মের উপর যে দৌরাত্ম্য করেছিলেন তা ভারতচন্দ্র কয়েকটি পংক্তিতে বর্ণনা করেছেন। "এই দুরাত্মা যবনের" দৌরাত্ম্য দেখে

নন্দী - মারিতে লইলা হাতে প্রলয়ের শূল
করিব যবন সব সমূল নির্মূল।।

কিন্তু শিব বারণ করলেন। বললেন, মারাঠারাই এই অত্যাচারের শাস্তি দেবে। কবির মতে মারাঠাদের অত্যাচার নবাবের দুষ্কৃতিরই ফল ঃ

লুঠিয়া ভুবনেশ্বর যবন পাতকী।
সেই তিন সুবা হইল নরকী।।

- □ পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার অন্তর্গত ত্রিবেনী ও পাণ্ডুয়া গ্রামে জাফর খাঁন গাজীর সমাধি ভবন ত্রয়োদশ শতকের শেষ ভাগে প্রাচীন হিন্দু মন্দির ভেঙে তারই বিভিন্ন অংশ খোদিত কারুকার্য জোড়া তালি দিয়ে নির্মিত হয়েছিল। ত্রিবেণীতে একটি বিশাল মসজিদের ধ্বংসাবশেষ আছে। এখানে হিন্দু মন্দিরের কারুকার্য খচিত ও মূর্তিযুক্ত বহু সংখ্যক ফলক পাওয়া গেছে।
- □ মালদহের আদিনা মসজিদের দু'পাশে যে খিলানগুলি আছে তা ৮ফুট চওড়া। হিন্দু মন্দির হতে উৎকৃষ্ট কারুকার্য খচিত স্তম্ভ খুলে নিয়ে এ সব তৈরী করা হয়েছে। আদিনা মসজিদের মধ্যে হিন্দু দেব-দেবীর অনেক পাথরের মূর্তি পাওয়া গিয়েছে।

পাণ্ডুয়ার একলাখী হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে তার উপকরণ দিয়ে এ সমাধি ভবন নির্মিত। এতে হিন্দু স্থাপত্যের নিদর্শন যুক্ত বহু প্রস্তর খণ্ড দেখতে পাওয়া যায় এবং তোরণের তলদেশে এক খণ্ড কাষ্ঠ পাথরে নির্মিত হিন্দু দেবতার মূর্তি খোদিত আছে।

মুর্শিদাবাদের নিকট মুর্শিদকুলি খাঁ ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে কাটরা মসজিদ নির্মাণ করেন।

অনেকগুলি হিন্দু মন্দির ভেঙে তার উপকরণ দিয়ে এই মসজিদ নির্মিত হয়।

ইতিহাসের এই সব ঘটনা পড়ে স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন —

"যারা হিন্দু ধর্ম ছেড়ে চলে গেছেন তাদেরকে আমাদের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে হবে, আর আনা যাবেও। অন্যথায় আমাদের সংখ্যা হ্রাস পাবে। যখন মুসলমানরা এদেশে এসেছিল, সেই সময়কার ইতিহাস থেকে জানা যায়, সেই সময় ভারতে হিন্দুর সংখ্যা ছিল যাট কোটি। এখন আমাদের সংখ্যা কুড়ি কোটির মত। এখন হিন্দু সমাজ থেকে যারা বেরিয়ে যাচ্ছে তারা শুধু হিন্দুর সংখ্যাই কমাচ্ছে না, তারা শত্রু বৃদ্ধিও ঘটাচ্ছে।"

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন —

" অতএব যদি মুসলমান মারে আমরা পড়ে পড়ে মার খাই, তবে জানব, এ সম্ভব করেছে শুধু আমাদের দুর্বলতা। ..... আমরা প্রতিবেশীদের কাছে আপীল করতে পারি 'তোমরা ক্রুর হোয়ো না, তোমরা ভাল হও, নর হত্যার উপরে কোন ধর্মের ভিত্তি হতে পারে না' - কিন্তু সে আপীল যে দুর্বলের কান্না।" (রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্ম শত বার্ষিক সংস্করণ, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃ- ৩৫৬)

কথাশিল্পী শরৎ চন্দ্র লিখেছেন —

"বস্তুত মুসলমান যদি কখনও বলে হিন্দু সহিত মিলন করিতে চাই, সে ছলনা ছাড়া আর কিছু হইতে পারে, ভাবিয়া পাওয়া কঠিন।" "হিন্দু-মুসলমান মিলন একটি গালভরা শব্দ, যুগে যুগে এমন অনেক গালভরা বাক্যই উদ্ভাবিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ গাল ভরানোর অতিরিক্ত সে আর কোন কাজেই আসে না।" - শরৎ রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, তৃতীয় খণ্ড, পৃ- ৪৭৩)

☐ পাকিস্থানের প্রত্যক্ষ জন্মদাতা গান্ধিজীর চিতাভস্ম সিন্ধুনদীতে বিসর্জন করার অনুরোধ জানালে পাকিস্থান স্পষ্ট জবাব দিয়েছিল, "এক কাফের কী রাখ (ভস্ম) সে হমে 'পাক' (পবিত্র) নদী না-পাক নহী করতি হ্যায়।"

☐ সিন্ধু প্রদেশের সুলতানকোটে মুসলিম লীগের অধিবেশনে গাওয়া গানে পাকিস্থান নির্মাণের পক্ষে তাদের মনস্কামনা ফুটে উঠেছে। গানের ভাবার্থ এই রকম, 'পাকিস্থানে ইসলামের স্বতন্ত্র কেন্দ্র / যেন নির্মাণ হয়। / পাকিস্থানে অমুসলমানের মুখ দেখার দুর্ভাগ্য / যেন আমাদের না হয় / মুসলিম রাষ্ট্রের ঘর সেদিনই / উজ্জ্বল হবে / যেদিন পাকিস্থানে মূর্তিপূজক কণ্টকদের অস্তিত্ব / নিঃশেষ হবে / হিন্দুদের অধিকার হল শুধু / গোলাম থাকার / এইসব গোলামদের রাজ্যশাসনে অংশগ্রহণে / কি অধিকার?

উপরোক্ত টুকরো টুকরো উদাহরণ থেকে মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির 'উজ্জ্বল' দৃষ্টান্ত ফুটে উঠেছে। এর ফলাফল কি হয়েছিল সে সম্পর্কে ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মতামত দেখা যেতে পারে। ড. মজুমদার বলেছেন, "বিংশ শতাব্দীতে হিন্দু মুসলমানের যে কাল্পনিক ভ্রাতৃভাবের প্রবল বন্যা ও উচ্ছ্বাস বয়ে

গিয়েছিল, তার সঙ্গে বাস্তব ইতিহাসের সমন্বয় করা কঠিন। হিন্দু ও মুসলিম বাংলাদেশে বরাবরই দু'টি সম্পূর্ণ পৃথক সম্প্রদায় ছিল। ধর্ম, সামাজিক আচার-ব্যবহার, সাহিত্য, শিক্ষা, শিল্প প্রভৃতির মধ্য দিয়ে উভয়ের সংমিশ্রণ তো দূরের কথা, কোন নিবিড় যোগসূত্রই গড়ে উঠেনি। তারা প্রতি গ্রামে ও শহরে বা পাশাপাশি গ্রামে এক সঙ্গে বাস করত; কিন্তু তারা এক পরিবার বা এক সমাজভুক্ত হয় নাই। তারা ছিল প্রতিবেশী মাত্র। এদের মধ্যে যেমন সচরাচর বৈরীভাব ছিল না, তেমনি ভ্রাতৃত্ব বন্ধনেরও কোন প্রমাণ নেই। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ব্যক্তিগত সৌহার্দ্য ও অকৃত্রিম বন্ধুত্বের নিদর্শন থাকলেও সাম্প্রদায়িক ভ্রাতৃত্ববোধ কখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি; বরং সর্ব বিষয়ে উভয়ের মধ্যে মৌলিক প্রভেদ এত গুরুতর ছিল যে, এর সম্ভাবনাও কেউ মনে করতো, এমন প্রমাণ নেই। বিংশ শতাব্দীর পূর্বে কেউ কল্পনাও করে নাই। পাকিস্থান কেন সৃষ্টি করা হয়েছিল, তা আলোচনা করলেই বাংলার হিন্দু মুসলমানের ভ্রাতৃত্বভাব সম্যকভাবে ফুটে উঠবে। কারণ, তখন বাংলার মুসলমানগণ বাঙ্গালী হিন্দুর সঙ্গে থাকতে চায়নি। অথচ এই বাংলা হতে হাজার মাইলের বেশী দূরত্বের একটি দেশের সাথে যোগ দিয়েছে। ধর্ম বিশ্বাস, ধর্মানুষ্ঠান, সামাজিক প্রথা, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে শুরু হতেই যে গুরুতর মৌলিক প্রভেদ ছিল সাত শত বছর একত্রে বাস ও বাংলার হিন্দু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করলেও তার বিশেষ হ্রাস হয়নি। বাঙ্গলাদেশে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে আহার, বিহার প্রভৃতি কোন প্রকার সামাজিক সম্বন্ধে মিল ছিল না; এখনো নেই। হিন্দুর ধর্ম বিশ্বাস, বহুদেবদেবীর মূর্তি গড়ে পূজা করা — মুসলমানরা এতে কেবল বিশ্বাসী ছিলেন না, তা-ই নয়; তাদের ধর্মমতই গড়ে উঠেছে মূর্তির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। তাদের ধর্মমতে হিন্দুর মন্দির ও দেব-দেবীর মূর্তি ধ্বংস করা পুণ্যের কাজ। বিংশ শতাব্দীর হিন্দু নেতারা রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ইহা স্বীকার না করলেও ইহা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক সত্য। মুসলিম পণ্ডিত আল বিরুণী একাদশ শতকের প্রথম ভাগে এই মৌলিক প্রভেদের উল্লেখ করে বলেছিলেন, "অন্য সকল জাতির মধ্যে যে সমুদয় বিষয়ের মতের ঐক্য আছে, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে তার সকল গুলোতেই মতের প্রভেদ। ধর্ম বিষয়ে এই মতানৈক্য চরমে পৌঁছিয়াছে। কারণ, আমরা যা বিশ্বাস করি, হিন্দুরা তা করে না এবং হিন্দুরা যা বিশ্বাস করে, আমরা তা বিশ্বাস করি না।"

নয় শত বছর পরে (১৯৩০) পাকিস্থান পরিকল্পনাকারী রহমৎ আলী এর প্রতিধ্বণি করে বলেছেন; হিন্দু ও মুসলমান দু'টি পৃথক জাতি। আমাদের ধর্ম, কৃষ্টি, ইতিহাস, প্রাচীন কিংবদন্তী (tradition) সাহিত্য, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, উত্তরাধিকার আইন, বিবাহ বিধি প্রভৃতির মধ্যে মূলতঃ প্রভেদ বিদ্যমান। দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি ব্যাপারেও এই প্রভেদ দেখা যায়। আমরা হিন্দু ও মুসলমানেরা পরস্পরের সঙ্গে আহার করি না, আমাদের মধ্যে বিবাহ শাদী হতে পারে না। আমাদের জাতীয় আচার ও প্রথা, বর্ষ গণনার রীতি, এমনকি খাদ্য ও পোযাক পরিচ্ছেদও পৃথক।" এই প্রভেদের উপর

ভিত্তি করে জিন্নাহর দ্বি-জাতি তত্ত্ব, রাজনীতি ও পাকিস্থানের জন্ম হয়েছে।

ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে মুসলিম শাসনে হিন্দুর যে জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা ছিল না, তা ঊনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু নেতৃবৃন্দের বক্তব্য থেকে পরিষ্কার। বিদেশী ইংরেজ শাসনের প্রতি বাঙ্গালী হিন্দুর কোন বিদ্বেষ ভাব ছিল না। উনিশ শতকের গোড়ায় প্রসিদ্ধ নেতা রাজা রামমোহন রায় ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ে অনন্যসাধারণ উদার মত পোষণ করতেন। কিন্তু তিনিও মুসলমান রাজ্যে হিন্দুদের উপর অত্যাচার অবিচার প্রভৃতির কথা উল্লেখ করে ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়েছেন যে, তিনি ইংরেজদেরকে ভারতে পাঠিয়ে হিন্দুদের নয় শত বছর ধরে মুসলমানদের লাঞ্ছনা ও অত্যাচারের হাত হতে উদ্ধার করেছেন।

দ্বারকানাথ ঠাকুরও প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেছেন যে, হিন্দুদের সর্ববিধ দুঃখ দুর্দশা ও অবনতির মূল কারণ মুসলমানদের রাজ্য শাসন নীতি। প্রসন্নকুমার ঠাকুরও বলেছেন, ভগবান যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি স্বাধীনতা চাও, না ইংরেজদের অধীন হয়ে থাকতে চাও, আমি মুক্ত কণ্ঠে ইংরেজদের অধীনতাই গ্রহণ করবো।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত ১৮৪০ সনে বিজ্ঞানদায়িনী সভায় বলেন, "যবন নৃপতিগণের অধীনে বাঙ্গালীরা যাদৃশ দুর্দশা সাগরে নিমগ্ন ছিল, তাহা স্মরণ করিতে হইলে কঠিন হৃদয় একেবারে বিদীর্ণ হইয়া যায়। ...... যবনাধিকারে এতদ্দেশীয় মনুষ্যগণ শান্তির সহিত প্রায় কখনই সাক্ষাতলাভ করেন নাই। ..... সে সময়ের কথা স্মরণ হইলে এখনো আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। কোন সময় কোন বিপদ ঘটিবে এই দুর্ভাবনাতেই দিবারাত্র শঙ্কিত থাকিত।"

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৪২ সনে 'মুসলমানরূপী পিশাচকর্তৃক বিবিধ অত্যাচারের' কথা বর্ণিত হয়েছে এবং ইংরেজদের প্রাদুর্ভাবে ৮০০ বছরের যে দুঃখ এদেশে সঞ্চিত হয়েছে তা ক্রমে দূরীভূত হচ্ছে, এরূপ মন্তব্য করা হয়েছে। ১৮৫০ সনে সর্বশুভকরী পত্রিকায় বলা হয়েছে, "এই দেশ যখন দূরন্ত যবন জাতি দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল তৎকালে ঐ দুর্বৃত্ত জাতির দৌরাত্ম্যে আমাদিগের সুখ সম্পত্তির একেবারেই লোকাপত্তি হইয়াছিল। .... দুশ্চরিত্র যবন জাতির ভয়ে স্ত্রীলোকদিগের প্রকাশ্য স্থানে গমনাগমন ও বিদ্যানুশীলন সম্পূর্ণ রূপে স্থগিত হইয়া গেল। সকলেই আপনাপন জাত প্রাণ কুলশীল লইয়া শশব্যস্ত। স্ত্রীজাতিকে বিদ্যাদান করিবেক কি, পুরুষদিগেরও শাস্ত্র আলোচনা মাথায় উঠিল। তদবধি স্ত্রীদিগের অন্তঃপুর নিবাস ও বিদ্যাভ্যাস নিরাশ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে জগদীশ্বরের কৃপায় আমাদিগের আর সে দুরবস্থা নাই, অত্যাচারী রাজা নাই। শুভদিন পাইয়া সকল শুভ কর্মেরও অনুষ্ঠান করিতেছি। আমাদিগের লুপ্তপ্রায় অন্যান্য সদ্ব্যবহার সকল পুনরুদ্ধার করিতেছি।"

১৮৭০ সনে সোম প্রকাশে লেখা হয়েছে, "মুসলমানদিগের রাজত্বকালে প্রজাদিগকে যে সমস্ত অত্যাচার ও পীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছিল, এক্ষণে ঐ সকল অত্যাচারের কথা শুনিলে হৃদকম্প উপস্থিত হয়। সিরাজ-উদ-দৌলার রাজত্বকালের কথা স্মরণ হইলে শরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়।" বলা বাহুল্য, এ উক্তিগুলি

মুসলমানদের ৮০০ বছরের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রতিক্রিয়া এবং উনবিংশ শতাব্দীর হিন্দুদের প্রাণের কথা।

এরূপ বহু উক্তি ঐ সময়ের নানা গ্রন্থে ও সাময়িক পত্রে দেখতে পাই। মুসলিম শাসনের ইতিহাস এবং উপরোক্ত উক্তিসমূহ পর্যালোচনা করলে একটি বিভীষিকাময় চিত্রই আমাদের সামনে ভেসে উঠে। হাজার বছর নয়, এখন থেকে মাত্র ৫০ বছর পূর্বেও হিন্দু-মুসলমানের মিলিত 'বাঙ্গালী সংস্কৃতি' বলতে কিছু ছিল না। তার প্রমাণ ১৯৪৫-৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে (পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি) মুসলিম লীগ ভোট পেয়েছিল ৮৬.৬ %। এমনকি এখনো যদি বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বাতিলের প্রশ্ন উঠে তাহলে ৯৮% মুসলমান এর বিরোধিতা করবে।

অতএব, বুঝতেই পারছেন তথাকথিত বাঙ্গালী সংস্কৃতি এদেশের সহজ সরল হিন্দু সম্প্রদায়কে ধোঁকা দেওয়ার একটা প্রো-ইসলামী কৌশল এবং এর মাধ্যমে হিন্দু পরিবার থেকে মেয়ে সম্পদ ও ভোট সংগ্রহ করে ইসলামের সুদূর প্রসারী লক্ষ্য ব্যস্তবায়নের অপকৌশল মাত্র; যার ফাঁদে পড়ে এদেশের হিন্দু সম্প্রদায় হাবুডুবু খাচ্ছে।

আল্লাহ্ অমুসলমানের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর

আল্লাহ মুসলমানদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল এবং অমুসলিমদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর।

ক) নবীজী মদিনায় হিজরত করার পর আল্লাহ পবিত্র কোরানে বললেন, "আমি কোন জনপদে নবী পাঠালে সেখানকার অধিবাসীদের দুঃখ ও ক্লেশ দ্বারা পীড়িত করি, যাতে তারা (নবীর প্রতি) বিনত হয়।"

খ) আল্লাহ মদিনার অমুসলমান ও মোনাফেকদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করতে বললেন।" (২/১১৬, ২২/৩৯)।

আল্লাহ্ আরও বললেন, —

গ) "তোমরা ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না আল্লাহর ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়।" (৮/৩৯)

ঘ) "ওরা নিকৃষ্ট জীব।" (৮/৫৫)

ঙ) "ওরা জন্তু জানোয়ারের মত।" (৭/১৭৯)

চ) "ওদের গর্দানে আঘাত কর।" (৪৭/৪)

ছ) "ওদের গলায় আঘাত কর।" (৮/১২)

জ) "ওদের হাত পা উল্টা দিক হইতে কেটে ফেল।" (৫/৩৩)

ঝ) "নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছে, অবশ্যই আমি তাদের আগুনে জ্বালাব; যখনই তাদের চামড়া জ্বলে পুড়ে যাবে, তখনই তা আমি পালটে দেব অন্য চামড়া দিয়ে, যাতে তারা শাস্তি আস্বাদন করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, হেকমতওয়ালা (শক্তিমান)।" (৪/৫৬)

খন্দক যুদ্ধের শেষে আল্লাহর রসুল অস্ত্র শস্ত্র সহ বনি কুরাইজাদের (ইহুদি) দিকে অগ্রসর হতে হুকুম জারি করলেন। মুসলমান বাহিনীকে আসতে দেখে বনি কুরাইজারা তাদের দুর্গে আশ্রয় নিল এবং নবী তাদের দুর্গ অবরোধ করলেন। দীর্ঘ এক মাস অবরোধের পর দুর্গের ভিতরে সঞ্চিত সমস্ত খাদ্য ও পানীয় শেষ হয়ে গেল এবং মুসলমান হলেও তারা তো মানুষ; হয়তো তারা ধন সম্পদ কেড়ে নেবে, প্রাণে মারবে না; এই যুক্তিতে কুরাইজারা নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করল। সক্ষম পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে নিরস্ত্র করে বন্দী করা হল এবং দুর্গ হতে সমস্ত ধন সম্পদ বাইরে এনে স্তূপীকৃত করে সাজানো হল। মহানবী সা'দ ইবনে মুয়াদ নামে এক ব্যক্তির উপর তাদের বিচারের ভার দিলেন। বিচারক রায় দিলেন, "সব পুরুষকে হত্যা করা হবে, নারী ও শিশুদের ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রি করা হবে এবং গণিমতের মাল হিসেবে মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।"

সেই দিন রাতেই মদিনার বাজারে ৮০০ জন লোককে মাটি চাপা দেবার মত এক বিশাল গর্ত খোঁড়া হল এবং পরদিন ফজরের নামাজের পরপরই কতল (হত্যা) পর্ব শুরু হয়ে গেল। পিছনে হাত বাঁধা অবস্থায় ৫ থেকে ৬ জন করে বন্দীকে আনা হতে থাকল এবং আলী ও নবীর এক চাচাত ভাই যুবায়ের তাদের গলা কেটে পরিখার মধ্যে ফেলতে লাগল। এইভাবে ৮০০ জন নিরস্ত্র ইহুদিকে ঠাণ্ডা মাথায় বীভৎস শিরচ্ছেদ প্রক্রিয়া সারাদিন ধরে সামনে বসে পর্যবেক্ষণ করে নবী তাঁর হিম্মতের পরিচয় দিয়েছিলেন।

হিজরীর ৬ষ্ঠ বছরে নবী যায়েদের নেতৃত্বে একটি ছোট বাণিজ্য কাফেলাকে সিরিয়ার দিকে পাঠালেন। কিন্তু পথে ফাজেরা গোত্রের লোকেরা তা লুঠ করে নিল এবং যায়েদ আহত হল। যায়েদ সুস্থ হলে নবী তাকে লোকজন সহ আবার সেখানে পাঠালেন। তারা বস্তিতে গিয়ে কাউকে পেল না। পেল উম্মে কিরফা নামে এক বৃদ্ধা এবং একটি বালিকাকে। মুসলমানরা উটের পায়ের সঙ্গে সেই বৃদ্ধার দুই পা বেঁধে চালিয়ে দিল এবং নির্মমভাবে সেই বৃদ্ধাকে হত্যা করল।

বুদ্ধিজীবী হত্যা

কবি আসমা

নবীজী মদিনায় প্রথম যার রক্তপাত ঘটালেন তার নাম কবি আসমা, একজন মহিলা বুদ্ধিজীবী। আউস গোত্রের মারোয়ান নামক ব্যক্তির মেয়ে তিনি। আসমা মুসলমানদের পছন্দ করতেন না। বদর যুদ্ধের পর তিনি কিছু বিদ্রূপাত্মক ছড়া লেখেন। লোকের মুখে মুখে তা মুহাম্মদের কানে পৌঁছালো। ওমর নামে একজন মুসলমান আসমাকে হত্যার দায়িত্ব নিল এবং একদিন রাতের অন্ধকারে সে আসমার শয়ন ঘরে প্রবেশ করল। আসমা তখন তাঁর শিশু সন্তানকে বুকে রেখে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলেন। ওমর প্রথমে শিশুটিকে দূরে সরিয়ে দিল এবং তারপর তার তরোয়াল আসমার বুকে আমূল বসিয়ে দিল। সে এত জোরে তরোয়াল চালিয়েছিল যে, আসমার দেহ

খাটের সঙ্গে বিদ্ধ হয়ে গেল। পরদিন সকালে ওমর মসজিদে এলে নবী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি মারোয়ানের মেয়েকে খতম করেছ?" ওমর বললেন, "হ্যা, তাতো করেছি। কিন্তু তার জন্য কি কোন ভয়ের কারণ আছে?" নবী বললেন, "মোটেও না, এই জন্য দু'টি ছাগলেরও দায় পড়েনি যে, তারা গুঁতোগুঁতি করবে।" তারপর নবীজী অন্যান্যদের ডেকে বললেন, "যদি তোমরা এমন একজন ব্যক্তিকে দেখতে চাও যে আল্লাহ্ ও তার রসুলকে সাহায্য করেছে, তবে এই হল সেই ব্যক্তি।"

কবি আবু আফাককে গুপ্ত হত্যা

উক্ত ঘটনার দু'এক সপ্তাহের মধ্যেই মুহাম্মদের নির্দেশে কবি আবু আফাককে গুপ্ত হত্যা করা হয়। কবি আফাক আমর গোত্রের ইহুদি ছিল এবং এক সময় মুসলমান হয়েছিল। কিন্তু নবীর সকল কাজে তার আনুগত্য প্রশ্নাতীত ছিল না। সে কারণে নবী একদিন তার সাহাবাদেকে ডেকে বললেন, "কে আমাকে এই বিরক্তিকর লোকটার হাত থেকে রক্ষা করতে প্রস্তুত?" এক সাহাবি দায়িত্ব নিল এবং একদিন আবু আফাক যখন উঠানে একটি চারপাই পেতে ঘুমাচ্ছিল, তখন তরোয়াল দিয়ে তাকে হত্যা করল।

কবি কাব বিন আশরাফ-এর গুপ্ত হত্যা

কবি কাব নাজির গোষ্ঠীর ইহুদি ছিলেন এবং এই গুপ্ত হত্যার ব্যাপারে স্যার উইলিয়াম ম্যুর বলেন, "I must not omit notice another of those dastardly acts cruelty which darken the pages of the Prophet's life". (The Life of Mahamet; Voice of India, 1992, p- 245) কাব-এর হত্যার ব্যাপারে নবী আগের মত একই পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। একদিন মসজিদে তাঁর অনুচরদের ডেকে বললেন, "এমন কোন ব্যক্তি আছে যে আমাকে আল আশরাফের ছেলের যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্ত করতে সক্ষম?" মামলামার ছেলে মহম্মদ জবাব দিল, "আমি আছি, আমিই তাকে খতম করব।" এক জ্যোৎস্না রাতে কবি কাবকে তার সৎভাই নয়লার দ্বারা ডেকে নিয়ে হত্যা করে মুহাম্মদের বাড়ীর কাছাকাছি এসে যখন আল্লাহ্ আকবর ধ্বনি দিল, নবী বুঝতে পারলেন, তারা কাজ হাসিল করে ফিরে এসেছে। মসজিদের দরজায় এসে নবী তাদের অভ্যর্থনা জানালেন। হত্যাকারীর দল তখন কবি কাব-এর কাটা মুণ্ডটা নবীর পায়ের কাছে রাখল এবং উৎফুল্ল নবী বললেন,

" I have been thus minute in the details of the murder of Ka'b, as it faithfully illustrates the ruthless fanaticism into which the teaching of the Prophet was fast drifting. ...... The strong religious impulse under which they acted hurried them into excesses of barbarous treachery, and justified that treachery by the interests of Islam and approval of the Deity." (Ibid, p- 248)

একবার নবীর কাছে খবর এলো সাফোয়ান বিন খালিদ নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে কোরৈশদের সাহায্যের জন্য সৈন্য সজ্জা করছে। খবর পেয়ে নবী আব্দুল্লাহ বিন ওনিসকে সেখানে পাঠালেন সাফোয়ানকে গোপনে হত্যা করার জন্য। যথারীতি আবদুল্লাহ সেখানে গিয়ে বিশ্বাস স্থাপন করল এবং তাদের বাহিনীতে যোগদান করল। এরপর একদিন সাফোয়ানকে নির্জনে একা পেয়ে হত্যা করে কাটা মুণ্ডুটা মদিনায় এনে নবীকে উপহার দিল।

নাজির গোষ্ঠীর ইহুদিদের মদিনা থেকে বিতাড়িত করার পর তারা খয়বরের ইহুদি বসতিতে গিয়ে বসবাস শুরু করল। আবু রাফে ছিল তাদের দলপতি। মহম্মদের নির্দেশে ৫ জনের এক গুপ্ত ঘাতক দল খয়বরে গিয়ে দিনের বেলা লুকিয়ে থাকল। রাতের অন্ধকারে আবু রাফের বাড়ীতে চড়াও হয়ে তাকে হত্যা করে আবার মদিনায় ফিরে এলো। আবু রাফেকে হত্যা করেও নবীজী দুঃশ্চিন্তামুক্ত হতে পারলেন না। খবর এলো নূতন দলপতি ইউসির খয়বরের মতই শক্তিশালী হচ্ছে। নবী ইবনে রাওহায়ার নেতৃত্বে ৩০ জনের একটি দলকে খয়বরে পাঠালেন। তারা ইউসিরকে বলল যে, নবীজি তাকে আনুষ্ঠানিক ভাবে খয়বরের শাসনকর্তা নিয়োগের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ইউসির রাজী হয়ে আবদুল্লাহ বিন ওনিসের উটে সওয়ার হলেন। কিছুদূর আসার পর পূর্ব পরিকল্পনা মত প্রথমে আব্দুল্লাহ পিছনে বসা ইউসিরকে হত্যা করল এবং অন্য মুসলমানরাও একইভাবে পিছনে বসা ইহুদিদেরকে হত্যা করল। সব শুনে নবী বললেন, "অবশ্যই আল্লাহ একজন নীতিহীনের হাত থেকে তোমাদের মুক্ত করেছেন।"

ধর্ষণ

যুদ্ধবন্দীদের সাথে যৌনক্রিয়া ইসলাম বৈধ ঘোষণা করেছে। হুনাইন সহ অন্যান্য যুদ্ধে যে সমস্ত নারী যুদ্ধবন্দী গণিমতের মাল হিসেবে নিয়ে আসা হয়, প্রথম দিকে সৈন্যরা সেইসব সধবা কাফের নারীদের ভোগ করতে সঙ্কোচ করে। তখন আল্লাহ বাণী অবতীর্ণ করলেন, "তোমরা দক্ষিণ হস্তে যাদের অধিকার করেছ তা বৈধ ও উত্তম জেনে ভোগ কর।" (কোরান-৮/৬৯)

হানা ও হামলা

হিজরীর সপ্তম মাসে আবু জাহেলের নেতৃত্বে ৩০০ জন কোরেশের একটি বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়া থেকে মক্কা ফিরছিল এবং মুহাম্মদ তাঁর চাচা হামজার নেতৃত্বে ৩০ জন মুহাজেরের একটি দলকে তাদের উপর হামলা করতে পাঠালেন। কিন্তু সম্ভব হল না। এর মাস খানেক পরে ৬২৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ২০০ জন কোরেশের আর একটি কাফেলা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে মক্কা ফিরছিল। মুহাম্মদ ৬০ জনের একটি দলকে ওবেদার নেতৃত্বে পাঠালেন হামলা করার জন্য। কিন্তু প্রতিপক্ষ অনেক বেশী শক্তিশালী হওয়ার জন্য ওবেদা হামলা না করে ফিরে আসে এবং ফিরবার পথে

ধরবে বলে প্রতিজ্ঞা করে। কিন্তু ফিরবার পথেও তারা বাণিজ্য কাফেলা লুঠ করতে পারেনি। ঐ বছরই গ্রীষ্ম ও শরৎ কালের মধ্যে নবী স্বয়ং ৩-টি অভিযান পরিচালনা করেন। গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সময়ে প্রথম অভিযানে তিনি আল আবোয়া পর্যন্ত ধাওয়া করেন। কিন্তু বাণিজ্য কাফেলাকে ধরতে না পেরে ফিরে আসেন। এর পরের মাসে তিনি ২০০ জনের একটি বাহিনী নিয়ে যাত্রা করেন। কিন্তু মুহাম্মদ পৌঁছাবার আগেই কাফেলা বিপদ সীমার বাইরে চলে যায়। এর দুই থেকে তিন মাস পরে মুহাম্মদ ১৫০-২০০ জনের একটি দল নিয়ে আবার যাত্রা করেন। খবর ছিল এক বিশাল কাফেলা নিয়ে আবু সুফিয়ান মক্কা থেকে সিরিয়ার দিকে যাত্রা করেছে। কিন্তু নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেখা গেল যে, মুসলমান বাহিনী পৌঁছবার বেশ কয়েক দিন পূর্বেই কাফেলা ঐ স্থান অতিক্রম করে চলে গেছে।

ঐ বছরই নভেম্বর মাসে নবীজী আট জনের একটি দলকে আব্দুল্লাহ্ বিন জাস-এর নেতৃত্বে অভিযানে পাঠালেন। দুইজন মদিনায় ফিরে আসে; বাকী ৬ জন নাখলায় পৌঁছে মাথা কামিয়ে নিরীহ তীর্থ যাত্রীর বেশ ধরে অপেক্ষা করতে থাকে। ইতিমধ্যে কোরেশদের বাণিজ্য কাফেলা নাখলায় পৌঁছালো। কোরেশদের দলে মাত্র ৪ জন লোক ছিল এবং আব্দুল্লাহর চালাকিতে তারা বিভ্রান্ত হয়ে রান্না ও খাওয়ার আয়োজন করতে শুরু করলেন। সেই দিনটি ছিল পবিত্র রজব মাসের শেষ দিন। রজব মাস সহ চার মাস আরবে যুদ্ধ বিগ্রহ ও রক্তপাত নিষিদ্ধ ছিল। এর পরও আব্দুল্লাহ্ তীর দিয়ে এক ব্যক্তিকে নিহত করলো। ওসমান ও হাকিম নামে দু'জনকে বন্দী করলো, চতুর্থ ব্যক্তি নওফল পালিয়ে যেতে সমর্থ হল। যথা সময়ে আব্দুল্লাহ্ দু'জন বন্দী ও বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে মদিনায় পৌঁছালে নবীজী খুশি হলেন এবং আল্লাহ্ পবিত্র মাসে রক্তপাতকে কোরানের আয়াত নাজিল করে সমর্থন করলেন। (২/২১৭) বন্দীদের ১ জন ১৬০০ দিরহাম মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়া পেলেন। অন্যজন মুক্তিপণ না দিতে পেরে ইসলাম গ্রহণ করে মদিনাতেই থেকে গেলেন। এরপর যায়েদের নেতৃত্বে সাফোয়ানের একটি বাণিজ্য কাফেলা লুঠ করে প্রায় এক লক্ষ দিরহাম পায়। নবীজীর অংশ বাদ দিয়ে প্রত্যেকে ৮০০ দিরহাম করে পায়।

মুক্তিপণ

ইদানিং মুক্তিপণের কথা প্রায়ই শোনা যায়। ব্যবসায়ী বা ছেলে-পুলে আটক রেখে সন্ত্রাসীরা মুক্তিপণ আদায় করে। তা না দিলে মেরে ফেলার ঘটনাও ঘটছে। বলা বাহুল্য, এর পথ প্রদর্শক আমাদের মহানবী স্বয়ং। পরম করুণাময় আল্লাহও মুক্তিপণকে সমর্থন করে কোরানে আয়াত নাজিল করেছেন। এমন একটি ঘটনা একটু আগেই বলা হয়েছে। নবীজী বণি তামিমের লোকজনদের আটক করে মুক্তিপণ আদায় করেছিলেন। বদরের হামলায় মুসলমানরা বেশ কিছু লোককে আটক করে প্রত্যেকের কাছ থেকে ১০০০ থেকে ৪০০০ দিরহাম আদায় করে। হানা দিয়ে আটক করে দাস-দাসী হিসাবে বিক্রয়ও তিনি করেছেন।

মুহাম্মদের ধর্ম প্রচার

সুদুর অতীত কাল থেকেই মক্কা ছিল আরব ভূমির ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র বিন্দু। এর নিয়ন্ত্রণ একটি ধর্মীয় শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে চললেও খ্রীষ্টান গোষ্ঠীর লোলুপ দৃষ্টি পড়ে মক্কা ও মদিনার উপর। ইতিমধ্যেই খ্রীষ্টধর্ম মধ্য প্রাচ্যের আশে পাশে বিস্তার লাভে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু আরব ভূমিতে তখনও কোন সফলতা লাভ করতে পারেনি। বিভিন্ন ভাবে মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে প্রচার প্রোপাগাণ্ডা করেও যখন সফলতা লাভ করা গেল না, তখন চেষ্টা চলল মক্কার মূর্তিপূজার কেন্দ্রীয় মন্দির যাকে এক সময় বলা হতো 'কেবলেশ্বর মন্দির'; যার আধুনিক নাম 'কাবা শরীফ' সেটি ধ্বংস করতে। এই কেবলেশ্বর মন্দিরের সমগ্র আরব ভূমির সকল গোষ্ঠীর পূজিত দেবতাদের স্থান দেওয়া হয়েছিল। ফলে সকল গোষ্ঠীর দেবতা স্থান পাওয়ায় এটি ছিল সকল গোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় মিলন মন্দির। দৈনন্দিন পূজা অর্চনা ছাড়াও এখানে অনুষ্ঠিত হতো দু'টি বড় ধর্মীয় উৎসব, যেখানে সমগ্র আরবে লোকেরা মিলিত হতেন এবং তা পরিণত হত মহামিলনে।

ইয়েমেন তখন আবিসিনিয়ার সম্রাট হাবসার অধীন। তিনি আবরাহা নামক এক ব্যক্তিকে ইয়েমেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। মক্কার কাবা সে সময় সমগ্র আরবের তীর্থক্ষেত্র ছিল এবং প্রতি বছর সেখানে লক্ষ লক্ষ লোক হজ্ব ব্রত পালন করতে আসত। এই দৃশ্য দেখে আবরাহার মনে ঈর্ষা জাগল। সে ইয়েমেনের এক বিশাল গীর্জা তৈরী করলো এবং সবাইকে কাবায় না গিয়ে সেখানে হজ্ব করতে আসার জন্য আদেশ জারী করলেন। কিন্তু আরবের লোকেরা তা মানতে পারলো না। উপরন্তু কয়েকজন আরব রাতের অন্ধকারে সেই গীর্জায় মল-মূত্র ত্যাগ করে এল। কিছু আরব আবার তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। এতে আবরাহা ভীষণ ক্ষেপে গেলেন এবং কাবা ধ্বংস করার প্রতিজ্ঞা করলেন। ষাট হাজার সৈন্য সমন্বিত বিশাল হস্তি বাহিনী নিয়ে তিনি মক্কায় উপস্থিত হলেন; কিন্তু সমগ্র আরবের লোকদের সম্মিলিত প্রতিরোধের ফলে কাবা ধ্বংস করা সম্ভব হল না। আবরাহার বহু সৈন্য হতাহত হল এবং বিরাট বাহিনী ফিরে যেতে বাধ্য হল। এই ঘটনাই পরবর্তীকালে হল কিংবদন্তী। কোরানের ১০৫ নং সুরার ১-৫ নং আয়াতগুলোতে আবরাহার বাহিনী ধ্বংসের কথা আছে।

খৃষ্টান সম্প্রদায়ের এত বড় উদ্যোগ ব্যর্থ হলেও মক্কা নিয়ে ষড়যন্ত্র কিন্তু থেমে থাকেনি। ভিন্ন পথে মক্কার মূর্তি পূজকদের মনোভাব বদলে খৃষ্টধর্ম প্রচারের প্রচেষ্টা শুরু করলেন। আবরাহার কাবা ধ্বংসের ব্যর্থ প্রচেষ্টার ৫৫ দিন পরে ৫৭০ খৃষ্টাব্দের ২৯শে আগস্ট সোমবার হযরত মুহাম্মদ জন্মগ্রহণ করলেন। শৈশবকাল থেকেই অনাথ হওয়ার ফলে তিনি চাচা আবু তালেবের পশু চড়াতে শুরু করেন এবং লেখাপড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। যখন তার বয়স বার বছর তখন আবু তালেব তাকে সঙ্গে নিয়ে সিরিয়ায় বাণিজ্যে যাত্রা করেন। পথে বসরায় নেস্তরীয়পন্থী খ্রীষ্টান বুহায়রা রাহিবের সঙ্গে তাদের দেখা হয়। সাধু বুহায়রা প্রথম আলোচনাতেই বুঝলেন, এমন একটি

বালকই তিনি এতদিন খুঁজছিলেন। তিনি মুহাম্মদকে নানা উপদেশ দিলেন এবং তিনি প্রথম দিনেই হযরত মুহাম্মদকে ভবিষ্যৎ নবী ঘোষণা করলেন।

এরপর খাদিজার কর্মচারী হিসাবে মুহাম্মদ পুনরায় সিরিয়ায় আসেন। এবারও সাধু বুহায়রার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটে। সাধু বুহায়রা অতীতে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে ধ্বংস প্রাপ্ত জনপদ সমূহের গল্প শোনান এবং বলেন যে, তারা এক ঈশ্বরের উপাসনা বাদ দিয়ে মূর্তিপূজা করার ফলে ঐসব সম্প্রদায় ধ্বংস হয়েছে। তিনি মুহাম্মদকে আরও জানান মক্কার লোকদেরকেও সর্তক করা দরকার। তা নাহলে মক্কার লোকেরা অচিরেই ধ্বংস হবে। সাধু বুহায়রা মুহাম্মদকে পূর্বেই নবী ঘোষণা করেছেন। এবার দায়িত্ব দিলেন মক্কার লোকদের মূর্তি পূজার ব্যাপারে সতর্ক করার। সাধু বুহায়রার কথা ইতিপূর্বেই নবীর মনে দাগ কেটেছিল। এবারে তাঁর বিশ্বাস হল, তিনিই নবী এবং নবী হিসেবে তাঁর দায়িত্ব মক্কাবাসীকে সতর্ক করবার। খ্রীষ্টানদের চক্রান্ত প্রাথমিকভাবে সফল হল। অন্ততঃ পুরোহিত পরিবারের একজনকে মক্কার মূর্তি পূজা বিরোধী তৈরী করা সম্ভব হল। এর আরও একটি কারণ হয়ত ছিল। মুহাম্মদ অভিজাত পরিবারের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন হওয়ায় প্রথমতঃ চাচার পশু চড়ানোর দায়িত্ব পান এবং যৌবনে অন্যের অধীনে চাকুরী করতে বাধ্য হন। খাদিজার কর্মচারী হিসাবে নবীজী খুব বিশ্বস্ততার পরিচয় দেন। ফলে মুহাম্মদের প্রতি খাদিজার এক বিশেষ অনুরাগ জন্মে। খাদিজার ইতিপূর্বে একাধিকবার বিবাহ হয়েছিল; কিন্তু কোন বিবাহেই তার দাম্পত্য স্বপ্ন পূরণ হয়নি। অসময়ে কিছুদিনের ব্যবধানে তারা সকলেই মারা যান, যার ফলে মুহাম্মদের মত টগবগে যুবকের মধ্যে তার দাম্পত্য জীবনের স্বপ্ন নূতনভাবে পূরণের স্বপ্ন রচনা করতে লাগলেন। এক সময় বিবাহ করতে সমর্থও হলেন। খাদিজা ছিলেন একে তো বিগত যৌবনা, দ্বিতীয়ত তিন তিনবারের বিধবা। আর মুহাম্মদ ছিলেন পঁচিশ বছরের টগবগে মূর্তি পূজক পরিবারের সুঠামদেহী যুবক। সাধারণত এই অসম বিবাহ এযুগে তো নয়ই সে যুগেও সম্ভব ছিল না। তবুও মুহাম্মদ বা তার আত্মীয় স্বজন কেন এ বিয়ে মেনে নিলেন, সেটাও ঐ একই কারণে। পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ ছেলে এবং খাদিজার অগাধ সম্পত্তি আছে বলে। এই বিবাহের ফলে তিনি আর অনাথ রইলেন না। তিনি আরবের একজন শ্রেষ্ঠ ধনী ব্যবসায়ীর স্বামী হিসাবে মানসিকভাবে স্বস্তিতে এলেন। এই পর্যায়ে তিনি সনাতনী রীতিতে পর্বতের গুহায় ধ্যানযোগে খোদার আরাধনায় রত হলেন এবং সেই সঙ্গে চলছিল সাধু বুহায়রার সঙ্গে ব্যাপক যোগাযোগ। সম্ভবত এরই কোন এক সময়ে মারিয়া নামে এক মিশরীয় খৃষ্টান তরুণীকে মুহাম্মদের পিছু লাগিয়ে দেওয়া হয়। এই মারিয়া মুহাম্মদকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করতে সমর্থ হন। মুহাম্মদ মক্কা ত্যাগ করা কালে এই মারিয়ার পিঠে পা রেখেই পাঁচিল টপকাতে সমর্থ হন। অনেকে মনে করেন, মুহাম্মদকে হত্যার ষড়যন্ত্র ফাঁস হওয়ার ফলে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে তিনি মক্কা ত্যাগ করেন। আসলে তা নয়, কেননা এর চার মাস পূর্ব থেকেই তিনটি উটকে বাবলা গাছের কচি পাতা খাইয়ে

তরতাজা করা হয়েছিল। ইতিপূর্বে মদিনা থেকে খাজরাজ গোত্রের দশ জন এবং আওস গোত্রের দুই জনের সঙ্গে আল আকাবা নামক স্থানে নবীজীর গোপনে মিটিং হয়। এটি আল আকাবার প্রথম শপথ নামে পরিচিত। দ্বিতীয় বছরে আবার মিলিত হলে তা পরিচিত হয় আল আকাবার দ্বিতীয় শপথ নামে। বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়, যা হচ্ছে পূর্ব পরিকল্পনা মতেই হচ্ছে। অতঃপর ৬২২ খৃষ্টাব্দে ২১শে জুন নবী মক্কা ত্যাগ করলেন।

মক্কায় অবস্থান কালে নবীজী খোদার ধ্যান করার সময়ে নবুয়ত প্রাপ্ত হন এবং তিনি প্রকাশ্যভাবে সকর্তবাণী প্রচারের অনুমতি প্রাপ্ত হন। প্রথম প্রথম আল্লাহ তার কাছে যেসব বাণী পাঠাতে লাগলেন, তা ঐ সতর্ক বাণী। এক আল্লাহর উপাসনা কর, তা না হলে চরম শাস্তি হবে এবং সে শাস্তি খুব শীঘ্রই আসবে। আরও সে সব বাণী তিনি প্রচার করলেন, মূর্তি পূজা ভীষণ ভাবে অন্যায়।

সৃষ্টি সম্পর্কে বললেন, —

১) আল্লাহ ৬ দিনে সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। (কোরান- ৩২/৪)

২) প্রত্যেক প্রাণীকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। (কোরান- ২৪/৪৫)

প্রথম মানব আদমকে আল্লাহ মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আবার অন্য আয়াতে বলা হয়েছে —

৩) "শয়তান আদম এবং ইভকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছেন। (কোরান- ৭/২৭)

৪) "আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে।" (কোরান- ৪/১, ৬/৯৮, ৭/১৮৯)

৫) ৬/২ নং আয়াতে বলেছেন, "আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন একটি প্রাণ থেকে।"

৬) ১৫/২৬ নং আয়াতে বলেছেন, "আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি পচা মাটির শুষ্ক গাড়া থেকে।"

৭) ৪০/৬৭ নং আয়াতে খোদা বলেছেন, "জমাটবদ্ধ রক্তপিণ্ড থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছি।"

৮) অন্য একটিআয়াতে (২১/৩১) আছে —"পাহাড় সৃষ্টি করেছি পেরেক রূপে, যাতে পৃথিবী হেলে না পড়ে।"

আল্লাহর দেওয়া এসব তথ্য তৎকালীন আরবের লোকেরা বিশ্বাস করতে পারেননি এবং মক্কাবাসীরা যে বিশ্বাস করতেন না, সেকথা আল্লাহ নিজেই বলেছেন। কোরানের ১৮/৫৬ নং আয়াতে আছে, "আর আমার আয়াত সমূহকে এবং যা দিয়ে তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে সেগুলোকে ঠাট্টা বিদ্রূপের বিষয়রূপে গ্রহণ করে থাকে।" অপর এক আয়াতে (১৫/৬) আছে, মক্কার লোকেরা নবীকে উন্মাদ পাগল মনে করতেন এবং প্রকাশ্যে বলতেনও।

প্রাণী জগৎ সম্পর্কে আল্লাহ ৬/১৪৩ নং আয়াতে বলেছেন, তিনি সৃষ্টি করেছেন

৮-টি নর ও মাদি, মেষের মধ্যে দুই প্রকার, উটের মধ্যে দুই প্রকার, ছাগলের মধ্যে দুই প্রকার এবং গরুর মধ্যে দুই প্রকার। সম্ভবত আরবের মরু এলাকায় এই চার প্রকারের প্রাণী এবং প্রত্যেক প্রাণীর দুই জাত ছাড়া ছিল না। কেননা, বাঘ, ভাল্লুক, সিংহ, গণ্ডার, জিরাফ, শিয়াল, কুকুর থাকলে আল্লাহর নলেজে আসতো এবং তা কোরানে নাজিল করতেন।

ফলের ব্যাপারেও তাই। পৃথিবীতে কত রকমের ফল আছে; কিন্তু আল্লাহ খেজুর, আঙ্গুর ও আনারস ছাড়া কোন ফলের নাম নেননি। বার বারই যখন ফলের প্রসঙ্গ এসেছে আল্লাহ ঐ তিনটি ফলের কথাই বলেছেন। আপেল, কমলা, লিচু, কলা, আম, আনারস, কাঁঠাল, পেয়ারা, পেঁপে সহ কত হরেক রকমের ফল আছে, যেগুলো আল্লাহ বেহেস্তবাসীদের খাবারের তালিকাতেও রাখতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহ এসব ফলের কথা বলেননি। আসলে মহাশক্তিধর আল্লাহ আরব এলাকার বাইরে পরিচিত ছিলেন না। যেমন কোরানের ১২/২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, "আমি কোরান আরবী ভাষায় নাযিল করেছি যেন তোমরা বুঝতে পার।" এখানে তিনি যে আরবদের বিষয় মাথায় রেখেই কোরান নাজিল করেছেন তা স্পষ্ট। আবার অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, আমি তো আদিষ্ট হয়েছি কেবল এ নগরীর প্রভুর এবাদত করতে। আল্লাহর এসব সীমাবদ্ধতার কথা চিন্তা করেই হোক বা অন্য কারণেই হোক, আরবের লোকেরা কোরানকে নবীর মনগড়া কল্পকাহিনী বলতেন। যেমন, ৮/৩১ নং আয়াতে দেখা যাচ্ছে, আরবের লোকেরা বলতেন, কোরানের আয়াতসমূহ পূর্ববর্তী লোকেদের কাহিনী ছাড়া কিছু নয় এবং আমরাও তা রচনা করতে পারি। ১৩/৩৮ নং আয়াতের শানে-নুযুল-এ বলা হয়েছে, তৎকালীন লোকেরা বলতেন যে, হযরত মুহাম্মদ সব সময় যে আযাবে এলাহির ভয় দেখায়। এখন তো বুঝা গেল যে, তার হাতে কিছু নাই। কোরান আল্লাহর কালাম হলে এতে সকাল বিকাল এত রদ-বদল হত না; বরং এটা তার নিজের বানানো। যখন মনে যা চায় তাই বলে দেয়। অপর এক আয়াতে (৭/১৮৪) দেখা যাচ্ছে, একবার নবী ছাফা পাহাড়ে উঠে কুরাইশদের এক এক গোত্রের নাম নিয়ে আলাদা আলাদা ভাবে ডাকতে লাগলেন এবং আল্লাহর শাস্তির ভয় দেখিয়ে ঈমান আনতে উদ্বুদ্ধ করতেন। এতে এক মালাউন মুসলমানদের বলল, তোমাদের সাথী কি পাগল হয়ে গেছে নাকি? সে সব সময় রাত দিন চিৎকার করছে কেন ? মুনাফেকরা এও বলেছিল, "এদেরকে বিভ্রান্ত করছে এদের ধর্ম।" (কোরান- ৮/৪৯)

কাফেররা নবীকে অবশ্য পাগল মনে করতো। এ সবের উত্তরও আল্লাহ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেছেন, কোরান মনগড়া কথা নয়; বরং তা পূর্বেকার গ্রন্থে যা আছে তার সমর্থন এবং বিশদ বিবরণ। (কোরান- ১২/১১) আল্লাহ এও বলেছেন, কোরানের কিছু অংশ দ্ব্যর্থহীন এবং স্পষ্ট। এই আয়াতগুলো হল কোরানের আসল অংশ। আর অন্য গুলো রূপক। (কোরান- ৩/৭) কোনগুলো আসল, আর কোনগুলো রূপক তা অবশ্য আল্লাহ বলে দেননি। আল্লাহ যতই বলুন, আরবের লোকেরা কিন্তু এগুলো

বিশ্বাস করতে পারেননি। যেমন ৯৩/৩ নং আয়াতের শানে-নুযুল-এ দেখা যাচ্ছে, "হযরত ইমাম আহমেদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, একবার সরওয়ারে কায়েনাথ হযরত মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ফলে এক দুই রাত তাহাজ্জুদের সময় উঠতে পারেন নাই। এসময় কয়েক দিন ওহী আসাও বন্ধ ছিল। হযরত জিব্রাইল (আঃ) আসছিলেন না। তাই কাফেররা বলাবলি শুরু করে দিল যে, আল্লাহ্ মুহাম্মদকে ছেড়ে দিয়েছেন। তাই সে আর রাত জাগছে না। এমনকি এক দুষ্ট কাফের মহিলা বলে ফেলল যে, "হে মুহাম্মদ তোমার সেই শয়তানটা কি এখন আর আসে না?" এই মহিলা শয়তান বলতে কাকে বুঝিয়েছেন? নিশ্চয়ই এমন কোন ব্যক্তি যিনি হযরত মুহাম্মদকে সাহচর্য দেন। বিভিন্ন ঐতিহাসিক এই শয়তান বলতে দু'টি লোকের প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করেছেন।

(১) খৃষ্টান সাধু বুহায়রা এবং

(২) তার প্রেরিত সলমন নামে এক অনুচর। যিনি ধর্ম ও ইতিহাস বিষয়ে সুপণ্ডিত ছিলেন।

এ বিষয়ে পাঠকদের খেয়াল রাখতে হবে যে, বাড়ী থেকে বিতাড়িত ভারতের রামমোহনকে দিয়ে খৃষ্টানরাই 'ব্রাহ্ম সমাজ' প্রতিষ্ঠা করিয়েছিলেন। ইরানে বাহাই ধর্মকে তারাই প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন। এ কথা প্রায় সবাই জানেন। একালের লাদেন বা সাদ্দাম তৈরীর পিছনেও খ্রীষ্টানদের হাত আছে বলে বিশ্ববাসী মন করেন। যাই হোক, আরববাসীরা যে এ বিষয়ে যথেষ্ট সজাগ ছিলেন, সে প্রমাণ কোরানেই আছে। আরববাসীর এসব কথা আল্লাহর কানে যাওয়া মাত্র তিনি এর উত্তরও পাঠিয়ে দেন। যেমন, আল্লাহ্ বলেছেন; "এ কোরান কোন বিতাড়িত শয়তানের বাক্য নয়। (কোরান-৮১/২৫) এতদসত্ত্বেও তারা আল্লাহর কথা মানতে পারলেন না। তারা আগের মতই ঠাট্টা বিদ্রূপ করতেন (কোরান- ৮/৩১) এবং বলতেন, কুরান তো পুরাকালের কল্পকথা। (কোরান- ২৫/৫) কারণ, নবী পুরাকালের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত বা জলোচ্ছ্বাসের ফলে ধ্বংস যজ্ঞকে এক আল্লাহ্ ছেড়ে বিভিন্ন দেবদেবী পূজা করার কুফল বলে বর্ণনা করতেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ জানতেন, ওসব প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফল। যেমন, কিছুদিন আগে ইরানে ভূমিকম্পে কয়েক লক্ষ মুসলমান মারা যায় এবং বাম নামে একটি শহর পরিপূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। ইন্দোনেশিয়ায় সুনামী আঘাত হেনে কয়েক লক্ষ মুসলমানকে হত্যা করে। পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে ভূমিকম্পের আঘাতে প্রায় এক লক্ষ মুসলমান নিহত হয়। এখন যদি কেউ এগুলোকে বায়ু বা সমুদ্র দেবতার পূজা ছেড়ে আল্লাহর উপাসনার ফল বলে বর্ণনা করেন, তাহলে যুক্তিবাদীরা অন্ততঃ তা বিশ্বাস করবেন না।

এদিকে মদিনার লোকেরা প্রথমে নবী সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। পরে যখন তারা নবীকে কাছে থেকে দেখতে পেলেন, তখন বুঝলেন নবী মূলতঃ তা নয়। মদিনাবাসীরা মোহাজিরদের আশ্রয়, খাদ্য, নিরাপত্তা দিয়ে সাহায্য করেছিল; কিন্তু

পরে দেখা গেল নবীজীর সহচরবৃন্দ লুণ্ঠন এবং মুক্তিপণ আদায়ের মত কাজে নেমে পড়েছে। হিজরীর সপ্তম মাসে আবু জাহেলের নেতৃত্বে ৩০০ জন কোরেশের একটি বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়া থেকে মক্কা ফিরছিল। মুহাম্মদ তার চাচা হামজার নেতৃত্বে ৩০ জন মুজাহিদের একটি দলকে তার উপরে হামলা করতে পাঠালেন। সেটা ছিল ৬২২ খৃষ্টাব্দের রমজান মাস। এর মাস খানেক পর ৬২৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ২০০ জন কোরেশের আর একটি বাণিজ্য কাফেলা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে মক্কা ফিরছিল। মুহাম্মদ ৬০ জনের একটি দলকে উবেদার নেতৃত্বে পাঠালেন তার উপর হামলা করার জন্য। ঐ বছরেই গ্রীষ্ম ও শরৎকালের মধ্যে নবী স্বয়ং তিনটি অভিযান পরিচালনা করেন। মুহাম্মদের তৃতীয় অভিযানের সময়ই ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এর কিছুদিন পূর্বে তিনি নাখলা অভিযান হয়। নভেম্বর কি ডিসেম্বর মাসে নবী আট জনের একটি দলকে আবদুল্লা বিন জাস-এর নেতৃত্বে অভিযানে পাঠালেন। যাত্রার মুহূর্তে নবী আব্দুল্লাহর হাতে সীল করা একটি চিঠি দিয়ে বললেন, দুই দিন পথ চলার পর এই চিঠি খুলবে। নবীর কথামত দুইদিন পথ চলার পর সীল খুলে আব্দুল্লাহ দেখলো তাতে লেখা আছে, ''আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা নাখলা পর্যন্ত যাও। যারা স্বেচ্ছায় তোমার সঙ্গে যেতে চায়, তাদের সঙ্গে করে নাখলা যাও এবং সেখানে কোরেশদের বাণিজ্য কাফেলার জন্য অপেক্ষা কর। নাখলা মক্কার পূর্ব দিকে অবস্থিত এবং মক্কা থেকে যে সব বাণিজ্য কাফেলা দক্ষিণে বাণিজ্য করতে যায় তারা নাখলা হয়ে যায়। চিঠি পড়ে দু'জন মদিনায় ফিরে গেল। বাকী ৬ জনের দলটি নাখলায় পৌঁছে অপেক্ষা করতে লাগলো। দু'এক দিনের মধ্যেই দক্ষিণ দিক থেকে কোরেশদের বাণিজ্য কাফেলা নাখলায় এসে পৌঁছাল। আব্দুল্লাহ ও তার লোকেরা ইতিমধ্যে তাদের মাথা কামিয়ে ফেলল এবং এর দ্বারা তারা বোঝাতে চাইল যে, তারা নিরীহ তীর্থযাত্রী এবং মক্কা থেকে ওমরাহ্ পালন করে ফিরছে। কোরেশদের দলে মাত্র চারজন লোক ছিল এবং তারা আব্দুল্লাহর চালাকিতে বিভ্রান্ত হয়ে রান্না খাওয়ার আয়োজন শুরু করলো। সেই দিনটি ছিল আরবী রজব মাসের শেষ দিন। ইসলামের জন্মের আগেই আরবে রজব সহ চার মাস যুদ্ধবিগ্রহ ও রক্তপাত নিষিদ্ধ ছিল। কাজেই আব্দুল্লাহ কি করবে মনস্থির করতে পারলো না। যদি আক্রমণ না করে একদিন অপেক্ষা করে তবে কাফেলা তাদের হাতের বাইরে চলে যাবে এবং সব পরিশ্রম নিষ্ফল হবে। আবদুল্লাহ শেষ পর্যন্ত আক্রমণ করাই যুক্তিযুক্ত মনে করলো এবং তীর দিয়ে আমর নামক এক ব্যক্তিকে হত্যা করলো। ওসমান ও হাকিম নামে দু'জনকে বন্দী করলো এবং চতুর্থ ব্যক্তি নওফল পালিয়ে যেতে সমর্থ হলো। যথা সময়ে দু'জন বন্দী ও বাণিজ্য কাফেলা সহ আবদুল্লাহ মদিনা পৌঁছালে গণিমতের মাল দেখে নবী খুশি হলেন এবং পবিত্র মাসে রক্তপাত করার জন্য মৃদু তিরস্কার করলেন। কিন্তু আল্লাহ আব্দুল্লাহর কাজকে সমর্থন করে অনতিবিলম্বে কোরানের ২/২১৭ নং আয়াতটি নাজিল করলেন।

উপরিউক্ত নাখলা অভিযান ইসলামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কারণ,

এই অভিযানেই মুসলমান বাহিনী সর্বপ্রথম গণিমত বা লুটের মাল হস্তগত করে। উপরন্তু কোন অমুসলিম ব্যক্তিকে বন্দী করতে সমর্থ হন। নবীজী লুটের মালের এক পঞ্চমাংশ পবিত্র 'খুম' হিসেবে গ্রহণ করলেন এবং বাকিটা সকলের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। বন্দীদের জন্য নবীজী প্রত্যেকের জন্য ১৬০০ দিরহাম মুক্তিপণ দাবী করলেন। দু'জনের একজন মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়া পেল। অপর জন মুক্তিপণ না দিতে পারায় ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য হল।

নবুয়ত লাভের আগে নবীজী নিরীহ শান্তিপ্রিয় হিন্দু সাধু সন্ন্যাসীদের মত ধ্যান ও উপাসনা করে কাটাতেন। এখন আর তা করেন না। পাঠক খেয়াল করবেন, নবীজী মক্কা থেকে হিজরত করার পরপরই মাঝ পথে বুহায়রার অনুচর সলমন এসে নবীর সাথে মিলিত হয়েছেন। এর মধ্যে মদিনার শান্তিপ্রিয় লোকেরাও নবীজীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। কোরানের ২/৮৯ নং আয়াতের 'শানে নুযুল'-এ দেখা যাচ্ছে, তারা প্রথমে নবীজীকে সাহায্য করেছিলেন। এখন কেন দুশমন হল, এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা বললেন, আমরা তাকে তদ্রুপ পাইনি। এই যখন অবস্থা তখন তারা ইসলাম গ্রহণ করলো কেন? এর উত্তর পরে পাওয়া যাবে। নাখলার উপরোক্ত ঘটনার পর থেকে মক্কা ও মদিনার শত্রুতা অসম্ভব রকম বেড়ে গেল। অপর দিকে আল্লাহ ক্রমাগত যুদ্ধের আয়াত অবতীর্ণ করে মুসলমানদের মন যুদ্ধের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে লাগলেন।

- আল্লাহ বললেন, "যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর।" (কোরান- ২/১৯০)
- যেখানেই তাদের পাবে হত্যা করবে এবং যে স্থান হতে তারা তোমাদের বহিষ্কার করেছে, তোমরাও সেই স্থান হতে তাদের বহিষ্কার করবে। অশান্তি হত্যা অপেক্ষা গুরুতর (কোরান- ২/১৯১)
- যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তবে তোমরা তাদের হত্যা কর। অবিশ্বাসীদের জন্য ইহাই প্রতিফল। (কোরান- ২/১৯২)
- তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে যে পর্যন্ত না অশান্তি (ফেতনা) দূর হয় এবং আল্লাহর ধর্ম (ইসলাম) প্রতিষ্ঠিত হয়। (কোরান- ২/১৯৩)
- এর সঙ্গে আল্লাহ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের জন্য বেহেস্তের হুর, পরী এবং সুরার লোভও দেখালেন। আল্লাহ আরও বললেন, যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ফেতনা শেষ হয়ে যায় এবং দ্বীন সামগ্রিকভাবে আল্লাহর জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। (কোরান- ৮/৩৯)
- আল্লাহ মুসলমানদের ভয় পেতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, "আমি কাফেরদের অন্তরে আতঙ্ক সঞ্চার করে দেব। অতএব আঘাত কর তাদের গর্দানের উপর এবং আঘাত কর তাদের অঙ্গুলীর জোড়ায় জোড়ায়।" (কোরান- ৮/১২)

- আল্লাহ্ নবীকে আদেশ করলেন, "হে নবী, জেহাদ করুন কাফিরদের ও মুনাফেকদের বিরুদ্ধে এবং তাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করুন।" (কোরান- ৯/৭৩)
- আল্লাহ্ মুসলমানদের আদেশ করলেন, "যারা ঈমান এনেছ, তারা যুদ্ধ কর তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে। তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়। আল্লাহ্ মুমিন মুসলমানদের আরও বললেন, তোমরা যুদ্ধ কর যারা ঈমান আনে না আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি, আল্লাহ ও তার রসুল যা হারাম করেছেন তা হারাম বলে মনে করে না এবং অনুসরণ করে না এবং অনুসরণ করে না প্রকৃত সত্য দ্বীন (ইসলাম), যে পর্যন্ত না তারা বশ্যতা স্বীকার করে স্বহস্তে জিজিয়া প্রদান করে।" (কেরান-৯/২৯)
- আল্লাহ মুসলমানদের এই বলে ভয়ও দেখালেন, "যদি তোমরা অভিযানে বের না হও তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন।" (কোরান- ৯/৩৯)
- "তোমরা জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জেহাদ কর।" (কোরান- ৯/৪১)

ঐতিহাসিক তাবুক যুদ্ধে যখন মুসলমানরা বিভিন্ন বাহানা তুলে অভিযানে না যাবার জন্য অনুমতি চাইল, আল্লাহ তখন যে কোন অবস্থাতেই যুদ্ধে গমন বাধ্যতামূলক করে দিলেন। এ যুদ্ধ কিন্তু বর্তমান বা অতীতে প্রচলিত যুদ্ধের মত নয়, এ হল এক তরফা আক্রমণ। "ইসলামী সত্য বা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ। সব বিশ্বাসীর উপর আল্লাহর এই আদেশ। যেখানেই বহু দেব-বাদীদের পাও, তাদের হত্যা কর এবং মহানবীর বাণী আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, একথা না বলা পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধ কর।" (মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন, মজিদ খাদ্দুরী, পৃষ্ঠা- ১৭)

- আল্লাহ্ আরও বললেন, "যুদ্ধের কৌশল ছাড়া কিংবা নিজ দলে আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে তার পরিণতি হবে জাহান্নাম।" (কোরান- ৮/১৬)
- আল্লাহ ও রাসুলের উক্ত রূপ কাজে বাধা দিলে কি কি করা হবে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, "যারা আল্লাহ্ ও তার রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে হাঙ্গামা সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি হল — তাদের হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা হাত পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে।" (কোরান-৫/৩৩)
- আল্লাহ্ আরও বললেন, "যারা আমার আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছে, অবশ্যই আমি তাদের আগুনে জ্বালাব। যখনই তাদের চামড়া জ্বলে পুড়ে যাবে, তখনই আমি পাল্টে দেব অন্য চামড়া দিয়ে, যাতে তারা শাস্তি আস্বাদন করতে পারে।" (কোরান- ৪/৫৬)

- নবী মুহাম্মদের পূর্ববর্তী নূহ নবী এই বলে আল্লাহর কাছে আর্জি জানিয়েছিলেন, "আপনি কাফেরদের মধ্য থেকে একজন গৃহবাসীকেও যমীনে অবশিষ্ট রাখবেন না। যদি আপনি তাদের যমীনে অবশিষ্ট রাখেন তবে তারা আপনার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং জন্ম দেবে কেবল পাপাচারী ও কাফের।" মুহাম্মদ এই বাক্যটিকে কোরানের ৭১/২৬-২৭) আয়াতে স্থান দিয়েছেন।
- মহান আল্লাহ কাফের ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে জেহাদ ও কঠোর হবার জন্য পুনরায় আদেশ দেন। (কোরান- ৬৬/৯)
- আল্লাহ কাফেরদের ঘরবাড়ী থেকে বহিষ্কার করেছেন, তাদের অন্তরে ত্রাস সৃষ্টি করেছেন এবং ঘরবাড়ী ধ্বংস করেছেন। আর মুমিনদের হাতেও ধ্বংস করাইতেছিলেন। (কোরান-৫৯/২)
- আল্লাহ মুসলমানদের আরও নির্দেশ দিলেন, কাফেরদের গর্দানে আঘাত কর। তাদের পুরোপুরি পরাভূত করে তাদেরকে দৃঢ়তার সাথে বেঁধে ফেলবে। অনুগ্রহ করো বা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দাও। (কোরান-৪৭/৪) এ হুকুম অবশ্য পালনীয়।

এ আয়াত সম্পর্কে ইসলামী চিন্তাবিদদের উপলব্ধি হল, "এ আয়াত থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, কাফের বেঈমানদের শক্তি দাপট যতক্ষণ পর্যন্ত না চূর্ণ হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধই চালিয়ে যেতে হবে এবং কতল করে ফেলতে হবে। আর যখন দুর্বল হয়ে পড়বে, তখন কয়েদ করে রাখাই যথেষ্ট; যাতে ভয় পেয়ে তারা মুসলমান হয়ে যায় অথবা অনুগ্রহ অনুকম্পায় মুক্তি পেয়ে যায়। তাহলে চিরদিন ঋণী হয়ে থাকবে বা প্রজা হয়ে বশ্যতা স্বীকার করে থাকবে। আল্লাহ এ কাজ নিজেই করতে পারতেন। কিন্তু তিনি যুদ্ধ বা সংঘর্ষ চান। আল্লাহ বললেন, আমি মুশকিরদের থেকে দায়মুক্ত। (কোরান- ৯/৩) এবং মুশরিকদের যেখানে পাও অবরুদ্ধ কর, বন্দী কর এবং হত্যা কর। (কোরান- ৯/৫)

- আল্লাহ কাফেরদের শত্রু। (কোরান- ২/৯৮)
- মুমিন মুসলমানরা কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করলে আল্লাহর সাথে কোন সম্পর্ক থাকবে না। (কোরান- ৩/২৮)

এ অবস্থায় আল্লাহ সাফ বলে দিলেন, তাদের মধ্য থেকে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর পথে হিযরত করে চলে না আসে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তাদের পাকড়াও কর এবং হত্যা কর যেখানেই তাদের পাও। (কোরান-৪/৯১) আল্লাহর আদেশ মত বনী কুরাইজাদের সবংশে হত্যা করা হল, বনী নাযির গোষ্ঠীকেবিতাড়িত করা হল এবং বাদবাকীগুলোর উপর জিজিয়া কর আরোপ করা হল। আল্লাহ কোরানের ৩/১৫২ নং আয়াত নাযিল করে জানিয়ে দিলেন, যখন তোমরা কাফেরদের খতম করছিলে তা ছিল তারই আদেশে। আল্লাহর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় বদর যুদ্ধে ৭০ জন কাফের পাকড়াও হয়েছিল। তার মধ্যে হযরত

আব্বাসও (রাঃ) ছিলেন। হযরত রসুলে পাক এদের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) পরামর্শ চাইলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিকী ও অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) বললেন, এদের থেকে মুক্তিপণ নিয়ে মুক্ত করে দেয়া হোক। হযরত ওমর ফারুক বললেন, না এদেরকে কতল করা হোক এবং যে যার নিকট আত্মীয়, সে তাকে কতল করবে। ইনি নাকি ন্যায় বিচারক ধার্মিক ব্যক্তি। মানুষ কত নিষ্ঠুর ও নৃশংস হতে পারে এই ন্যায় বিচারকের বিচার দেখলে বোঝা যায়। আল্লাহ অবশ্য এরই মধ্যে বলে রেখেছেন, এই ৭০ জনকে মুক্তিপণের বদলে ছেড়ে দিলে পরের বছর তোমাদের ৭০ জন শহীদ হবে।

ইতিমধ্যেই আল্লাহর উদ্দেশ্য সফল হতে চলেছে। তিনি এতদিনে আরবের কিছু সহজ সরল অতিথিপরায়ণ লোকদের নৃশংস নিষ্ঠুর করে তুলতে পেরেছেন। পরবর্তীতে এই নৃশংসতা কিভাবে কাজে লাগানো হয়েছিল তা দেখা যায় কুরাইজা নামক ইহুদিদের স্ববংশে কতল-এর সময়। আব্দুল্লাহ ইবনে ক্বাতাদাহ বলেন যে, নবী ইহুদি বনী কোরাইজাকে ২১ দিন পর্যন্ত অবরোধ করে রাখলে ওরা সন্ধির আবেদন করলো, আল্লাহর রসুল তা প্রত্যাখ্যান করে দিয়ে বললেন, তোমরা সাদ ইবনে যায়েদকে(রাঃ) বিচারক মেনে মেনে নাও। তিনি যে রায় দেবেন সেই মোতাবেক ফয়সালা হবে। কুরাইজারা বললো, তাহলে আগে পরামর্শের জন্য হযরত আবু লুবাবা ইবনে আব্দুল মুনযিরকে আমাদের কাছে পাঠান। হুজুর পাক (নবীজী) তাই করলেন। হযরত আবলু লুবাবা তাদের কাছে গেলে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি অসর্তকতা বশতঃ গলায় হাত ঘুরিয়ে ইঙ্গিত দিলেন যে, বিচারে তোমাদের কতল হবে। হয়েছিল ঠিক তাই। পূর্ব পরিকল্পনা মত কুরাইজা গোষ্ঠীর ৮০০ জন পুরুষ সদস্যদের সকলকেই মদিনার জনাকীর্ণ বাজারে গর্ত খুঁড়ে এক এক করে কোতল করা হয়। কেমন করে হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছিল, সে সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা যেতে পারে উইলিয়াম ম্যুরের গ্রন্থ থেকে। সেই দিন রাতেই মদিনার বাজারে ৮০০ জন ইহুদির মাটি চাপা দেবার মত এক বিশাল গর্ত খোঁড়া হল এবং পরদিন ফজরের নামাজের পরপরই কতল পর্ব শুরু হয়ে গেল। পিঠমোড়া করে বাঁধা অবস্থায় ৫-৬ জন করে বন্দীকে গুদাম ঘর থেকে আনা হতে থাকলো এবং আলী এবং নবীর আর এক চাচাতো ভাই যুবায়ের তাদের গলা কেটে পরিখার মধ্যে ফেলতে লাগলো। গুদাম ঘরে বন্দীরা প্রথম দিকে বুঝতে পারেনি যে, কয়েক জন করে ডেকে ডেকে তাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যে ব্যক্তি ডেকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছিল, একজন বৃদ্ধ ইহুদি তাকে জিজ্ঞাসা করলো, "এদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? তখন সে বলল, এখনো মাথায় ঢোকেনি? যাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তারা কি আর ফিরে আসছে? তখন তারা বুঝতে পারলো এবং শিশু-বৃদ্ধ ও মহিলার ক্রন্দনে, আর্ত চীৎকারে এবং হাহাকারে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হল সে পরিস্থিতি শুধু চোখ বুজে উপলব্ধি করা যায়, ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। ঠাণ্ডা মাথায় ৮০০ জন নিরস্ত্র মানুষের বীভৎস শিরচ্ছেদ ক্রিয়া সারাদিন ধরে সামনে বসে পর্যবেক্ষণ করার মত হিম্মত

আল্লাহ্ অবশ্যই নবীজীকে দিয়েছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোন নবী বা ধর্মগুরুকে এই হিম্মত আল্লাহ্ না দিয়ে নবীকে মহিমান্বিত করেছেন। আল্লাহ্ নবীর এই হিম্মত দেখে অত্যন্ত খুশি হলেন এবং কুরানে আয়াত নাযিল করে এ কাজের সমর্থন জানালেন, "আহলে কিতাবের মধ্য থেকে যারা মুশরিকদের সাহায্য করেছিল, তাদেরকে আল্লাহ তাদের দূর্গ সমূহ থেকে নামিয়ে দিলেন এবং তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করলেন। ফলে তোমরা তাদের এক দলকে হত্যা করেছ এবং অন্য দলকে বন্দী করেছ। আর তিনি তোমাদেরকে মালিক করে দিলেন তাদের যমীনের, তাদের ঘর-বাড়ী সমুহের, তাদের ধন-সম্পদের এবং যমীনের উপর; যার উপর তোমরা এখনো পা রাখনি। (কোরান- ৩৩/২৬-২৭) এইভাবে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর তাদের শিশু, মেয়ে, বউ, সম্পদ মুসলমানরা গণিমতের মাল হিসাবে ভাগবাটোয়ারা করে নিল। ভাগে পাওয়া অন্যের বউ ঝি-দের ভোগ করতে সদ্য মুসলমানদের কিছুটা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল সেই আওতাস যুদ্ধের সময়েই। আল্লাহ্ কুরানের ৪/২৪ নং আয়াত নাযিল করে সেই দ্বিধা দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, "সেই সব মেয়েলোও তোমাদের কাছে হারাম যাহারা অন্য কাহারো বিবাহাধীন রহিয়াছেন: অবশ্য সেই সব স্ত্রীলোক ইহার বাহিরে যাহারা (যুদ্ধে) তোমাদের হস্তগত হইবে।"

হযরত আবু ছাইদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আওতাস যুদ্ধে কাফেররা পরাজিত হলে কিছু মহিলা মুসলমানদের হাতে বন্দিনী হয়। অতঃপর এদেরকে গণিমতের মাল হিসেবে মুজাহিদদের মাঝে বন্টন করে দেয়া হয়। কিন্তু এদের স্বামী থাকার কারণে মুজাহিদরা তাদের সঙ্গে সহবাস থেকে বিরত থাকে। তখন আল্লাহতালা একটি আয়াত নাজিল করে বিধান (মছ্‌লা) জানিয়ে দিলেন যে, "যাদের স্বামী আছে তাদের সঙ্গে অন্য পুরুষের সহবাস করা হারাম। মিন্তু মালে গণিমত হিসেবে প্রাপ্ত মহিলাদের দাসীরূপে ব্যবহার করা যায়। সেক্ষেত্রে ঐ মহিলার পূর্ব স্বামীর অধিকার বাতিল হয়ে যায়। তবে গর্ভবতী হলে প্রসব না হওয়া পর্যন্ত তার সঙ্গে সহবাস করা যাবে না।

এই আয়াতের 'শানে নুযুল' পড়লে যে কেউ এর মধ্যে ধর্ষণের গন্ধ পাবেন। কিন্তু আসলে তা নয়। আল্লাহ্ মহিলাদের পুরুষের ভোগের জন্য সৃষ্টি করেছেন। একটি গোষ্ঠীকে সবংশে কতল করে তাদের সম্পদ মেয়ে, বউ শিশুদের ভাগ বাটোয়ারা করে ধর্ষণের উপদেশ দিয়ে আল্লাহ্ মুসলমানদেরকে নৈতিক চরিত্রের উন্নতির বদলে তার অধঃপতন করতে বা পিশাচ তৈরীতে কতখানি উৎসাহী তা উপরোক্ত আয়াত পড়লে বোঝা যায়।

এ প্রসঙ্গে কুরানের আর একটি আয়াত উল্লেখযোগ্য। আজকাল মুসলিম মহিলাদের পর্দার উপকারিতা সম্পর্কে নানা বক্তব্য শোনা যায়। মূলে কিন্তু তা ছিল না। কুরানের ৩৩/৫৯ নং আয়াতে আল্লাহ নবীজীকে বলছেন, "হে নবী, আপনি আপনার পত্নীদেরকে, আপনার কন্যাদেরকে এবং মুমিন নারীদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের ওড়না নিজেদের উপর টেনে দেয়।" এতে সহজেই তাদের পরিচয় পাওয়া যাবে, ফলে তারা

নির্যাতিত হবে না।" এইটি হল আসল কথা। মুসলমানরা আল্লাহর অনুমতি পেয়ে রাস্তাঘাটে সুযোগ পেলেই নারী অপহরণ করা শুরু করে দিল। এমতাবস্থায় হয়তবা ভুল করে দু'একটি মুসলিম নারীও অপহরণ হয়েছিল। ফলে আল্লাহ বাধ্য হয়েই মুসলমান মেয়েদের চিহ্নিত করতে পর্দা প্রথা চালু করলেন। পর্দা প্রথা চালু হওয়ায় কিছু মুসলমানও অসন্তুষ্ট হয়েছিল। কোরানের ৩৩/৫৩ নং আয়াতে দেখা যাচ্ছে, "হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা নবীর ঘরের মধ্যে বিনা অনুমতিতে ঢুকিয়া পড়িও না। .... কিন্তু খাওয়া শেষ হলে নিজেরাই চলিয়া যাও। কথাবার্তায় মশগুল হইয়া বসিও না। তোমাদের এ আচরণ অবশ্যই নবীকে পীড়া দেয়। ...." এই আয়াতের 'শানে নুযুল'-এ (প্রেক্ষাপট) বলা হয়েছে, যখনই পর্দার ব্যবহারের আয়াত নাযিল হল এবং ইহার উপর আমলও শুরু হয়ে গেল, তখন তালহা ইবনে উবায়দুল্লার কাছে এটা নতুন মনে হল। তাই সে বলল, এখন তো এই হুকুম, কিন্তু আমার জীবদ্দশায় হযরত মুহাম্মদের ইন্তেকাল হলে আমি অবশ্যই হযরত আয়েশাকে (রাঃ) বা হযরত উম্মে সালমাকে (রাঃ) বিয়ে করব। অতঃপর আল্লাহ বাধ্য হয়ে আর একটি আয়াত পাঠালেন — "আল্লাহর রাসুলকে কষ্ট দেয়া এবং তার মৃত্যুর পর তার পত্নীদেরকে বিয়ে করা তোমাদের কারও পক্ষে কখনো বৈধ নয়। এটা আল্লাহর কাছে গুরুতর অপরাধ। (কোরান-৩৩/৫৩)

ইনসাফ বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যই আল্লাহ রাসুলকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। তার দেহ মুবারক যাতে তার সব পত্নীই সমানভাবে পায়, তা নিশ্চিত করার জন্য তিনি পালা করে সব পত্নীদের সঙ্গে রাত্রি যাপন করতেন। শুধু বয়স হয়ে যাবার দরুণ বিবি সৌদা তার পালা বিবি আয়েশাকে দান করেছিলেন। ঘটনার দিন ওমরের কন্যা বিবি হাফসার পালা ছিল। কোন এক কাজে বিবি হাফসা বাইরে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে দেখেন, নবী তার বিছানায় খ্রীষ্টান রক্ষিতা মারিয়াকে নিয়ে শুয়ে আছেন। দু'জনকে এ অবস্থায় দেখে হাফসা চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দিলেন। ঘাবড়ে গিয়ে নবী তাকে চুপ করতে বললেন এবং একথা কাউকে প্রকাশ করতে নিষেধ করলেন। উপরন্তু তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে, আর কোনদিন তিনি মারিয়াকে স্পর্শ করবেন না। কিন্তু নবীর এই প্রতিজ্ঞায় আল্লাহর ক্রোধের সঞ্চার হল। আল্লাহ বললেন, "হে নবী, আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন, আপনি তা হারাম করছেন কেন?" (কোরান-৬৬/১) উক্ত ঘটনার পর তা বিবি আয়েশার কানে গেল এবং এ নিয়ে ঝগড়া চেঁচামেচি চলল সারা রাত ধরে। নবী তখন বিবিদের তালাক দেবার ভয় দেখালেন। আল্লাহও নবীর কথায় সায় দিয়ে বললেন "যদি নবী তোমাদের সবাইকে তালাক দেন, তবে তার রব্ব অচিরেই তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী দেবেন।" (কোরান-৬৬/৫)

আল্লাহর চোখে নবী কত বড় প্রিয় তা উপরোক্ত ঘটনায় বোঝা যায়। এছাড়াও আল্লাহ কোরানে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, স্ত্রীলোকেরা হল তোমাদের জন্য শষ্যক্ষেত্র,

যেভাবে ইচ্ছা তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে গমন করতে পার। (কোরান-২/২২৩) অপর এক আয়াতে আল্লাহ্ হিল্লার বিধান দিয়েছেন। (কোরান-২/২৩০) নবীজীর এই 'হিল্লা' বিধা টি সভ্য মানুষের কাছে অতি ঘৃণ্য। বিধানটিতে বলা হয়েছে, কেউ যদি তালাক দেওয়া স্ত্রীকে আবার বিয়ে করতে চায় তবে ঐ মহিলাকে অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে এবং নতুন স্বামীর সঙ্গে তাকে যৌন সহবাস করতে হবে। তারপর ঐ নতুন স্বামী যদি স্বেচ্ছায় ঐ মহিলাকে তালাক দেয় তাহলে যাবতীয় নিয়ম-কানুন মেনে তাকে বিয়ে করা যাবে।

যদিও রক্ত মাংসে গড়া কোন মানুষ আল্লাহর বিধান পরিবর্তন করতে পারে না; তা সত্ত্বেও পাকিস্তান সরকার আইন করে কোরানে বর্ণিত আল্লাহর এই বিধানটি নিষিদ্ধ করেছেন ঘৃণিত ব্যবস্থা বলেই। কিন্তু ভারত এবং বাংলাদেশে অন্যান্য দেশের মতই এই ঘৃণ্য আইনটি চলছে।

আল্লাহ বলেছেন, পুরুষ নারীর থেকে শ্রেষ্ঠ। (কোরান-৪/৩৪) এ আয়াতে নারীকে প্রহারের অধিকারও দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ কোরানের ৪/৩ নং আয়াতে এক সঙ্গে চারজন নারীকে পর্যন্ত নিকাহ্ করার অনুমতি দিয়েছেন। উপরন্তু কোরানের ৪/২৪ নং আয়াত অনুসারে যতগুলি ইচ্ছা নারীকে ভোগের অধিকার আল্লাহ প্রত্যেক মুসলমান পুরুষকেই দিয়েছেন। কাজেই একজন মুসলমান পুরুষ পয়সা খরচ করে যত খুশি সংখ্যক নারীকে ভোগ করতে পারে। কিন্তু নারী সে অধিকারের বিন্দুমাত্র চিন্তা করলেও অপরাধী হবে। আল্লাহর রসুল নারী জাতির আরও একটি প্রয়োজনীয়তার কথা বলে গেছেন। ঘরের স্ত্রী হল 'চরিতার্থ করা সম্ভব নয়' এমন অবৈধ কামনা ঢেলে দেবার নর্দমা বিশেষ। নিজের পত্নী ছাড়া অন্য কোন নারীকে দেখে কামনার উদ্রেক হলে সঙ্গে সঙ্গে তা স্ত্রী-রূপ নর্দমা দিয়ে বইয়ে দিতে হবে। নবী একদিন মদিনার মসজিদে বসে ছিলেন। এমন সময় এক মহিলা তার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। মহিলাকে দেখে নবীর মনে কামনার উদ্রেক হল এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি পত্নী জয়নবের কাছে গেলেন। জয়নব তখন চামড়া পাকা করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন এবং সেই অবস্থাতেই আল্লাহর রসুল তার কামনা চরিতার্থ করে ফিরে এলেন।

একাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত আরব পণ্ডিত আল গাজ্জালী এই জন্য আল্লাহকে ধন্যবাদ দিয়েছেন যে, আঠারোটি বিষয়ে আল্লাহ্ নারীকে শাস্তি দিয়ে পুরুষকে মহিমান্বিত করেছেন। এই আঠারোটি বিষয় হল —

(০১) রজস্রাব,

(০২) সন্তান প্রসব,

(০৩) বিয়ের পর নিজের লোকজন ছেড়ে স্বামীর সঙ্গে চলে যাওয়া,

(০৪) গর্ভধারণ,

(০৫) নিজের শরীরের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণহীনতা,

(০৬) কম সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হওয়া,

(০৭) অন্যের কাছ থেকে শুধু তালাক পাবার অধিকারিণী এবং তালাক দেবার অক্ষমতা,

(০৮) পুরুষ এক সঙ্গে চারটি স্ত্রী রাখার অধিকারী; কিন্তু স্ত্রীদের এক জনের বেশী স্বামী রাখার অক্ষমতা,

(০৯) তাদের গৃহবন্দী হয়ে থাকতে হয়,

(১০) বাড়ীর ভিতরেও তাদের পর্দা পরে থাকতে হয়,

(১১) আল্লাহ একজন পুরুষের সাক্ষ্যকে দুই জন স্ত্রী লোকের সাক্ষ্যের সমান করেছেন,

(১২) নিকট আত্মীয়ের সাথে ছাড়া তারা ঘরের বাইরে যাবার অধিকারিণী নয়,

(১৩) পুরুষরাই শুধু জুম আর জামাতের ও ভোজে অংশ গ্রহণ করার অধিকারী,

(১৪) মহিলারা শাসক ও বিচারক হবার অধিকার হতে বঞ্চিত,

(১৫) তারা মেধার হাজার ভাগের এক ভাগের অধিকারিণী কিন্তু পুরুষ নয়শত নিরানব্বই ভাগের অধিকারী,

(১৬) শেষ বিচারে দিন একজন লম্পট পুরুষ একজন লম্পট নারীর অর্ধেক সাজা পাবে,

(১৭) স্বামী মারা গেলে কিংবা তালাক দিলে পুনর্বিবাহেরর জন্য তাদের তিন মাস অপেক্ষা করতে হয়। (কাউন্সিল ফর কিংস, নসিহত আল-মুলুক, পৃ-১৬৪)

ইসলামে নারী কতখানি মহিমান্বিত (!) তা বোঝা যায় ১৮ নং শাস্তি দিয়ে। একটি ঘটনা দিয়ে এটি বোঝাবার চেষ্টা করছি। নবীজীর এক সাহাবী আব্দুর রহমান মক্কা থেকে হিজরৎ করে মদিনায় এলে ধর্মভাই সাদ বিন রাবি তাকে আশ্রয় দেয়। মক্কায় উক্ত আব্দুর রহমানের ১৬ জন স্ত্রী ও বেশ কিছু সংখ্যক দাসী রক্ষিতা ছিল। যাই হোক, রাত্রে খাওয়া দাওয়া পর্ব সমাধা হলে সাদ তার দুই স্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন এবং আব্দুর রহমানকে বললেন, আমার এই দুইজন স্ত্রী আছে এদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পছন্দ করে নেও। আব্দুর রহমান একজনের প্রতি ইঙ্গিত করা মাত্র সাদ তৎক্ষণাৎ সেই স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তার সাথে শুতে পাঠালো। এই হল স্ত্রীর প্রতি ইসলামী সম্মান। অন্য একটি ঘটনায় আল্লাহ নিজেই অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। আল্লাহর নবী নিজের পালিত পুত্র যায়েদের সঙ্গে জয়নবের বিয়ের পয়গাম পাঠালে প্রথমে জয়নব রাজী হননি। অতঃপর আল্লাহ রুষ্ট হয়ে কোরানের ৩৩/৩৭ নং আয়াত নাযিল করেন। যায়েদের সঙ্গে জয়নবের নিকাহ হয়ে গেল। এ বিয়ে আল্লাহ নিজে দিয়েছেন। এ কারণে কোন প্রকাশ্য অনুষ্ঠান হয়নি। আল্লাহ যদি দূরদর্শী হতেন তাহলে নবীজীর পুত্রবধূর বিয়ের কলঙ্ক হতো না। যদিও আমরা 'বিবাহ' শব্দ ব্যবহার করেছি। ইসলামী আইনে কিন্তু শব্দটি হবে 'নিকাহ'। বিবাহ এবং নিকাহ এক জিনিস নয়। বিবাহ শব্দটি বিশেষ ভাবে বহন করা বুঝায়। এটা একমাত্র হিন্দু বিবাহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিবাহ অবিচ্ছেদ্য, কোন ক্ষণস্থায়ী চুক্তি নয়। কিন্তু ইসলামী বিবাহ ক্ষণস্থায়ী চুক্তি মাত্র। একজন

পুরুষ যে কোন সময় তিন তালাক উচ্চারণের মাধ্যমে কোন কারণ ছাড়াই বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে। এই ক্ষণস্থায়ী বিবাহের আবার ক্ষণস্থায়ী রূপ আছে, তার নাম 'মুতা'। হুনাইন যুদ্ধের পর আওতাস অভিযানের সময় নবী মুসলমানের তিন রাত্রির জন্য নিকাহের অনুমতি দিয়েছিলেন। (হাদিস সহি মুসলিম- ৩২৪৮, ৩২৪৯, ৩২৫১) এগুলো আবার কিছু দেনমোহর দিলে বৈধ হয়ে যায়।

দেনমোহর সম্পর্কে ইসলামী আইনে বলা হয়েছে, "স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রদেয় মোহরের নিম্নতম মূল্য কত হইবে, তাহা লইয়া প্রচুর বিতণ্ডা দেখা যায় .... আবু হানিফার শিষ্যগণ বলেন, তুচ্ছ মূল্যে নারী দেহভোগ বৈধ নয়। ইব্রাহিম নাখাই একবার ইহার পরিমাণ ১০ দিরহামের কম হইবে না বলিয়াছিলেন .... শাঈবাণীর মুয়াত্তায় দেখা যায় ১০ দিরহাম মূল্যের কোন কিছু চুরি করিলে চোরের একটি হাত নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। এই পরিমাণ নির্ধারণের সূত্র হিসাবে বলা হয় যে, স্ত্রীর একটি অঙ্গ ভোগ করিতে হইলে তাহাকে অন্ততঃ ১০ দিরহাম মূল্য দেওয়া উচিত। (ইসলামী আইন তত্ত্বের উৎস,গাজী শামসুর রহমান, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা- ৮৭)

ইসলামের চরম লক্ষ্য জান্নাতবাসী (স্বর্গবাসী) হওয়া। কিন্তু জান্নাতে স্ত্রী জাতির জন্য কোন কিছুর প্রতিশ্রুতি নেই। সেখানে যে অঢেল যৌন সুখের ব্যবস্থা আছে, তা শুধুই পুরুষের জন্য। আব্দুল্লা বিন ওমরের মতে প্রত্যেক জান্নাতবাসী ৫০০ হুরী, ৪০০ কুমারী এবং পুরুষের সঙ্গে সহবাস হয়েছে, এমন আরও ৬০০০ রমনী পাবে। সে হিসেবে একজন নারী যদি জান্নাতবাসী হয় এবং তার পার্থিব স্বামী ফেরত পায় তবুও তাকে ৭০০০ সতীনকে নিয়ে ঘর সংসার করতে হবে। নবী বলেছেন, যারা আমার সুন্নত মানবে না, তাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই। (সহি মুসলিম, হাদিস নং- ৩২৩৯) কিন্তু বিয়ের ক্ষেত্রে নবীর সুন্নত মানতে গেলে এক অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। পালিত পুত্রের স্ত্রী অর্থাৎ পুত্রবধূকে বিয়ে করা নাহয় বাদই দিলাম, ২৫ বছরের যুবক থাকা কালে ৪০ বছর বয়সের নারীকে বিয়ে এখন আর কোন মুসলমানই করবে না। আবার ৫২ বছরের নবীর ৯ বছরের আয়েশাকে বিবাহের সুন্নত মানতে গেলে নারী নির্যাতন আইনে জেলে যেতে হবে। আবার নবী ওমরাহ্ পালন করতে গিয়ে মায়মুনাকে বিয়ে করেন। এই সুন্নত অনুসারে সব মুসলমানই যদি ওমরাহ্ করতে গিয়ে ঐ চেষ্টা করেন, তাহলে এক আরাজকতা সৃষ্টি হবে। স্বস্তির কথা বিরাট সংখ্যক মুসলমান এখন একমাত্র আরবী নাম ব্যবহার ছাড়া ইসলামের আর কোন কিছুই মানে না। তবে বিধর্মী সংহারের ক্ষেত্রে দুনিয়ার মুসলমান কমবেশী একমত। যদি কোনো ব্যতিক্রম দেখা যায় তবে তা সিন্ধুতে বিন্দুর চেয়েও কম।

নারী প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে অন্য ধর্মের প্রতি আল্লাহ বা নবীর দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল সে সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা উচিত বলে আমরা মনে করি। প্রথমেই বলে রাখা ভাল আল্লাহ সরাসরিই বলেছেন —

ক) "আল্লাহ কাফেরদের শত্রু" (কোরান-২/৯৮) কাফের কারা? এ সম্পর্কে

আল্লাহ্ বলেন "যারা আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী বিধান দেয় না, তারাই কাফের। (কোরান-৫/৪৪)

খ) অন্য একটি আয়াতে অবশ্য বলা হয়েছে, "মাঝামাঝি পথ উদ্ভাবনকারীরাই প্রকৃত কাফের। (কোরান- ৪/১৫১)

গ) আল্লাহ্ বলেছেন, অতি সত্বর আমি কাফেরদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করবো। (কোরান-৩/১৫১)

ঘ) আল্লাহ্ আরও বলেছেন, ইসলামই হল আল্লাহর কাছে একমাত্র দ্বীন। (কোরান-৩/১৯) এই হিসাবে একজন মুসলমান তার অমুসলিম পিতা, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, মাতা- ভ্রাতাকে পরিত্যাগ ও হত্যা করা বৈধ।

ঙ) কাফেরদের প্রার্থনা নিষ্ফল। (কোরান-৪০/৫০) যে কেউ কোরান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে সে কেয়ামতের দিন বহন করবে শাস্তির ভারী বোঝা। (কোরান-২০/১০০) এবং তাদেরকে অন্ধ অবস্থায় উঠানো হবে। (কোরান- ২০/১২৪)

চ) ঈমান না আনলে তাদের জন্য আছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (কোরান-১৬/১০৪) আর মূর্তি পূজারী কাফের, যাদেরকে আল্লাহ্ মুশরিক বলেছেন, তারা অনন্তকাল জাহান্নামে থাকবে। সৃষ্টির মধ্যে তারা নিকৃষ্টতম (কোরান-৯৮/৬) অবশ্য সমগ্র কোরানে বেশীরভাগ অংশ জুড়েই আল্লাহ্ কাফের মুশরিক ও মুনাফেকদেরকে নিন্দা, শাস্তি ও ধ্বংসের ভয় দেখিয়ে আয়াতের পর আয়াত নাযিল করেছেন।

গুপ্ত হত্যা (নযীর গোষ্ঠির নেতা রাফে), হত্যা (কোরান-৯/৫, ৪৭/৪), গণিমতের মাল লাভ (কোরান-৪৮/১৫), বহিষ্কার (কোরান-৫৯/২, মুসলিম-৪৩৬৩, ৪৩৬৬, ৮০১৮), নৃশংসতম হত্যাযজ্ঞ (বুখারী- ৬৩৩৩-৬৩৩৬) অর্থাৎ পৃথিবীর এমন কোন অন্ধকার দিক নাই যা আল্লাহ্ মুসলমানের করতে বলেননি বা মুসলমানরা করেনি।

সম্প্রতি কোরানের ১০৯ নং সুরার ৬ নং আয়াতটির বিকৃত ব্যাখ্যা করতে দেখা যাচ্ছে। এই আয়াতটিতে বলা হয়েছে, "তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন(ধর্ম) এবং আমার জন্য আমার দ্বীন (ধর্ম)।" জনাব এম. এম. পিকথলের অনুবাদে "Unto you your religion, and unto me my religion." অর্থাৎ তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে কোন বিবাদ নেই। যার যার ধর্ম তার তার কাছে। আল্লাহ্ কারও ধর্মে বাধা দেন না। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও আল্লাহর কালামের ভুল ব্যাখ্যার কারণে এইসব ব্যাখ্যাকারীদের আল্লাহ্ শাস্তি দেবেন।

এই সুরায় স্পষ্ট করেই বলে দেয়া হয়েছে, নবী যার উপাসনা করেন তোমরা তাঁর উপাসনা কর না। সে কারণে কাফেরদের যা কর্মফল তা তোমাদেরকে ভোগ করতে হবে। জাহান্নামই কাফেরদের কর্মফল। অতএব ব্যাখ্যা করে নিজেদের অনুকূলে নিলেও কোন লাভ নেই। ভ্রান্ত ব্যাখ্যা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না, তা কাফেরদের অতীত পরিণতি দেখলেই বোঝা যায়।

বলা হয়ে থাকে, আল্লাহ মহাজ্ঞানী এবং মহা বিজ্ঞানীও বটে। আল্লাহ্ ৬ দিনে

পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ পাহাড় পর্বত সম্পর্কে বলেছেন, "আল্লাহ্ আসমান সৃষ্টি করেছেন সুরক্ষিত ছাদ রূপে। (কোরান-২১/৩২) কেয়ামতের দিন অবশ্য সে ছাদ ভেঙে গুঁড়ো হয়ে পড়বে। আল্লাহ্ প্রথম মানব আদমকে সৃষ্টি করছেন। নবী তার ৯০-তম বংশধর। সে হিসাবে নবীর জন্ম হয় পৃথিবী সৃষ্টির ২২৫০ বছর পরে। ৫৭০ খৃষ্টাব্দে নবীর জন্ম হয়। কাজেই বলতে হয় আজ (২০০৬) থেকে মাত্র ৩৬৮৬ বছর আগে আল্লাহ্ পৃথিবী, পানি, স্তম্ভ ছাড়া ছাদরূপী আকাশ, গাছপালা, পশুপাখি ৬-দিনে সৃষ্টি করেছেন। আল্লার এই জ্ঞান ও ক্ষমতা বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস তো করেই না; আধুনিক মুসলমানরাও বিশ্বাস করে না। তার প্রমাণ পাঠ্য পুস্তক। জান্নাতবাসীদের প্রথমে মাছের কলিজা খেতে দেয়া হবে। স্ত্রী-পুরুষের মিলনকালে যদি স্ত্রীর আগে পুরুষের বীর্যপাত হয়, তাহলে সন্তান বাপের মত হয়। উল্টোটা হলে মায়ের মত হয়। (সহি বুখারী, হাদিস নং- ৩৬৮৪) স্ত্রীলোকের যে বীর্যপাত হয় না, আল্লাহর সে জ্ঞানও নেই। যাই হোক, নবীর ধারণা ছিল তার জীবদ্দশাতেই কেয়ামত শুরু হয়ে যাবে। একদিন মদিনার পথে এক বালককে দেখে আল্লাহর রসুল বলে উঠেন যে, সে বড় হবার আগেই কেয়ামত হবে। (সহি মুসলিম, হাদিস নং-৭০৫২) আল্লাহর উচ্চতা ৬০ হাত (সহি মুসলিম, হাদিস নং-৬৮০৯) আল্লাহর আকৃতি মানুষের মত। তিনি নিজের আদলে প্রথম মানব আদমকে সৃষ্টি করেছেন। (সহি মুসলমি, হাদিস নং - ২৮৭২ এবং ৬৩২৫) যে মাটি দিয়ে আল্লাহ্ হযরত আদমকে সৃষ্টি করেছেন, তার মধ্যে লাল, হলুদ ও কালো রঙের মাটি মেশানো ছিল। সে কারণে আদমের বংশধরদের কেউ লাল কেউ হলুদ এবং কেউ কালো। হিসাব অনুসারে প্রত্যেক আদমের দেহের কিছু অংশ লাল, কিছু অংশ হলুদ এবং কিছু অংশ কালো হওয়ার কথা; কিন্তু তা কেন হল না বুঝা মুশকিল। আল্লাহ্ বেহেস্তে ছায়াযুক্ত গাছপালার লোভ দেখালেও পৃথিবীর ব্যাপারে কিন্তু অন্য রকম বলেছেন। বলেছেন, "ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে, আমি তা সবই উদ্ভিদশূন্য পরিষ্কার মাঠে পরিণত করে দেব। (কোরান-১৮/৮)

ইসলামের ইতিহাসের 'ন্যায় বিচারের' উদাহরণ আছে প্রচুর। একটি ন্যায় বিচার দেখা যায়, কুরানের ৪/৬০ নং আয়াতের শানে নুযুলে। "একদিন এক ইহুদির সাথে এক মুনাফেকের ঝগড়া বেঁধে গেলে তারা বিচারের জন্য নবীর কাছে এলে তাঁর 'রায়' ইহুদির পক্ষে গেল। ফলে মুনাফেক ঐ 'রায়' না মেনে ওমর ফারুকের কাছে গেল। তিনি সব শুনে বললেন, যে ব্যক্তি নবীর 'রায়' মানতে পারে না, তার জন্য 'রায়' হল ... । এই বলে তরবারির এক আঘাতে মুনাফেকের ধড় থেকে মাথা আলাদা করে ফেলল। আর তখন থেকে ওমর 'ফারুক' অর্থাৎ ন্যায় বিচারক উপাধিতে ভূষিত হলেন।

খয়বর যুদ্ধের পর আর একটি ন্যায় বিচারের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। ইহুদিরা পরাজয়ের পর আত্মসমর্পণ করলো। আল কামুস দূর্গ হস্তান্তর করার আগে ঠিক হল যে, দূর্গবাসী সবাইকে ছেড়ে দিতে হবে। তবে তাদের সমস্ত সম্পত্তি মুসলমানের দিয়ে দেবে। দূর্গ

থেকে সকলের আগে কানানা তার ভাইপোকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে এল। মুহাম্মদ তখন কানানার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন যে, সে তার সমস্ত সম্পত্তি মুসলমানের হাতে তুলে দেয়নি। বিশেষ করে স্ত্রী সোফিয়ার সাথে বিয়ের যে সমস্ত মূল্যবান সামগ্রী যৌতুক হিসাবে পেয়েছিল, তার একটি বড় অংশ সে কোথাও গোপন রেখেছে। এখানে বলে রাখা উচিত হবে যে, কুরাইজাদের গণহত্যার সময় সোফিয়ার বাবাকেও হত্যা করা হয়। "কোথায় সে সব সোনার থালা বাসন, যা তুমি মক্কার লোকদের ধার দিতে?" নবী কানানাকে জিজ্ঞেস করলে কানানা বলল যে, সেরকম কোন জিনিস তার কাছে ছিল না। রেগে গিয়ে নবী বললেন, 'যদি জানতে পারি তুমি লুকাচ্ছ তবে তোমার ও তোমার পরিবারের সকলের জীবন বিপন্ন হবে।" উপরোক্ত সংবাদের মধ্যে সত্য ছিল এবং এক জন ইহুদি আকার ইঙ্গিতে জানিয়ে দিল কোথায় লুকানো আছে ঐ সব সম্পদ। নবীর লোক যখন তা খুঁজে বের করে আনলো, তখন কানানকে বিচারের সম্মুখীন করা হল। নবীর আদেশে প্রথমে তাকে চিৎ করে শুইয়ে তার বুকের উপর জ্বলন্ত আগুন রাখা হল। এরপর অপর এক আদেশে কানানা ও তার ভাইপোর মাথা ধর থেকে আলাদা করে ফেলা হল। ইতিমধ্যে হাবসী বিল্লাল দুর্গের ভিতর থেকে ১৭ বছর বয়সী সোফিয়া ও তার সহচরীকে বাইরে নিয়ে এল। ইচ্ছা করেই যেখানে কিনানা ও সোফিয়ার অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের মৃতদেহ পড়ে আছে, সেই পথ দিয়ে সোফিয়াকে নবীর কাছে নিয়ে এল। নবী নিজের অঙরাখা (পরিচ্ছদ) সোফিয়ার গায়ে জড়িয়ে দিলেন। পিতা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের রক্তের উপর দাঁড়িয়েই নবীর সাথে সোফিয়ার বিবাহ কার্য সুসম্পন্ন হল।

আর একটি বিচার উল্লেখ করে ন্যায়বিচার সম্পর্কে আলোচনা শেষ করবো। একবার উকল গোত্রের কয়েকজন লোক মদিনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করলে নবী তাদের উপর খুব সদয় হন। এরা সংখ্যায় ছিল ৮ জন। (সহি মুসলিম, হাদিস নং- ৪১৩০ ও ৪১৩২) কিন্তু মদিনার জলবায়ু সহ্য না হওয়ায় তারা অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী তখন তাদের একটা উটের আস্তাবলে বিশ্রামের ব্যবস্থা করলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তারা সুস্থ হয়ে উঠলো এবং আস্তাবলের দারোয়ানকে হত্যা করে উটগুলো নিয়ে পালালো এবং সেই সঙ্গে ইসলাম ত্যাগ করলো। সব শুনে নবী খুব ক্রুদ্ধ হলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই নবীর অনুচরো তাদের ধরে এনে নবীর সামনে হাজির করালো। তিনটি গুরুতর অপরাধে তারা অপরাধী ছিল। এগুলো হল —

১। অমুসলমান মুসলমানকে হত্যা করলে শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

২। ইসলাম ত্যাগ করলে মৃত্যুদণ্ড। ও

৩। চুরির অপরাধে হাত কেটে ফেলা।

আল্লাহর রসুল প্রথমে দু'টি লোহার শিক আগুনে পুড়িয়ে লাল করে নিলেন এবং অপরাধীদের নিজ হাতে চোখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। তারপর একটা ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাদের হাত পা কেটে আলাদা করে ফেললেন এবং ঐ অবস্থায় দুপুরের চড়া

রোদে মরুভূমির তপ্ত বালির উপর শুইয়ে রাখলেন। তারা পানি খেতে চাইলে নবী তা দিতে সবাইকে নিষেধ করলেন। এভাবে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তারা মারা গেল।

["Anas b. Malik reported that some people belonging (to the tribe) of 'Uraina came to Allah's Messenger (may peace be upon him) at Medina, but they found its climate uncogenial. So Allah's Messenger (may peace be upon him) said to them: If you so like, you may go to the camels of Sadaqa and drink their milk and urine. They did so and were all right. They then fell upon the shepherds and killed them and turned apostates from Islam and drove off the camels of the Prophet (may peace be upon him). This news reached Allah's Apostle (may peace be upon him) and he sent (people) on their track and they were (brought) and handed over to him. He (the Holy Prophet) got their hands cut off, and their feet, and put out their eyes, and threw them on the stony ground until they died." Taken from 'Sahi Muslim, Book 016, Number 4130]

নবীর নিজ হাতে দেয়া উপরোক্ত শাস্তি কি মানবিকতা লঙ্ঘিত হয়েছে? না হয়নি। আল্লাহ্ বললেন, "যারা আল্লাহ্ ও রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি উৎপাদন করে, নিশ্চয়ই তাদের শাস্তি এই যে, তাদের হত্যা করা হবে কিংবা শূলে চড়ানো হবে। অথবা তাদের হাত পা বিপরীত দিক হতে কেটে ফেলা হবে অথবা তাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। ইহাই তাদের পার্থিব প্রতিফলন এবং পরকালেও তাদের জন্য রয়েছে বিষম শাস্তি। (কোরান- ৫/৩৩)

আল্লাহ্ তার নবীর মাধ্যমে যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞান দিয়েছেন, প্রতিষ্ঠা করেছেন ন্যায় বিচার; আবার উচ্ছেদ করেছেন ইসলামের সংজ্ঞায়িত কুসংস্কার। পালিত পুত্রকে পুত্র মনে করা একটি কুসংস্কার। ধর্ম পিতা, মাতা, ভাই, বোনকে প্রকৃত সম্পর্ক মনে করাও কুসংস্কার। আল্লাহ্ এ সকল বদ রুসুম দূর করার দায়িত্ব দিলেন নবীজীকে। সেমতে নবীজী নিজের পালিত পুত্র জায়েদ বিন হারিসকে বাধ্য করলেন তার স্ত্রী জয়নবকে তালাক দিতে এবং এর পর তিনি তাকে বিয়ে করে নিলেন। এছাড়া বয়স সম্পর্কে কুসংস্কার দূর করার মানসে ২৫ বছরের যুবক নবীজী বিয়ে করলেন ৪০ বছরের ২/৩ বারের বিধবা খাদিজাকে। ৫২ বছরের প্রৌঢ় ৬ বছরের বালিকা আয়েশাকে বিয়ে করে আর এক ধরনের কুসংস্কার দূর করলেন। ইসলাম পূর্ব আরবে রক্ত সম্পর্কের মধ্যে পাত্র-পাত্রীর মধ্যে বিবাহ না যায়েজ ছিল। আল্লাহর রসুল রক্ত সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ যায়েজ করে ইসলামপূর্ব আরবের বদ রসুম ও কুসংস্কার দূর করেন। অন্যের স্ত্রী, মেয়ে, শিশু লুঠপাট করে ভাগ বাটোয়ারা না করার বা ধর্ষণ না করার যে বদ রসুম চালু ছিল, তা আল্লাহ্ দূর করে দেন কোরানে ৪/২৪ নং আয়াত নাযিল করে। অপরের দ্রব্য

লুঠ করাকে কুসংস্কার বশতঃ আরবের লোকেরা অন্যায় মনে করতেন। আল্লাহ কোরানে ৮/৬৯ নং আয়াত নাযিল করে তা বৈধ ঘোষণা করে কুসংস্কার দূর করেন। বিভিন্ন জায়গা থেকে বিধর্মী ধরে এনে আটক করে মুক্তিপণ আদায় আল্লাহর রসুল বৈধ করেছেন। কুরাইজা নামক ইহুদি গোষ্ঠির ৮০০ জন পুরুষ সদস্যকে নৃশংস ভাবে হত্যা করে (আগেও বলা হয়েছে) নবীজী ইসলামপূর্ব অসভ্য সমাজের বুকে ইসলামের 'জ্যোতি ও ন্যায় বিচার' প্রতিষ্ঠা করলেন। পবিত্র মাসে বনি আমর গোত্রের লোকেরা পশু বা কোন প্রাণী হত্যা করতো না, আমিষ আহার করতো না। এ কুসংস্কারও আল্লাহ পবিত্র আরব ভূমি থেকে দূর করে দেন। আরবে আর একটি বদ রসুম ও কুসংস্কার চালু ছিল যে, ঈশ্বরের নিকট সকলেই সমান; কিন্তু আল্লাহ ৩/১৬৩ নং আয়াত নাযিল করে জানিয়ে দিলেন যে, আল্লাহর কাছে মানুষ মর্যাদার বিভিন্ন স্তরের; সমান নয়।

এক সময় মহাকাশ সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, উহা একটি মহাশূন্য এবং পাহাড় পর্বত প্রাকৃতিক কারণে সৃষ্টি হয়। কিন্তু আল্লাহ যেহেতু মহাবিজ্ঞানী তাই তিনি প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করে কোরানের ৩১/১০ নং আয়াতে জানিয়ে দিলেন যে, আসমান হল পৃথিবীর ছাদ এবং আল্লাহ স্তম্ভ ছাড়া তাকে স্থাপন করেছেন। কেয়ামতের দিন তা ভেঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে পৃথিবীতে ঝরে পড়বে। আর আল্লাহ পর্বতমালা স্থাপন করেছেন যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে। আগে আরও একটি কুসংস্কার ছিল যে, মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়। আল্লাহ বললেন, না আমি আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছি। পূর্ববর্তী নবীজীরা ও মহাপুরুষরা মনে করতেন ধর্ম যার যার স্বাধীন ব্যাপার। আল্লাহ বললেন, না একমাত্র আমাকেই মানতে হবে। ইসলাম ছাড়া অন্য কেন ধর্ম নেই। এ কথা না মানলে গর্দান যাবে এবং তাদের সহায় সম্পদ, বউ, ছেলে, মুমিন মুসলমানের মাঝে বন্টন করে দেয়া হবে। আল্লাহ প্রকাশ্যে নৃশংসভাবে শাস্তি দেওয়ার পক্ষপাতি, যাতে আল্লাহর কঠোরতা সম্পর্কে মানুষ জানতে পারে। আল্লাহ ভিন্নধর্মী ও ভিন্ন মতাবলম্বীদের পছন্দ করেন না এবং সহ্যও করেন না। সেকারণে নবীজীকে বলে দিয়েছেন, পবিত্র আরব ভূমি থেকে এদের উৎখাত কর। ইসলামে দীক্ষিত কর অথবা হত্যা করে তাদের যা কিছু আগে তা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নাও। একতরফা আচমকা আক্রমণ, গুপ্তহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ করা আল্লাহর পছন্দ। আল্লাহ সন্ন্যাসী, কবি-সাহিত্যিক, নাচ-গান পছন্দ করেন না। তিনি চান জেহাদ, আচমকা বিধর্মীর উপর আক্রমণ। পিতা-মাতার পায়ের নিচে সন্তানের বেহেস্ত হলেও আল্লাহ পিতা-মাতা বিধর্মী কাফের হলে তাদের হত্যা করা যায়েজ (বৈধ) করেছেন। আল্লাহ নবীদের প্রয়োজনে মিথ্যা বলতেও প্ররোচনা দেন। নবী ইব্রাহিম নিজে মূর্তি ভেঙে অন্যের উপর দোষ চাপিয়েছিলেন। শান্তিপ্রিয় মানুষ আল্লাহর পছন্দ নয়।

ইসলামের আগে নারী জাতির মর্যাদা ছিল না চীৎকার করে জানান দিচ্ছে মুসলিম দুনিয়া। আল্লাহ মর্যাদা ঘোষণা করে বললেন, স্ত্রী শস্যক্ষেত্র; পুরুষ সেখানে যেমন খুশি যেতে পারে। (কোরান-২/২২৩) এই সঙ্গে আল্লাহ মোহর দিতে বলেছেন এবং ইসলামী

আইনবেত্তাদের মতে স্ত্রীর একটি অঙ্গ ভোগ করতে হলে কমপক্ষে ১০ দিরহাম মূল্য দেওয়া উচিত। আল্লাহ্ বলেছেন, সহবাসের পূর্বে তালাক দিলে মোহর দিতে হবে না। ইসলামের পূর্বে আর একটি বদ রসুম ছিল যে, দাসীদের সাথে সহবাস করা হারাম। আল্লাহ্ এ কুসংস্কারও দূর করে দাসীদের ভোগ করা যায়েজ ঘোষণা করলেন। (কোরান- ৭০/৩০, ৪/২৪)

এইভাবে আল্লাহ্ আরব তথা বিশ্বের অন্ধকার কুসংস্কার দূর করার মানসে নিজের বন্ধুকে পাঠিয়ে কুসংস্কার ও বদ রসুম দূর করে আরব তথা বিশ্বকে আলোকিত করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, এখন যথেষ্ট ভাল সংখ্যক মুসলমানই আল্লা হ্‌র ঐ সব নির্দেশ না মেনে পূর্ববস্থায় ফিরে যাচ্ছেন। রোজা, ঈদ, হজ্ব, আরবী নাম ব্যবহার, এগুলো ইসলাম পূর্ব আরবেই ছিল। 'খতনা' সম্পূর্ণরূপেই ইহুদিদের প্রথা। ইহুদিরা ইসলামে আসলে প্রথাটি মুসলমানের মধ্যে চালু হয়ে যায়। আযান আল্লাহ্ বা নবী ঠিক করে দেননি। এটি নবীর এক অনুচরের স্বপ্নে দেখা এবং নবী তা অনুমোদন করেন। আল্লাহ যে সব বদ রসুম দূর করলেন, তা হল মুক্তিপণ আদায়, বিধর্মী হত্যা, বিধর্মী মেয়ে বউ আটক করে ধর্ষণ, দাসী সহবাস, লুণ্ঠন করা, বিধর্মীদের উৎখাত করা ও তাদের সম্পদ মেয়ে-বউ, ভাগ-বোটায়ারা করা, মন্দির ও প্রতিমা ধ্বংস এবং ছবি আঁকা, কবিতা লেখা, গান-বাজনা করা ইত্যাদি নিষিদ্ধ করলেন। কিন্তু এসব কর্মকাণ্ড এখন কাঠ-মোল্লা ছাড়া আর কোন মুসলমান পালন করছেন না। লাদেন-নিযামী-গোলাম আযমের মত কাঠ-মোল্লারা খাঁটি ইসলামী ধারায় জেহাদ শুরু করেছে।

ইদানিং জেহাদ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। আসলে ইচ্ছাকৃত ভাবে এ ভুল ধারণা সৃষ্টি করা হয়েছে। কারণ মানুষ জেহাদী হতে চায় না, আবার ধর্ম ত্যাগও শোভনীয় নয়। কোনমতে গোঁজা মিল দিয়ে ইসলামে আঁকড়ে থাকার চেষ্টা। ইসলামে "জেহাদ হল ইসলামী বেলাম জাষ্টাম বা ইসলামী সত্য বা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ। সব বিশ্বাসীর প্রতি আল্লাহ্‌র এই আদেশ 'আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই' একথা না বলা পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধ কর। ইসলামে বিশ্বাস স্থাপন না করার জন্য অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করাই জেহাদের উদ্দেশ্য (মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন, পৃ-৬৩) দিনে বা রাতে আক্রমণ করা যেতে পারে এবং শত্রুর দূর্গগুলি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলা বা পানি দিয়ে প্লাবিত করা বা ম্যাগনোলেন দিয়ে আক্রমণ করা অনুমোদন যোগ্য (পৃ- ১০৩, ১০৮, ১১২) আল্লাহ্‌র নবী (পবিত্র মাস) মুহারমের শুরুতে আল তায়েফের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন এবং সফর মাসে তা দখল না করা পর্যন্ত চল্লিশ দিন যাবৎ অভিযান অব্যাহত রাখেন (পৃ-১০১) পবিত্র মাস সমূহে যুদ্ধ বন্ধ, এই প্রথা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ বাতিল করে দেন।

কোন মুসলিম শহর বা মুসলমান অধীন কোন শহরে জিম্মিদের সিনাগগ, গীর্জা বা অগ্নি উপাসনার কোন মন্দির নির্মাণের অনুমতি দেওয়া যাবে না .... নবী তাদের মদিনা থেকে বহিষ্কার করেন ...... খলিফা আলী তাদের কুফা থেকে বহিষ্কার করেন।

(পৃষ্ঠা- ২৯৯) মুসলমানরা বহুত্ববাদীদের আক্রমণ করে তাদের মহিলা ও শিশুদের বন্দী করলে এবং পুরুষদের যুদ্ধবন্দী করলে মেয়েরা ও শিশুরা অমুসলমানদের নিকট হতে বিনা যুদ্ধে অর্জিত সম্পত্তির মত ভাগাভাগি করে নেওয়া যাবে। পুরুষরা ইসলাম গ্রহণ না করলে হত্যা করা হবে। (পৃষ্ঠা- ২৩৮) অমুসলমান যদি মুসলমানকে টাকা ধার দেয় বা সম্পত্তি গচ্ছিত রাখে তাহলে দেনাদারকে এ টাকা শোধ দিতে হবে না। (পৃ-১৩৭) মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ। এই হল ইসলামী আইন।

এবার একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে আসা যাক। কোরানের বিভিন্ন জায়গায় কোরান পাঠ, কোরান নাজিল ইত্যাদি সম্পর্কে বলা হয়েছে। যেমন, কোরানের ২০/১-২ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "কোরান নবীর জন্য নাযিল হয়নি বরং যে ভয় করে তার জন্য নাযিল করেছি।" কোরানের ২০/১০০ তে বলা হয়েছে, "যে কোরান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে কেয়ামতের দিন শাস্তির বোঝা বহন করবে বা কোরানের ২০/১২৪ নং আয়াতে কেয়ামতের দিন কোরানবিমুখ ব্যক্তিদের অন্ধ অবস্থায় উঠানো হবে। তাহলে কোরান কোনটি?

এই আয়াতগুলির বক্তা কে? বাক্যগুলো থেকে স্পষ্ট, কথাগুলি তৃতীয় কোন ব্যক্তির মুখ থেকে এসেছে। সমগ্র কোরানের অধিকাংশ আয়াতের বক্তা এই তৃতীয় ব্যক্তি কে?

আবার দেখা যাচ্ছে আগের নবীদের একই কাহিনী বিভিন্ন সুরায় বার বার বলা হয়েছে। এইসব নবীদের মধ্যে প্রধান হলেন —

(১) নবী আদম; (২) নবী নূহ ;
(৩) আদ জাতির নবী হুদ; (৪) নবী ইব্রাহিম;
(৫) নবী লুত ; (৬) নবী মুসা ;
(৭) নবী তালুত ; (৮) নবী দাউদ;
(৯) নবী সলোমান।

এসব কাহিনী নবী এক খৃষ্টান সাধুর কাছে শুনেছিলেন তা প্রথমেই বলা হয়েছে।

নবী মুহাম্মদ মারা যাবার পর তার সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে আরও তিনজন নিজেদেরকে নবী ঘোষণা করেন। তালহা, মুসাইলিমা ও আল আসোয়াদ। প্রথম খলিফা আবু বকর মুসাইলিমার বিরুদ্ধে এক অভিযান প্রেরণ করেন এবং ইয়োমানা নামক স্থানে মুসলমানদের সাথে মুসাইলিমার বাহিনীর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে বেশ কয়েকজন হাফিজ মারা যায়। এই ঘটনায় ওমর খুব চিন্তিত হন। কারণ আর যে কয়জন হাফিজ অবশিষ্ট আছেন তারা মারা গেলে কোরান শরীফই লুপ্ত হবে। আবুবকর এবং ওমর মুহাম্মদের সহকারী যায়েদ বিন সাবিত-এর উপর কোরান লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব অর্পণ করেন। যায়েদের সংকলিত কোরানই হল বর্তমান কোরান। ওমর মারা যাবার পর ওসমান খলিফা হয়ে সিরিয়ায় গিয়ে দেখেন সেখানকার মুসলমানরা যে কোরান

পাঠ করছে তা যায়েদ কর্তৃক সংকলিত কোরান থেকে আলাদা। তার আদেশে ঐ সমস্ত কোরানের কপি পুড়িয়ে ফেলা হয়। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, কোরান সংকলনে কি কোন ত্রুটি ছিল? সঠিক কোরান কি যায়েদের সম্পাদিত কোরান না সিরিয়ায় পঠিত কোরান, যেটি ওসমানের আদেশে ধ্বংস হয়েছে?

আবার কোরান যে আল্লাহর বাণী তা তৎকালীন আরবের লোকেরা বিশ্বাস করতে চাইত না, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। তারা মনে করতেন মুহাম্মদের একজন সাহায্যকারী আছে। এর জবাবে আল্লাহ বলেছেন, "আমি তো জানিই তারা বলে তাকে (মোহাম্মদকে) শিক্ষা দেয় এক মানুষ। ওরা যার প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করে তার ভাষা তো আরবী নয়, কিন্তু কোরানের ভাষা তো স্পষ্ট আরবী। (কোরান-১৬/১০৩) এখানে লক্ষ করার বিষয় হল আল্লাহ অস্বীকার করছেন না যে, তার কোন সাহায্যকারী ছিল না। তিনি শুধু এইটুকুই বলতে চান যে, সেই সাহায্যকারী অন্য ভাষাভাষী। তার সাহায্যে আরবীতে কোরান নাজিল হয় কি করে?

যে কেউ কোরানের অংশ বিশেষ পাঠ করলেই বুঝতে পারবেন যে, রচনাকারীর বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে বর্ণিত ঘটনাবলীতে ভাল দখল ছিল। মুহাম্মদের বয়স যখন ১২ বছর তখন তার চাচা আবু তালেবের সাথে সিরিয়ায় যান এবং মুহাম্মদ তার সঙ্গী হন। সে কথা পূর্বেই বলেছি। সেখানে এক খৃষ্টান সাধুর সাথে পরিচয় ঘটে তাও বলেছি। মুহাম্মদের বয়স যখন ২৫ বছর তখন খাদিজার কর্মচারী হিসেবে তিনি আরও একবার সিরিয়ায় বাণিজ্য করতে যান। সেবার তিনি সেখানে দু'মাস কাটান এবং তাওরাত ও ইঞ্জিলের সাথে আরও গভীরভাবে পরিচিত হন। এখানে বেশ কয়েকজন ধর্মীয় পণ্ডিতদের সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে এখানকার কেউ যে তাকে সাহায্য করতেন সে বিষয়ে সবাই একমত। তবে তিনি কে, এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। সবচেয়ে বেশী সন্দেহ করা হয় যার প্রতি তিনি হলেন পারস্যের ইস্পাহান নিবাসী সলমন নামে এক ব্যক্তিকে। ইনি পারস্য থেকে সিরিয়ায় সাধু বুহায়রার সাথে মিলিত হন। বুহায়রা তাকে আরবে মুহাম্মদের কাছে পাঠান। সেই অনুসারে তিনি মদিনায় এসে মুহাম্মদের সাথে মিলিত হন। হিযরত কালে নবী যখন কোবা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন, তখন সলমন সেখানে মুহাম্মদের সাথে প্রথম সাক্ষাত করেন। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরই নবী বুঝতে পারলেন যে, এই সেই ব্যক্তি যাকে তিনি খুঁজছেন। তার মানে মুহাম্মদ পূর্বেই জানতেন তার কাছে কাউকে পাঠানো হবে। কিন্তু নবীজী তাকে চিনতেন না। সলমনের মাতৃভাষা ছিল ফার্সী। প্রশ্ন আসে, সলমন কি খৃষ্টান ইনটেলিজেন্স কর্তৃক রিক্রুট করা? কোরানের আয়াতগুলি কোন না কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে নাজিল হওয়া। অতএব, সাহায্যকারী যে ছিল তা নিম্নোক্ত ঘটনাবলীতেও পরিষ্কার। যখন কুরাইশরা নবীকে আসহাবে কাহাফের ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো, তখন নবী শুধু ইনশাল্লাহ বলা ছাড়া বললেন যে, কাল এস, বলে দেব। অতএব ১৫ দিন পর্যন্ত ওহী আসা বন্ধ ছিল। এতে নবী খুবই পেরেশান হলেন। অতপর জিব্রাইল

যখন কাহিনী নিয়ে এলেন, তখন রসুল বললেন, আপনি তো খুব দেরী করে ফেলেছেন। হয়তো বা সাধু বুহায়রা বা অন্য কেউ সব কলকাঠি নাড়ছিলেন। যারা চেষ্টা করছিলেন মক্কার প্রাধান্য নষ্ট করে মূর্তিপূজক ও ইহুদিদের মধ্যে ধর্ম বিশ্বাসের ভীত দুর্বল করা এবং শেষে খৃষ্টধর্ম প্রচার করা। খ্রীষ্টান দাসী রক্ষিতা কি সেই চক্রান্তের অংশ? যিনি মুহাম্মদের মৃত্যুর পরপরই উধাও হয়ে যায়। বিবি খাদিজাও মনে হয় সেই খ্রীষ্টানী চক্রান্তের অংশ হিসাবে মুহাম্মদের পত্নী হয়েছিলেন। মারিয়া মহম্মদকে এতখানি প্রভাবিত করেন যে, মহম্মদ তার জন্য একটি আলাদা বাগানবাড়ী করে দেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় খ্রীষ্টানী চক্রান্ত এমনই হয়। ভারত উপমহাদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে সুবিধা করতে না পেরে এক সাধারণ ভদ্রলোক রামমোহন রায়কেরাজা উপাধি দিয়ে হিন্দুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির কাজে লাগান এবং ব্রাহ্ম সমাজ নামে একটি আলাদা ধর্ম সৃষ্টি করাতে সক্ষম হন। যদিও ইংরেজ বিদায়ের সাথে সাথে ব্রাহ্ম সমাজ কার্যত বিলুপ্ত হয়েছে। সলমন গং কি মুহাম্মদকে দিয়ে এমন একটি আলাদা ধর্ম সৃষ্টি করাতে চেয়েছিলেন? এই তো সেদিন আমেরিকা যখন আফগানিস্থান ও ইরাকআক্রমণ করলো, তখন লোকের মুখে মুখে ছিল লাদেন এবং সাদ্দাম আমেরিকার সৃষ্টি। হয়তো বা মুহাম্মদের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। আবু তালেব হয়ত ঘটনাটি জানতেন। তিনি মুহাম্মদের চাচা। প্রথম থেকে তো বটেই মৃত্যুকালে তার শিয়রে বসে একবার কলেমা পড়তে অনুরোধ করলেও আবু তালেব মৃত্যুর কোলে থেকেও কলেমা পড়তে অস্বীকার করেন। কোরান হাদিসের এ ঘটনা জানতেন অনেকেই। সাধু বুহায়ারের মধ্যে কিন্তু ক্ষণকালের মধ্যে সে আগুনের লেলিহান শিখা দাবানল হয়ে আরব ছাপিয়ে ইরান ইরাক আফগানিস্থান পাকিস্তান হয়ে ভারত ভূমিতে এসে কিছুটা স্তিমিত হয়। কিন্তু সে আগুন একেবারে নিভে যায়নি বরং এখন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে এবং তার লেলিহান জিহ্বা মাঝে মাঝেই আতঙ্কিত করছে সভ্যতাকে।

***

ড. আম্বেদকরের দৃষ্টিতে মুসলমানদের ভারত আক্রমণ

[Translated from Dr. Ambedkar's 'Pakistan or The Partition of India' ('90), pp- 54-63]

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা উত্তর পশ্চিমের মুসলমান যাযাবর শ্রেণীর ভারত আক্রমণ। মহম্মদ-বিন-কাশিমের নেতৃত্বে আরবীয়দের ভারত আক্রমণ। ৭১১ খ্রীস্টাব্দে এই ঘটনা ঘটে। আক্রমণকারীরা সিন্ধু জয় করেন। ..... এর পর ১০০১ খ্রিস্টাব্দে গজনির মাহমুদ বেশ করেকবার ভারত আক্রমণ করেন। ১০৩০ খ্রিস্টাব্দে মাহমুদের মৃত্যু হয়। কিন্তু মাত্র ৩০ বছরের রাজত্বকালের মধ্যে তিনি ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেন। মাহমুদের পর ১১৭৩ খ্রিস্টাব্দে ভারত আক্রমণ করেন মহম্মদ ঘোরি। ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিহত হন। ৩০ বছর ধরে মামহুদ যেমন ভারতকে বিধ্বস্ত করেন, একই ভাবে সেই ভূমিকা পালন করেন মহম্মদ ঘোরি। এরপর ১২২১ খ্রিস্টাব্দে ঘটল চেঙ্গিজ খানের নেতৃত্বে মোঙ্গোলদের বহিরাক্রমণ।.... ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দে তৈমুরের নেতৃত্বে বহিরাক্রমণ ছিল এই পর্যায়ের ভয়ঙ্করতম ঘটনা। তারপর ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে আর এক আক্রমণকারীর ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করলেন বাবর। ... ১৭৩৮ খ্রিস্টাব্দে ঘটল উত্তাল সমুদ্রোচ্ছ্বাসের মত নাদির শাহের পাঞ্জাব আক্রমণ; আর ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে পানিপথে মারাঠা শক্তিকে বিচূর্ণ করে ঘটল আহম্মদ-শাহ-আবদালির ভারত আক্রমণ।

শুধুমাত্র লুঠতরাজ কিংবা জয়ের আকাঙ্খাই মুসলমানদের এই সব আক্রমণের কারণ ছিল না। এর পিছনে ছিল একটি ভিন্ন উদ্দেশ্য। মহম্মদ-বিন-কাশিমের সিন্ধু-অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল সিন্ধুরাজ দাহিরের বিরুদ্ধে একটি শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়া। ..... হাজ্জাজকে লেখা মহম্মদ-বিন-কাশিমের একটি পত্র থেকে জানা যায়।

"রাজা দাহিরের ভ্রাতুষ্পুত্র, তাঁর সেনানী ও প্রধান অফিসারদের খুন করা হয়েছে এবং অবিশ্বাসীদের হয় ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হয়েছে, নয়ত হত্যা করা হয়েছে। পুতুল পুজোর মন্দিরগুলির জায়গায় মসজিদ তৈরি করা হয়েছে। পবিত্র খুতবা [Kutbah] পাঠ করা হয়েছে, নামাজের জন্য আহ্বান (আযান) জানানো হচ্ছে এবং তা হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ে উপাসনা করার জন্য। প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র প্রতি তকবির ও স্তুতি নিবেদন করা হচ্ছে।" [Indian Islam by Dr. Titus, p-10]

এই সংবাদটির সংগে পাঠানো হয় রাজা দাহিরের ছিন্নমুণ্ড। এর উত্তরে হাজ্জাজ তাঁর সেনাপ্রধানকে জানান ঃ

"উচ্চ নীচ সকলকে রক্ষা করার সময় শত্রু ও মিত্রের মধ্যে কোনও বৈষম্য করবে না। খোদা বলেন — নাস্তিকদের বিন্দুমাত্র ক্ষমা না করে তাদের গলা কেটে ফেল। এটাই মহান খোদার আদেশ। রক্ষা করার ক্ষেত্রে বেশি প্রস্তুতির দরকার নেই।

কারণ তা হলে তোমার কাজ পিছিয়ে যাবে। একমাত্র উচ্চপদাধিকারী ছাড়া কোনও শত্রুকে ক্ষমা করবে না।" [Ibid, p-10]

গজনির মাহমুদের অভিযান সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ঐতিহাসিক আল উত্‌বি [Al' Utbi] লিখেছেন, "তিনি মন্দির ধ্বংস করে ইসলামের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি অধিকার করেছেন .... বহু নগর। কলুষিত হতভাগাদের [polluted wretches] খুন করেছেন এবং পৌত্তলিকদের হত্যা করে মুসলমানদের তুষ্ট করেছেন। 'স্বদেশে ফিরে এসে ইসলামের জন্য অর্জিত গৌরবের মূল্যায়ন করেছেন .... তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, প্রতি বছর তিনি হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে পবিত্র যুদ্ধ ঘোষণা করবেন'।" [Ibid, p-11]

মহম্মদ ঘোরি সম্পর্কে ঐতিহাসিক হাসান নিজামি লিখেছেন ঃ

"তিনি তাঁর তরবারি দ্বারা হিন্দুস্থানকে ধর্মীয় অবিশ্বাসের নোংরামো এবং পাপ থেকে মুক্ত করেন ; বহুদেবত্ববাদ ও মূর্তিপুজোর মত অপবিত্রতার কন্টক থেকে দেশকে মুক্ত করেন। তার রাজকীয় সাহসিকতা ও উৎসাহের কারণে একটি মন্দিরও দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি।" [Ibid, p-11]

তৈমুর তাঁর স্মৃতি কথায়, "হিন্দুস্তান আক্রমণের ক্ষেত্রে আমার উদ্দেশ্য ছিল সেখানকার নাস্তিকদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা এবং মহম্মদের (তাঁর এবং তাঁর পরিবারের প্রতি খোদার আশীর্বাদ ও শান্তি বর্ষিত হউক) নির্দেশ অনুসারে তাদেরকে (ইসলামের) মহাসত্যে দীক্ষিত করা, বহুত্ববাদ ও অবিশ্বাসের অপবিত্রতা থেকে দেশটিকে মুক্ত করা এবং সব মন্দির ও মূর্তি ধ্বংস করা। এ কাজ করে খোদার কাছে আমরা গাজি ও মুজাহিদের স্বীকৃতি পাব এবং ইসলামের (faith) সহযোগী ও সৈনিক হিসাবে মান্যতা পাব।" [Quoted by Lane Poole in *Medieval India*, p- 155]

ভারত অভিযানের সময় আফগানরা তাতারদের এবং মোঙ্গোলরা তাতার ও আফগান উভয় সম্প্রদায়কেই ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধের বাঁধনে তাঁরা কোন সুখী পরিবারের সদস্য হতে পারেননি। একের সঙ্গে অপরের ছিল মরণমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কিন্তু হিন্দু ধর্মকে নির্মূল করার ব্যাপারে তাঁরা সবাই ছিলেন ঐক্যবদ্ধ।

মহম্মদ-বিন-কাশিমের ধর্মোন্মত্ততার প্রথম প্রকাশ ছিল, অধিকৃত দেবুল শহরের ব্রাহ্মণদের খৎনা দেওয়া *('to circumcise') অর্থাৎ পুরুষদের লিঙ্গের অগ্রভাগের চামড়া কেটে ফেলা)* । কিন্তু ধর্মান্তরিতকরণের এই পথ অবলম্বন করতে গিয়ে যখন তিনি বাধা পেলেন তখন ১৭ বছরের বেশি বয়সের সবাইকে হত্যা করলেন এবং নারী ও শিশুসহ বাকি সকলকে ক্রীতদাসে পরিণত করার আদেশ দিলেন। তিনি হিন্দুদের মন্দির লুঠ করলেন এবং বহুমূল্যের লুণ্ঠিত সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ, যা সরকারের প্রাপ্য, সরিয়ে রেখে বাকিটা তিনি সৈনিকদের মধ্যে সমভাবে বন্টন করে দিলেন।

হিন্দুদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করতে পারে শুরু থেকেই এমন সব পদ্ধতি অবলম্বন করেন গজনির মাহমুদ। ১০০১ খ্রিস্টাব্দে রাজা জয়পালকে পরাজিত করে তিনি আদেশ দেন যে, রাজাকে বন্দী করে যেন "প্রকাশ্য রাস্তা-ঘাটে ঘোরানো হয়, যাতে

তাঁর সন্তান-সন্ততি ও সেনাপ্রধানরা তাঁকে এমন লজ্জিত, শৃঙ্খলিত এবং অপমানিত অবস্থায় দেখতে পায় এবং এভাবেই দেশের সর্বত্র বিধর্মীদের মধ্যে ইসলাম ভীতি ছড়িয়ে পড়তে পারে।"

ড. টিটাস তাঁর 'ইন্ডিয়ান ইসলাম' গ্রন্থে (পৃ-২২) বলেছেন —

"বিধর্মীদের খুন করার মত অপকর্ম মাহমুদকে বিশেষ আনন্দ দিত বলে মনে হয়। ১০১৯ খ্রিস্টাব্দে চাঁদ রায়ের রাজ্য আক্রমণ করার সময় অসংখ্য বিধর্মীকে হত্যা অথবা বন্দি করা হয়। বিধর্মী এবং সূর্য ও অগ্নির উপসাকদের খুন করে পরিতৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত মুসলমানরা লুণ্ঠিত সম্পত্তির প্রতিও আগ্রহী হত না। ঐতিহাসিকরা এ কথাও সরলভাবে জানিয়েছেন যে, হিন্দু সৈন্যবাহিনীর হাতিগুলিও পৌত্তলিকতা ত্যাগ করে ইসলামের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে স্বেচ্ছায় মাহমুদের কাছে এসেছিল ইসলাম ধর্মকে সেবা করার জন্য।"

তাবাকাত-ই-নাসিরির রচনা থেকে জানা যায় মহম্মদ বখতিয়ার খিলজি যখন বিহারের নুডিয়া অধিকার করেন তখন ঃ

"বহু লুণ্ঠিত দ্রব্য বিজয়ীদের হাতে এসেছিল। ওখানকার অধিকাংশ অধিবাসীরাই ছিলেন মুণ্ডিত মস্তক ব্রাহ্মণ। তাঁদেরকে হত্যা করা হয়। ...."

মুসলিম আক্রমণ সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য একত্রিত করে ড. টিটাস তাঁর উপসংহারে বলেছেন ঃ ".. মহম্মদ-বিন-কাশিম পরিকল্পিত ভাবে সিন্ধু প্রদেশ ধ্বংস করেছেন। কিন্তু মুলতানের একটি বিখ্যাত মন্দির তিনি ধ্বংস করেননি একমাত্র আর্থিক কারণে। কারণ ঐ বিখ্যাত মন্দিরে ভক্তরা বিগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রচুর অর্থ উপহার দিতেন। কিন্তু নিজের অর্থ লোলুপতা চরিতার্থ করার জন্য মন্দিরটির ক্ষতি না করে বিগ্রহের গলায় এক টুকরো গোমাংস ঝুলিয়ে দিয়ে তিনি তাঁর বিদ্বেষকেই প্রকাশ করেছেন।

"মিনহাজ-আস-সিরাজ জানাচ্ছেন, কম করে এক হাজার মন্দির ধ্বংস করে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন এবং মন্দির ধ্বংসের উৎসাহে তাড়িত হয়ে সোমনাথ মন্দির লুঠ করে বিগ্রহটিকে চারটি টুকরোয় খণ্ডিত করেন। এর মধ্যে একটি টুকরো গজনির জামি মসজিদে জমা দেন; একটি টুকরো ফেলে রাখেন রাজপ্রাসাদের প্রবেশ পথে। তৃতীয়টি খণ্ডটিকে পাঠান মক্কায় এবং চতুর্থটিকে মদিনায়।" (ড. টিটাসের 'ইন্ডিয়ান ইসলাম', পৃ-২২-২৩)

লেন পুলে বলেছেন গজনীর মাহমুদ শপথ নিয়েছিলেন প্রতি বছর বিধর্মী হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে পবিত্র যুদ্ধ পরিচালনা করবেন। তিনি মূর্তি ধ্বংসের ব্যাপারে এতটুকু ক্লান্তি অনুভব করেননি, যতক্ষণ পর্যন্ত সোমনাথ মন্দির অক্ষত ছিল। ... "

গজনির মামুদের এই কীর্তিকলাপ পবিত্র ঐতিহ্যে পরিণত হল। মাহমুদের উত্তরসূরীরা ঐতিহ্যটি বিশ্বস্ততার সঙ্গে অনুসরণ করে গেছেন। ড. টিটাসের বক্তব্য অনুযায়ী ঃ

"গজনির মামুদের অন্যতম উৎসাহী উত্তরাধিকারী মহম্মদ ঘোরি আজমিঢ় দখল করার সময়, বহু মন্দিরের স্তম্ভ ও ভিত্তি ধ্বংস করে মসজিদ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি

করে সেখানে ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম আইন চর্চার কেন্দ্র স্থাপিত হয়। দিল্লি শহর ও শহর সংলগ্ন অঞ্চলকে মূর্তি ও মূর্তি উপসাকদের হাত থেকে মুক্ত করা হয়। অদ্বিতীয় খোদার সেবকেরা ঈশ্বরের বিভিন্ন মূর্তিসম্বলিত মন্দিরগুলিকে মসজিদে রূপান্তরিত করেন।"

"কথিত আছে, কুতুবুদ্দিন আইবেকও প্রায় এক হাজার মন্দির ধ্বংস করে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করেন। ...

"আমির খসরুর মত অনুসারে, কুতুবুদ্দিনের প্রতিষ্ঠিত জামি মসজিদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দ্বিতীয় একটি মিনার নির্মাণ করতে আলাউদ্দিন শুধুমাত্র পাহাড় কেটেই পাথর আনেননি, বিধর্মীদের মন্দিরও ধ্বংস করে পাথর এনেছিলেন। তাঁর পূর্ববর্তীরা যেমন উত্তর ভারতের মন্দির ধ্বংস করেছিলেন, দক্ষিণ ভারত অভিযানে আলাউদ্দিনও একই পদ্ধতি অবলম্বন করেন"।

"যে সব হিন্দু নতুন করে মন্দির নির্মাণের সাহস দেখাত, সুলতান ফিরোজ শাহ তাঁদের কী ভাবে শায়েস্তা করতেন তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আছে তাঁর 'ফতুয়াহাটে'। পয়গম্বরের আইন অমান্য করে তারা (হিন্দুরা) দিল্লী শহর বা তার কাছাকাছি যে সব মন্দির নির্মাণ করত ঐশী শক্তির নির্দেশে আমি তা ধ্বংস করে দিয়েছি। আমি ঐ ধর্মীয় নেতাদের হত্যা করেছি। অন্যান্যদের বেত মেরে শাস্তি দিয়েছি যতক্ষণ না এই পাপের কাজ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়েছে। ... " (ড. টিটাসের 'ইণ্ডিয়ান ইসলাম', পৃ-২৩-২৪)

এমন কি শাহজাহানের রাজত্বকালেও হিন্দুরা যে সকল মন্দিরের পুনর্নির্মাণের চেষ্টা করেছিলেন সেগুলি ধ্বংস করার কথা আমরা পড়ে থাকি। ...

"ঐতিহাসিক বলছেন — মহান সম্রাট আকবরের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এই তথ্য তাঁকে জানানো হয়েছিল যে, আকবরের রাজত্বের শেষভাগে অবিশ্বাসীদের শক্তিশালী কেন্দ্র কাশীতে অনেক মন্দির নির্মাণ শুরু হয়েছিল। .... এলাহাবাদ প্রদেশ থেকে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, এই আদেশবলে কাশী জেলাতেই ৭৬-টি মন্দির ধ্বংস করা হয়।" (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ-২৪)

পৌত্তলিকতা বিলুপ্তির চূড়ান্ত দায়িত্ব বর্তায় ঔরঙ্গজেবের উপর। 'মা আথির-ই-আলমগিরি' গ্রন্থের লেখক হিন্দু শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং হিন্দু মন্দির ধ্বংসের ব্যাপারে ঔরঙ্গজেবের প্রচেষ্টার বিবরণ দেন এ ভাবে :

'১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে এপ্রিল মাসে ঔরঙ্গজেব জানতে পারেন যে, থাট্টা, মুলতান এবং বিশেষত কাশীতে মূর্খ ব্রাহ্মণরা তাঁদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্থহীন তুচ্ছ কিছু গ্রন্থ নিয়ে শিক্ষা দিচ্ছেন এবং দূর দূরান্ত থেকে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীরা সেখানে যাচ্ছেন ....। 'বিশ্বাসের (*ইসলামের*) কর্ণধার' বাদশাহ সমস্ত প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে এই মর্মে আদেশ দিলেন অবিশ্বাসীদের ঐ সব বিদ্যালয় ও মন্দির যেন কঠোর হাতে ধ্বংস করা হয়। ফলে ঐ শাসনকর্তারা সমষ্টিগতভাবে পৌত্তলিকতার শিক্ষা ও আচরণকে সম্পূর্ণভাবে স্তব্ধ করে দেন। ...... পরে মহান ধর্মরক্ষককে (His Religious Majesty) জানানো হয় যে, সরকারী কর্মচারীরা কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির

ধ্বংস করে দিয়েছেন।" (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ-২২)

ড. টিটাসের মতে, "মনে হয় মাহমুদ বা তৈমুরের মতো আক্রমণকারীরা জোর করে ধর্মান্তরিত করা অপেক্ষা মন্দির ধ্বংস, ধনসম্পদ লুঠ করা, বন্দীদের ক্রীতদাসে পরিণত করা এবং 'ধর্মান্তরকরণের তরবারির' সাহায্যে অবিশ্বাসীদের নরকে পাঠানো নিয়ে বেশি ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু স্থায়ীভাবে মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পর ধর্মান্তরকরণের প্রতি চূড়ান্ত গুরুত্ব এসে পড়ে। ধর্ম হিসেবে দেশের সর্বত্র ইসলামকেই প্রতিষ্ঠিত করা তখন রাষ্ট্রীয় নীতির অংশ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল।

" বলপ্রয়োগে ধর্মপরিবর্তন করার ক্ষেত্রে চরমতম ব্যবস্থা গ্রহণের আরও ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে। ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে (১৩৫১-১৩৮৮) এরকম একটি মর্মস্পর্শী কাহিনী হল ঃ 'এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল যে, তিনি তাঁর বাড়িতে মূর্তিপুজো করেন এবং এমনকি গণ্যমান্য মুসলমান রমণীরাও এর ফলে অবিশ্বাসী হয়ে যাচ্ছেন। বিচারক, চিকিৎসক, বয়োজ্যেষ্ঠ ও আইনজীবীদের দরবারে তাঁকে বিচারের জন্য পাঠানো হল। তাঁরা সবাই এক বাক্যে বললেন, এক্ষেত্রে আইনের নির্দেশ অত্যন্ত স্পষ্ট। ব্রাহ্মণকে অবশ্যই মুসলমান হতে হবে, অথবা তাঁকে পুড়িয়ে মারা হবে। কোনটি সত্য ধর্ম ব্রাহ্মণকে তা বুঝিয়ে দেওয়া হল এবং সঠিক পথ কি তাও বোঝানো হল। কিন্তু ঐ ব্রাহ্মণ ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। ফলশ্রুতি হিসাবে সুলতানের আদেশে তাকে পুড়িয়ে মারা হল। ... "

মাহমুদ শুধু মন্দির ধ্বংস করেই থামেননি, পরাজিত হিন্দুদের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করাকে তাঁর নীতি হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। ড. টিটাসের ভাষায় ঃ

'প্রথমবার অভিযানে তিনি প্রচুর লুণ্ঠিত সম্পদ আত্মসাৎ করেন। এছাড়া প্রায় পাঁচ লক্ষ সুদর্শন মহিলা ও পুরুষকে দাস হিসাবে গজনিতে পাঠিয়ে দেন।" (ড. টিটাসের 'ইণ্ডিয়ান ইসলাম', পৃ-২৪)

"১২০২ খ্রিস্টাব্দে যখন কুতুবউদ্দিন কালিঞ্জর দুর্গ অধিকার করেন তখন মন্দিরগুলিকে মসজিদে পরিণত করা হয়, পৌত্তলিকতার নামটি পর্যন্ত নির্মূল করা হয় এবং পঞ্চাশ হাজার হিন্দুকে দাসে রূপান্তরিত করা হয়। এবং হিন্দুদের উপস্থিতিতে সমতল এলাকা পিচের ন্যায় কালো হয়ে যায়।" (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ-২৬)

"হিন্দুদের পক্ষে ঘোড়া পালন বা ঘোড়ায় চড়া, অস্ত্র-শস্ত্র বহন করা, সৌখিন জামাকাপড় ব্যবহার করা এবং কোন প্রকার বিলাসী জীবনযাপন করা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।"

*****

যদি কোনো গবেষক উপরোক্ত তথ্যাবলীর মধ্যে একটিও ভুল বলে প্রমাণ করতে পারেন, তাহলে আমরা তার কাছে চিরদিনের জন্য কৃতজ্ঞ থাকব।
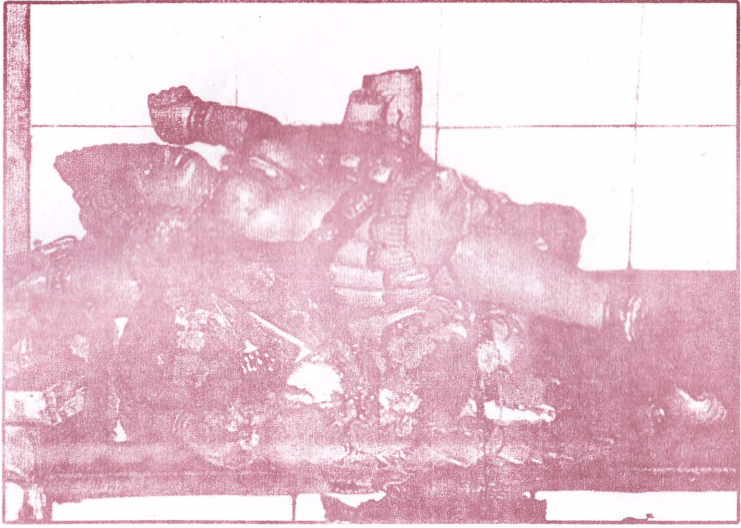
কোরানের বিচারে প্রতিমা পুজো হচ্ছে ক্ষমাহীন পাপের একটি। তাই ২০১০-এর সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের উত্তর ২৪ পরগনার জিলা (প. ব.) শহর বারাসাতের অদূরে কার্ত্তিকপুরের (দে-গঙ্গা) শনি-কালী মন্দিরের প্রতিমা ভেঙে তার উপর প্রস্রাব করে দেওয়া হয়েছে।

কার্ত্তিকপুর থেকে দেড় কিলোমিটার উত্তর দিকে খেজুরীডাঙায় একটি পোড়ো বাড়ি দেখা যাচ্ছে। দে-গঙ্গা এলাকায় তখন প্রায় পাঁচশত হিন্দু বাড়িপুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সম্পূর্ণ ভস্মীভূত বাড়ীগুলির মধ্যে এটি একটি। ইনসেটে গৃহকর্ত্রীর ছবি।
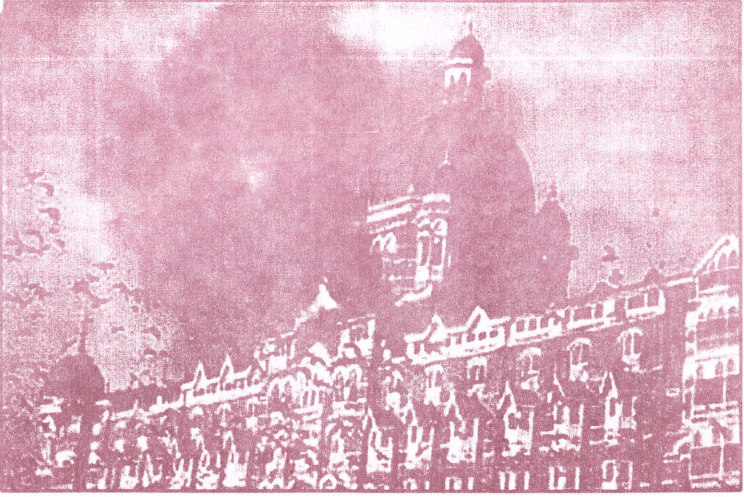
২০০৮-এর নভেম্বর মাসে ভারতের বম্বে শহরে (মুম্বাই) পাকিস্তানী জঙ্গীরা ব্যাপক হামলা চালায়। সেদিন বিশ্বখ্যাত তাজ হোটেলটি পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

২০১০-এর সেপ্টেম্বর মাসে পূর্বোক্ত দে-গঙ্গায় অনুষ্ঠিত বিধর্মী নিধন অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে সরকারী বেসরকারী অনেকগুলি গাড়ী পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, যার মূল্য কয়েক কোটি টাকা। এখানে কয়েকটি গাড়ীর কঙ্কাল দেখা যাচ্ছে।

স্থান ঃ ঢাকা জিলার ধামরাই থানা আটানীপাড়া গ্রাম। মৃতদেহটি তিন বছরের ছেলে মিলন চন্দ্র মনিদাসের। ওর মা-বাবাকে বলা হয়েছিল, প্রাণে বাঁচতে চাও তো সব ফেলে ইন্ডিয়ায় চলে যাও। এই নির্দেশ অমান্য করার কারণে ১৩-০৩-২০০৯ তারিখে মৌলবাদী দুর্বৃত্তরা ওদের বাড়িতে চড়াও হয়ে কাঞ্চনমালা নামে এক যুবতীকে ধর্ষণ করে এবং শিশুটিকে তুলে নিয়ে যায়। দু'দিন পরে এই মৃতদেহটি বাড়ীর সামনে ফেলে যায়।
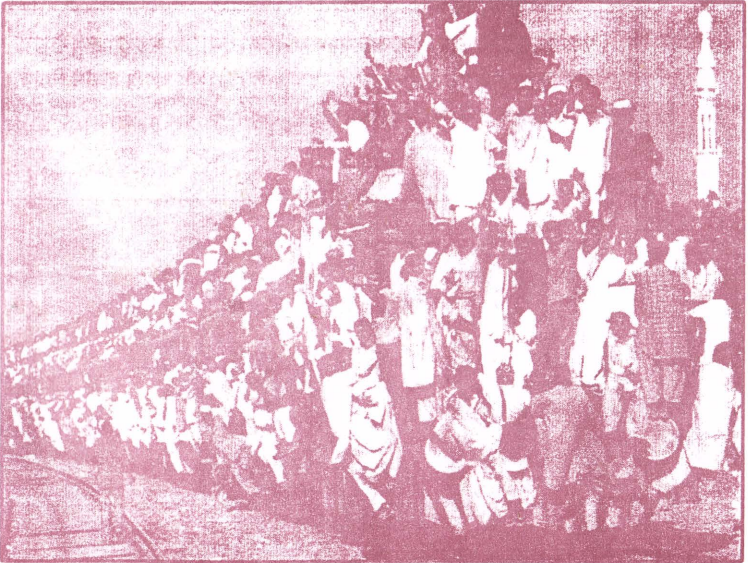
১৯৪৭-এর আগস্ট মাস থেকে বর্তমান পাকিস্তান এলাকায় হাজার হাজার হিন্দু মহিলা ও পুরুষকে খুন করা হয় এবং লক্ষ লক্ষ হিন্দু ভারতে চলে আসেন। তারই একটি দৃশ্য।

১৯৪৬-এর আগস্ট মাসে কলকাতার কলাবাগান এলাকায় পচা নর মাংস দিয়ে শকুন-শকুনীদের মহাভোজ।

ভারত-রত্ন ড. বি. আর. আম্বেদকর বলেছেন, 'ভারত আক্রমণকারী মুসলমানরা নরহত্যা, লুণ্ঠন এবং মন্দির ভেঙেই ক্ষান্ত হননি। তারা ভারতের মাটিতে ইসলামের বীজ বপন করে গেছেন।' উৎস ঃ পাকিস্তান অর দি পার্টিশন অব ইন্ডিয়া (১৯৯০), পৃ- ৬৫
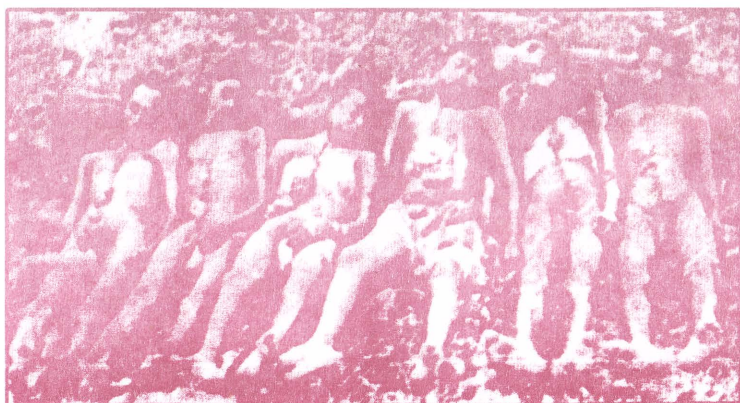
ঐ ১৯৪৬-র আগস্ট মাসেই ঢাকার উয়ারী এলাকায় রেল লাইনের ধারে জড়ো করে রাখা কয়েকজন হতভাগা হিন্দুর মৃতদেহ।

এই হতভাগিনীর নাম পূর্ণিমা শীল। ধর্মে হিন্দু। ২০০১-এর ৮ অক্টোবর, যখন তার বয়স ছিল ১৪-এর কম, ১০/১২ জন ধর্মান্ধ মুসলিম যুবক ওকে ওর মায়ের বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গণধর্ষণ করে।

মি. সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীরর নিজস্ব বাহিনী গত ১৬.১১.২০০১ তারিখে ভোরবেলা চট্টগ্রামের নাজিরহাট কলেজের অধ্যক্ষ গোপালকৃষ্ণ মুহুরীকে তার নিজের বাসভবনে খুন করে। তিনি হিন্দু এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী - এই কি তার অপরাধ ?

পরিমার্জিত সংস্করণ - ২০১১ ।। মূল্য - বাংলাদেশ - ১০০ টাকা এবং ভারত - ৭০ টাকা